শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের সেরা গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের সেরা গল্প

দীপ প্রকাশন
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Sahityer Sera Galpa
A collection of Bengali short-stories
by Sirsendu Mukhupadhyay

পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১০
পুনর্মুদ্রণ : অগাস্ট ২০১১
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : অগাস্ট ২০১৮
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৬ ◆ প্রচ্ছদ : অনুপ রায়
প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : কল্পনা অফসেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১৫

গল্পক্রম

সাহিত্যের সেরা গল্প

স্বপ্ন ও বাস্তবের সহাবস্থান

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ গল্পেই স্বপ্ন আর বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আবার তারি মধ্যে থাকে একটি স্মৃতিমেদুর সুর। মায়ের কাছে, জীবনের উৎসের কাছে, প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার সুর—একটা পিছুটানের সুর। তাঁর গল্প ক্ষণে ক্ষণে রোমান্টিক ও মিস্টিক জগৎকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দোলে। লেখকের অমোঘ শব্দচয়ন, অসাধারণ উপমা-সৃষ্টি এই মিশ্র বোধকে পৌঁছে দেয় পাঠকের মনে অব্যর্থ নিশানায়।

'গঞ্জের মানুষ' গল্পে পাওয়া যায় এক গঞ্জের গণ্ডিতে সীমায়িত একগুচ্ছ চরিত্র। প্রত্যেকে তারা সুখদুঃখে গড়া আলাদা মানুষ, আবার সবাই তারা গঞ্জের মানুষ। গঞ্জের সবথেকে লেখাপড়া জানা মানুষ শ্রীপতি মাস্টার সর্বদা বিষণ্ণ, উদাস। কারণ, সে বোঝে তার সমস্ত বিদ্যা গোপন কোনো এক ঘাটতিতে যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে। নিজ-বিদ্যা-সম্পর্কে সন্দেহ জাগে প্রৌঢ় শ্রীপতির মনে, গঞ্জের জনজীবন, গঞ্জের প্রকৃতির প্রেক্ষিতে। মেছোবাজারে কুপি জ্বালিয়ে অপেক্ষমান সাধারণ মানুষগুলিকে দেখে শ্রীপতির মনে প্রশ্ন জাগে "এইসব লোকেরা শেলী কীটস পড়েনি, শেকসপীয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য, তবু বেশ বেঁচেবর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে?"

আবার শ্রীপতি বোঝে তার পড়াশোনা ইনফর্মেশানের স্তরে রয়ে গেছে, জ্ঞান হয়ে ওঠেনি, উপলব্ধির অভাবে, জীবনদর্শনের অভাবে। উপলব্ধির খাঁকতি আছে বলেই "......গঞ্জের পরিবেশ, ওই ম্লান একটু কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না, কিংবা ফকিরচাঁদের ঢিবিতে একা শিরীষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনো মানসাঙ্ক কষতে পারে না।"

শ্রীপতি মাস্টার প্রাণপণ চেষ্টাতেও কিছু উপলব্ধি করতে পারেন। গঞ্জের জনজীবন বা গঞ্জের প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে; অথচ গল্পের শেষে দেখি মাতাল, অশিক্ষিত, বাবা ও ছেলের কাছে অবহেলিত শোভারাম যখন শুনতে পায় তার ছেলে খেলারাম, দাদু ভেলুরামের শাসনে ভোরে উঠে দুলে দুলে ইংরেজি পড়ছে—তখন ফকিরচাঁদের ঢিবি খুঁড়ে সম্পদ না পাবার দুঃখ, মা-র মৃত্যুর পর বাবার আশ্রয়চ্যুত হবার দুঃখ ভুলে ফিক করে হাসে শোভারাম—পিতৃত্বের উপলব্ধিতে।

একইভাবে নদীয়া উপলব্ধি করে স্ত্রীকে ফিরে পাবার সুখ, ফাটা পায়ে দামি জুতো পরার সুখ, নদীয়ার বৌ উপলব্ধি করে নদীয়াকে ভালোবাসার সুখ। এমনকি মিতুয়া চামারের দোকানের সামনে ঝোলানো জুতো নদীয়ার মাথায় ঠেকে গেলে, মিতুয়া যখন বলে—"বাবুলোকেরা মাথা নিচু করতে জানে না তো, তাই ওই সব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।"—তখন অশিক্ষিত মিতুয়া চামারের জীবনোপলব্ধি বা জীবনদর্শনকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না।

'উকিলের চিঠি' আসলে মিছরির বরের চিঠি। সুন্দরবনের অঞ্চলের এক গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থঘরের আদরের মেয়ে মিছরির বিয়ে হয়েছে ১ বছর ৪ মাস। তার বর বসন্ত মিদ্দার ওকালতির কথা শুধু চিঠির কাগজের মাথায় আর খামে ছাপানো থাকে, কিন্তু ওকালতির পসার আর জমে না। মিছরিকে নিয়ে নিজের সংসার পাততে তাই পারেনি বসন্ত। মিছরি বাপের বাড়িতে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে আসে তার উকিল বরের চিঠি। সে চিঠি একটু একটু করে, অনেকক্ষণ ধরে পড়ে মিছরি—"গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে।"

একদিন একদল ভুখা, রোগাসোগা মানুষ আতিথ্য গ্রহণ করেছে মিছরির অতিথি-পরায়ণ বাবার বাড়িতে মরিয়া মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রদের স্টেশনে বসিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাদা অঞ্চলের দিকে, বাঁচবার জন্য, একটুকরো ভূমির সন্ধানে। তাদের রান্নার জোগাড় সেরে বরের চিঠি পড়তে বসেছে মিছরি। মিছরির অব্যক্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া কৌশলে জুড়ে দেন লেখক ভোজনরত দলটির সম্পূর্ণ অন্য কারণে ব্যক্ত কিছু প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে।

যেমন মিছরি যখন পড়ে, বসন্ত লিখেছে "লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো ...." তখনি গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে আগন্তুক দলের একটি বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়।

গল্পের শেষ বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। মিছরি চিঠির উত্তরে স্বামীকে লিখছে—"আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে...।"

এই অর্ধসমাপ্ত বাক্যটি পড়ে পাঠকের মনে ঘুরে ঘুরে আসে কিছু প্রশ্ন; কোন জায়গার সন্ধান দেবে মিছরি তার স্বামীকে? সে সন্ধানে থাকবে কি বাদায় আশ্রয়-সন্ধানী ভুখা মানুষগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা?

'ঘণ্টাধ্বনি' গল্পটিকে একটি সুতোর মতো অথবা ধ্রুবপদের মতো ধরে রেখেছে এক গ্রামের মন্দিরের সন্ধ্যারতির সময় ধ্বনিত তেজালো কাঁথির আওয়াজ। মন্দিরের বুড়ো বাজনদার আফিংখোর গোবিন্দর হাত থেকে কাঁসি কেড়ে তন্ময় হয়ে নেচে নেচে কাঁসি বাজায় মা-মরা গুণ্টু, দিদিমা কালিদাসীর আদরের গুণ্টু।

গুণ্টু ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে নিজেই শব্দ হয়ে যায়। তার এই শব্দ হয়ে যাওয়া আসলে সরল চিত্ত এক বালকের সহজ আনন্দে আধ্যাত্মিক চেতনায় পৌঁছে যাওয়া।

কিশোর গুণ্টুর উপযোগী ভাষায় সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক—"ব্যাপারটা কীরকম হয়, কাঁসি বাজাতে বাজাতে শব্দটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। কাঁইনানা কাঁইনানা হয়ে বাজতে বাজতে কানে তালা ধরে আসে, শরীর ঝিমঝিম করে। তারপর শব্দটা যেন তার চারধারে লাফাতে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বহুদূর চলে যায়। আবার ফিরে আসে। তারপরই সে পরিষ্কার টের পায় শব্দটা আকাশ বাতাস সব হাঁ করে গিলে ফেলল। প্রকাণ্ড হয়ে গেল। দুনিয়াভর হয়ে গেল। আকাশভর হয়ে গেল।"

গুণ্টুর এই চৈতন্যময় ঘণ্টাধ্বনি তাই মন্দিরের দিকে টানে সংসারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা কালিদাসীকে, বিড়ম্বিত কানাই মাস্টারকে, চাবির কারিগর হেম ঘোষকে, হেমের বৌ রেবাকে, এমনকি গুণ্টুর সৎ-মাকে।

আর গুণ্টু মাথা নিচু করে চরণামৃত দেবার সময় হাত দেখে বুঝতে পারে—কোন হাত কী খুঁজছে; কোন হাতে লোভ, কোন হাতে হিংসে, কোন হাতে সন্তানকামনার আর্তি মাখানো। এই আন্দাজ করার ক্ষমতা সে লাভ করেছে মন্দিরের প্রাচীন সেবাইত চক্কোত্তি মশাইয়ের প্রশিক্ষণে— প্রকৃতির নানা বিষয়ে আন্দাজ-অনুশীলন করে। চক্কোত্তি মশাই তাকে শেখায় কীভাবে স্মৃতি বাড়াতে হয়।

এইসব প্রশিক্ষণ আর তন্ময় হয়ে ঘণ্টা বাজানো গুণ্টুকে এতটাই স্বাতন্ত্র্যদান করে যে, সৎমা তার দিকে চেয়ে বলে "এ যে দেবতার মতো ছেলে।"

'লড়াই' গল্পে ধনগর্বিতা, সুন্দরী মেজকাকি ও তাঁর ধনী অথচ জীবনযাপনে সরলতায় বিশ্বাসী শ্বশুরের অব্যক্ত বিরোধ এক ভয়াবহ লড়াইয়ের রূপ নেয়, মেজকাকির বাপের বাড়ির লেঠেলরা মেজকাকির নির্দেশে বাস্তু সাপদুটোকে হত্যা করতে গেলে; মুনিশ পালান ও মেজকাকির বাপের বাড়ি থেকে আগত দেশি কুকুর 'ঘেউ' সে-লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে আহত হলেও আসল হার হল মেজকাকির অহংকারের। আর গল্পকথক জানালেন—"মানুষ কীভাবে জিতবে তার কোনো নিয়ম নেই। অনেক সময়ে মানুষ যুদ্ধে জিতেও হারে, আবার কখনও হেরেও জিতে যায়।" তাই মেজকাকি এ-লড়াইয়ের শেষে হাসিমুখে নেমে এলেন পরিবারের অন্যান্য বধূদের সমস্তরে। মেজকাকির বাপের বাড়ি থেকে আসা খাস-চাকরানি অধরা পালানের সঙ্গে সংসার করার স্বাধীনতা পেল। মেজকাকির কুকুর শেকলের বাঁধন থেকে পেল মুক্তি।

'বাঘ' গল্পের বাঘ আসলে প্রতীক। মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। যেমন বেরিয়েছিল জোনাকিকুমারের জীবনে। স্কুল ফাইনালে দশম হয়েছিল জোনাকি। তারপর আর সারাজীবনে দারুণ ভালো কোনো রেজাল্ট করেনি। সেই টেনথ হওয়া তার জীবনে চিরদুঃখ, চিরলজ্জা হয়ে রয়ে গেছে। তার

রেজাল্টের মোহে সুন্দরী তিতির তাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু জোনাকির জীবনে আর কোনো সাফল্য আসেনি বলে তিতির তাকে ত্যাগ করে বিয়ে করেছে ধনী, প্রতিষ্ঠিত অমিতকে।

কিন্তু প্রবল ঝড়বৃষ্টির রাত আশ্চর্যজনকভাবে জোনাকি আর অমিতকে অনুভবের একই ভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়, যা বোঝার সাধ্য নেই তিতিরের; জোনাকি বৃষ্টিতে চুপ্পুড় ভিজে হাঁটতে হাঁটতে আপনমনে বলে—''জানো না তো তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কীরকম আনন্দ আছে।'' এ-কথা হয়তো মনে মনে তিতিরকে ভেবেই বলা।

আর অমিত তিতিরকে বলে—''ওঃ তিতির। কী প্রকাণ্ড এই আকাশ, কী বিরাট শূন্যতা চারদিকে। আর কী ভয়ঙ্কর শক্তিমান ঝড়। এসব দেখলে নিজেকে তুচ্ছ লাগে বড়। মাঝে মাঝে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে কি যে আনন্দ হয়।''

'খানাতল্লাস' অনেকটা 'আমাকে দেখুন'-এর ভঙ্গিতে লেখা। ইনসপেক্টারের খানা- তল্লাসে পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে এক অতিসাধারণ, মধ্যবিত্ত পরিবারের গোপন দারিদ্র্য, প্রেম, দুঃখ, লজ্জা। শেষ পর্যন্ত ইনসপেক্টার বাজেয়াপ্ত করার মতো সম্পদ পেলেন পরিবারটির চোখে—পেলেন স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা। এই সম্পদগুলি বাজেয়াপ্ত না করার আর্তিতে গল্পের শেষ বাক্যে সেই ভেঙে পড়লেন গল্পকথক—তখনি নতুন মাত্রায় সমগ্র গল্পটি উদ্ভাসিত হল। বোঝা গেল এই ইনসপেক্টার সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—এই আকুল প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে অতি সাধারণ মানুষের।

'হাওয়াবন্দুক' 'মণিকা-সঞ্জয়ের মিষ্টি প্রেমের গল্প। তবু নিছক প্রেমের গল্প নয়। হাওয়াবন্দুক দিয়ে হলুদ বেলুনটা তিনবারের চেষ্টায় ফাটাতে না পারলে মণিকা-সঞ্জয়ের বিয়ে হবে না, দীর্ঘ প্রেম-পর্বের পর হঠাৎই জেদ করে এমন একটা খেলা খেলেছিল সঞ্জয়। তারপর বিবাহিত জীবনে অসুস্থ সঞ্জয়কে ঘিরে মণিকার অপার উৎকণ্ঠা গল্পে ফিরিয়ে আনে হাওয়াবন্দুকধারী নিয়তি আর মণিকার হৃদয় তথা হলুদ বেলুনের প্রতীক। এ যাত্রায়ও বেঁচে যায় মণিকার সংসার। সঞ্জয়ের রোগটা মারণ-রোগ নয়। ''অলক্ষ্যে হাওয়াবন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়।'' কিন্তু এ-ও সত্য ''কোনোদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বারবার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙিন মেলার আনন্দিত বাতাস বহে যাক এই কথা বলে—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।'' এমনি আস্তিক্যবোধে বার বার স্বাদু হয়ে ওঠে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প।

'পুরোনো চিঠি' অণুগল্প। আদ্যন্ত ব্যঞ্জনাময়, প্রতীকী। নিশুতরাতের ডাকপিওন নিয়তি। মুন্নির বাবার হাতে সে সারাজীবনের পুরোনো চিঠি অর্থাৎ স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে—স্বপ্নে। আর কোনো চিঠি আসবে না। বুকের বাঁ দিকে ব্যথা, মনে মোহনায় পৌঁছনোর উপলব্ধি যখন—তখনি পরম ভালোবাসায় জীবনকে ফিরে দেখেন তিনি; দেখেন নির্জন রাত, ঘুমন্ত স্ত্রী-কন্যার মুখ, সতেজ গন্ধময় ভোর, ছায়াময় আলো—পথের মাঝে বসে, ঝাঁকড়া চুল মুখের ওপর ফেলে পাঁচবছরের মুন্নির নিজহাতে জুতোর কাঁকর বের করার অনুপম এবং অবশ্যই ইঙ্গিতবহ দৃশ্য। তারপরই নিশ্চিন্তমনে, একটু হেসে সামনে এগিয়ে যান মুন্নির বাবা। তিনি জানেন 'মুন্নি একা আসতে পারবে।'

'সূত্রসন্ধান' এক বিষণ্ণ, চিন্তাশীল, আন্তরিকভাবে নিঃসঙ্গ মানুষের গল্প। যার ভেতরে সুতো ছেঁড়ার নিরন্তর তাগিদ। প্রতি মুহূর্তে যার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে সংসারের বাইরে কোনো নির্জনতায়, সন্ন্যাসী বৈরাগী হয়ে; এমনকি বেঁচে থাকা মানে তার কাছে ''আত্মায় মলিন হাতের ছাপ''—সেই মানুষটি কিন্তু মাঝে মাঝে সুতো ছিঁড়লেও পালাতে পারে না—''কে যেন নতুন সুতোয় নতুন বঁড়শি অলক্ষ্যে গিলিয়ে দেয়।''

এই মানুষটির কষ্ট সংসারে সবথেকে বেশি বোঝে তার মা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ গল্পেই 'মা' বিশেষ তাৎপর্যে ও ভালোবাসায় অঙ্কিত।

'ঘরের পথ' গল্পটি সম্বন্ধে শীর্ষেন্দু একদা বলেন—''১৯৬১ কি ৬২ হবে। কলেজ স্ট্রীটের কাছে নবীন পাল লেনের এক নিতান্তই হাড়হাভাতে বোর্ডিং হাউসে থাকি। এম.এ. পরীক্ষা বারদুয়েক ছাড় গেছে। দিনরাত

কেবল লেখা আর লেখার চিন্তা। সেই সময়ে একদিন হঠাৎ এ-গল্পের প্রথম দুটো লাইন মাথায় আসে। দীর্ঘ মাসখানেক ব্যবধানে আসে পরের কিছু লাইন। লিখি, কাটি, নতুন করে লিখি। তখন এ-ব্যাপারে আলস্য ছিল না, বার বার লিখতে ক্লান্তি আসতো না। বহুকালের কথা তো, ঠিকঠাক সব মনে পড়ে না। আন্দাজ মাস দুয়েকের চেষ্টায় 'ঘরের পথ' লেখা শেষ হয়। একটু রূপকথার ছোঁয়া আর কবিতা-প্রতিম ভাষা প্রয়োগ করে আমার অক্ষম চেষ্টা ছিল কিছু দাঁড় করানোর। মনে হয় না গল্পটা একটা কিছু হয়েছে। তবে লেখার সময় ঐ জায়গাটা বেশ দেখতে পেতাম। সেই বুড়ো ঘোড়া আর গাঁওবুড়ো একদম মুখোমুখি এসে বসে আমার লেখার কাজের তদারকি করত তখন।'' (শ্রেষ্ঠ গল্পও : শ্রেষ্ঠ লেখক/ সম্পাদনা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

লেখকের তরুণ বয়সের সৃষ্টি এ-গল্পটির চরিত্র একটু আলাদা। রূপকথার ছোঁয়ায়, কবিতাপ্রতিম ভাষায় এ-গল্পে এসেছে অনির্বচনীয় স্বাদুতা। লেখকের নিজেরও এ-গল্পের প্রতি দুর্বলতা আছে। তাই সরাসরি শ্রেষ্ঠ গল্প বলে চিহ্নিত না করলেও, শ্রেষ্ঠ গল্প বাছতে বললে এই গল্পের কথাই তার মনে এসেছে।

'প্রিয় মধুবন' গল্পের কাহিনিরেখা খুব সংক্ষিপ্ত, সরল এবং বাস্তব। কিন্তু মধুবনের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য, প্রকৃতিতে অভিগমনের ইচ্ছা, বীজমন্ত্র, ধ্যান—গল্পকে অন্যমাত্রা দেয়। আবার সোনা ও মধুবনের মধুর দাম্পত্য অন্তরের দিক থেকে ফেরারি মধুবনকে এবং সমগ্র গল্পকে ধরে রাখে বাস্তবের ভূমিতে।

মধুবন ও কুনাল একই সঙ্গে পথে নেমেছিল বিপ্লবের টানে। মধুবন সংসার পেতেছে, কুনাল ফেরারি। কুনালের বেনামী চিঠি আসে মাঝে মাঝে দুটি একটি বাক্য বুকে নিয়ে, বিদ্রুপের খোঁচা নিয়ে। ওলোটপালোট করে দেয় মধুবনের সাজানো গোছানো সকাল- সন্ধ্যা। মধুবন একদিন জানতে পারে কুনাল আসলে পরাজিত, হাওড়ার এক কারখানায় কাজ করে, কষ্টে আছে—তবু মধুবনের কাছে বজায় রাখতে চায় ফেরারি বিপ্লবীর ভাবমূর্তি। সব কিছু জানার পর মধুবন কুনালকে লিখেছে—''ওরে কুনাল বনের সন্ন্যাসীর চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি।'' অর্থাৎ মধুবন সংসারে থেকেও ফেরারি।

'সাপ' গল্পেও অতিপরিচিত সম্পর্কের আপাত সরলতা ও গভীরে নিহিত জটিলতার অপূর্ব চিত্রায়ণ। ছোট্ট ছেলে বাপ্পার জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে কর্তৃত্বপরায়ণ, বদরাগী বাবার পেষণে; তার চোখের সামনে বাবার অন্যায়শাসনে কষ্ট পায় আরেকটি প্রাণী—পোষা কুকুর রেনী। যে ঘরে দরজা বন্ধ করে রেনীকে মারা হত—সে ঘরে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপকে একদিন ঢুকতে দেখেছিল বাপ্পা। সেদিন বাবা রেনীকে মারবার জন্য সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল যখন—তখন বাপ্পা চুপ করে ছিল। সাবধান করেনি বাবাকে। ভীত বাবা বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বাপ্পার কাছে একটা লাঠি চাইলে ভীত, বিভ্রান্ত বাপ্পা চৈতন্য হারিয়ে ফেলে লাঠি পাবার আগেই। এই গল্প বড় হয়ে বাপ্পা ছেলেমেয়ে নাতি- নাতনিদের কাছে করত। কিন্তু তখন গল্পটার কোনো কোনো অংশকে সে ঢাকা দিত।

বলে দিলেন না লেখক ঠিক কোন কোন অংশকে ঢাকা দিত বাপ্পা। ফলে অনিবার্যভাবে পাঠক ভাবতে শুরু করেন। সফল গল্পকারের এ-ও এক কৌশল। তিনি জানেন 'সমঝদারোঁ কে লিয়ে ইশারা হি কাফি।'

সমঝদার পাঠকের মনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে দুটি দৃশ্য—

(১) বাবা যখন ঘরটিতে ঢুকে দরজা আটকান দড়াম করে, ছোট্ট বাপ্পা তখন জামগাছটা ধরে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে, যন্ত্রের মতো বার বার বলে '' আমি বলে দিইনি, বলে দিইনি ও-ঘরে কী আছে। আমি বলে দিইনি, বলে দিইনি—বলিনি।''

(২) বাপ্পা যখন ঘরের জানলা দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পায় বাবা রেনীকে বকলস ধরে জোর করে সাপটার মুখে এগিয়ে দিচ্ছে, তখনই সে চিৎকার করে সবাইকে সাপের কথা জানাতে চেষ্টা করে, আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছোটে এবং চৈতন্য হারায়।

পরিণত বাপ্পা তার স্মৃতির যে অন্ধকার গর্তগুলো লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায়, পাঠক বোঝেন সে গর্তগুলোয় রয়েছে ঘুমন্ত বিষাক্ত সাপ—বাবার প্রতি ঘৃণার সাপ, বাবার মৃত্যুকামনার গোপন অপরাধ।

অতি সাধারণ মানুষ মাখনলালের মৃত্যু এসেছে এক জুন মাসের রাতে। হঠাৎ। স্বপ্নের ভেতর। গল্পের নাম 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু'। অফিসে হাড়ভাঙা কাজের শেষে মাখনলাল হঠাৎ-ই একদিন এক নিগূঢ় অস্বস্তির সঙ্গে টের পেল, তার মন ভালো নেই। সেই রাতেই স্বপ্নের ভেতরে তার মৃত্যু হল। শুধু তাই নয়, অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত জীবনের পরিচিত ছবিগুলো স্বপ্নের মতো খানিকটা দূরত্বে, খানিকটা অস্পষ্টতায় ভেসে গেল চোখের ওপর, মনের ওপর দিয়ে। যেন মৃত্যুর আগে জীবন পরিক্রমা করে গেল মাখনলাল।

একদিকে বাস্তব পরিবেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেল, অন্যদিকে মাখনলালের ছোটো ছোটো অপূর্ণ সাধ আর অনুভূতির ডিটেল পাঠককে পৌঁছে দেয় অতি প্রাত্যহিক, অতি সাধারণ জীবনের অসাধারণ, গভীরতম বোধে।

গভীর বোধে ডুব দিয়ে শব্দ সঞ্চয়ন করতে করতে এগিয়ে যান লেখক ; আবার অসাধারণ উপমার শাণিত দীপ্তি বোধ-তন্ময় পাঠককে চমকে দেয়। যেমন, জুন মাসের প্রথম বৃষ্টিপাত দেখল মাখনলাল—''হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাতে আছড়ে পড়ে ভাঙছে।'' কখনও-বা মনে হয়—''প্রবল হরিণের মতো লাফিয়ে ছুটছে বৃষ্টি।'' মৃত্যুর আগে ঘুম ও জাগরণের মাঝে নিশ্চেষ্ট মাখনলাল বোঝে ''বুকের বাঁ পাশে একটা অস্পষ্ট ব্যথা ডাকটিকিটের মতো লেগে আছে।''

'মৃণালকান্তির আত্মচরিত' এবং 'চারুলালের আত্মহত্যা'—দুটি গল্পেই মৃণালকান্তি আর চারুলাল আপাত দৃষ্টিতে ছন্নছাড়া, পাগলাটে মানুষ। তাদের মানসিক একাকীত্ব গভীর বোধ সঞ্জাত। 'মাথার ভেতরে এক বোধ কাজ করে'—তাই সহজ লোকের মতো বাঁচতে পারেনি এরা। এক মৃত্যুপথযাত্রী আরশোলাকে মাড়িয়ে ফেলছিল বলে প্রেমিকা ছায়াকে মৃণালকান্তি ঠেলা দিয়ে ফেলে দেয়, আর চারুলাল নানা শিল্পভাবনায় আক্রান্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত গোলদিঘিতে আত্মহত্যা করে।

'আমাকে দেখুন' গল্পের অরিন্দম বসুও একজন সাধারণ লোক। ব্যাঙ্কের ক্যাশ কাউন্টারের ঘুলঘুলির পারসপেকটিভ ছাড়া যাকে চেনাই যায় না। এত মামুলি, এত সাদামাটা চেহারা তার যে নব-বিবাহিতা স্ত্রী নিউমার্কেটের ভিড়ে তাকে খুঁজতে গিয়ে নাগাল দূরত্ব দিয়ে বারবার ঘুরে যায়, অথচ চিনতে পারে না স্বামীকে।

'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু' গল্পের মাখনলাল মৃত্যু-মুহূর্তে বোঝে 'সে মারা যাচ্ছে। ইঁদুর, আরশোলার মতো তুচ্ছভাবে।' আর 'আমাকে দেখুন' গল্পের বেঁটেখাটো অরিন্দম বসু বাসের নিরেট জমাট ভিড়ের ভেতরে এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে, এর ওর পায়ের ফোকর দিয়ে, ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে কেটে এগিয়ে যায়। অমোঘভাবে অতি সাধারণ মানুষের মৃত্যু ও বাঁচার সংবাদ এভাবেই সঞ্চারিত হয় তাঁর গল্পে।

'আমাকে দেখুন' গল্পের শেষে এক বিরাট জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকেন পাঠক। যারা অরিন্দম বসুর মতো বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার সাধারণ মানুষ; যাদের ছেলেরা অরিন্দমের হারানো ছেলে হাপুর মতো বৈশিষ্ট্যহীন, সাধারণ চেহারার ছেলে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প তাই আপনার আমার জীবনকথা। আমাদের তুচ্ছতা, আমাদের সুখ দুঃখ, আমাদের স্বপ্ন এবং অবশ্যই আমাদের চৈতন্যের গল্প। সব নঞর্থকতা মেনে নিয়েও জীবনকে ভালোবাসার গল্প।

গঞ্জের মানুষ

রাজা ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরীষ গাছ সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকিরচাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হীরে-জহরত সব ওই ঢিবির ভিতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেল লাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছ-গাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথরকুচিতে চটি ঘষটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এ পর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয়নি নদীয়াকুমার।

তো এই সন্ধের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনও ফেরেনি দেখে চৌপথীতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ার একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ গাড়িতেও আসেনি। আরও খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তাভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা-বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাং আর আউরাৎ নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভারামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হেক্কোড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় খায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথী থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদীয়ার বউ আজকাল মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে চুড়ি-বালা, সিঁথের সিঁদুর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে যে, সে পুরুষমানুষ, আর কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জের সবাই নদীয়ার বউকে ভয় খায়। নদীয়া নিজেও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না। চোখে হাত আড়াল দিয়ে দেখে বুঝে ভয়ে ভয়ে বলে—কে, নদীয়া নাকি?

—হয়। নদীয়া। উত্তর দিল।

—কোন বাগে যাচ্ছো?

—বাজারের দিকেই।

—চলো, একসঙ্গে যাই।

—চলো।

দুজনে একসঙ্গে হাঁটে। ভেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন শব্দ হচ্ছে, ফ্যাসফ্যাস করছে নদীয়ার চটি। ভারী দুঃখী মানুষ এই নদীয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষমানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ওই সাত জায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনঅলা হাওয়াই চটি দেখে যদি কেউ নদীয়ার দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদীয়ার দুঃখ ওই চটি জুতোয় নয় মোটেই। দু-দুটো মদ্দ হালুইকর নদীয়ার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে দু-বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ওই একটাই মিষ্টির দোকান। আরও কয়েকটা নদীয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদীয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশি। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ।

জামাটা জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কি সাধে পুরুষ সাজে!

যে যার নিজের জ্বালায় মরে। নদীয়া যেতে যেতে কাঁদুনি গাইতে লাগল—সামনের অমাবস্যায় আমার বাড়িতে মচ্ছব লাগবে, বুঝেছো? আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছো কখনও মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে?

দেহাতি ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালি হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু'চারটে হিন্দি কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল—নদীয়া ভাই, আউরাৎ তোমার কোথায়? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মৎ।

—তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগনার মজা দেখছো।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল—ও মেয়েছেলেকে সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদীয়াকুমারকে দেখিয়ে বলল—এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কী, তোমার তো একজোড়া ভালো জুতিই নেই। ওইরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হাওয়াই চটি দিয়ে কি জুতো মারা যায়!

—রাখো রাখো! নদীয়া ধমকে ওঠে—শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিলে, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাড়া করার সেই সুখস্মৃতিতে ভারী আহলাদ আসে মনে। এত আহলাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে-কানাচে শোভারাম কুকুর বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনও বাপটা খড়মটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত-প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কি দারোগা পুলিশকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী। ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সব সময়ে এই গান গাইত—লুট পড়েছে, লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মসলাপাতি, মনোহারি জিনিস, পাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে বলে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বুঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভালো লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু-পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এ সব পোষায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কী বা ছিল! শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেদের সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতি মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারী ঝাঁঝ তাদের হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে! শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাঙ তো আছেই, বোতলের নেশাও ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গাহাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনও সহায়। ছেলের বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁৎকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই পেটা না দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছর-খানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ-মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছাপূরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে না হতেই ভেলুরাম মহাহাঙ্গামা বাধায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল,

কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস. ডি. ও সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায় ঘেন্নায় শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কী! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে তো মালকড়ি আসে না। নেশাভাঙ আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগারপাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড়ো সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুর ঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিশেও খোঁজখবর করছে। বড়ো অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশা-ভাঙ করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড়ো সহজ কাজ নয়। সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝেসমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূতপ্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানি মন্ত্র। মদনা যে আজ বড়ো চোর হয়েছে সেও মাগনা নয়। যে দিকেই বড়ো হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি মিনতিতে আজকাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালেও না। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারামও বাপকে দূর-দূর করে। একটা বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটেকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু-পাঁচ টাকা ওই বাপ কী ছেলেই ছুঁড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম। চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুরঘুর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মসলাপাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পিছন সারির দোকান আর গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল—কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু-চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতি মাস্টার লোকটি বড়ো ভালো। সারাদিন বসে কী যেন ভাবে। লোকে বলে, গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপড়া জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ওই শ্রীপতি মাস্টারই তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে সামান্য বেতনের মাস্টারি করে, আর গোমুখ্যু ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখ্যু খেলারামকে রোজ সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা পড়িয়ে মাসকাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ওই দু-ঘণ্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

—রাম রাম মাস্টারজি। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার মুখ গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গেঁজের মধ্যে ভেলুরামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারল না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্তিরি ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে চেয়ে বলল—কোন হ্যায় আপ?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দি বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পড়াতে এসে সে বড়ো বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলাদেশে থেকে আর বাঙালির সঙ্গে কারবার করে করে হিন্দি-মিন্দি ভুলে গেছে কবে! উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দি শেখে।

শ্রীপতির হিন্দি শুনে ভয় খেয়ে শোভারাম বলে—আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজি। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি?

—ও। বলে বিরস মুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমনকি সে যে এত ভালো হিন্দি জানে সেটুকু পর্যন্ত অভ্যাস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দি বলবে? আর যা সব জ্ঞান আছে তার, সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারি করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দু-বার ঠেক খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এর পরের চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড়ো ইচ্ছে যে খেলারাম বি-কম পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কি আর বি-কম হওয়া যায়?

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায়?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে—কোথায় আর যাবে, বাকি বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম ততক্ষণ বসে উঠে যাব।

—সে তো ঠিক কথা। বলে শোভারাম একটু বাপগিরি ফলিয়ে বলে—খেলারামটা লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজি?

শ্রীপতি বলে—কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশিই হয়। বলে—আমিও তাই বলি। ঝুটমুট ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশ বাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে। বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। খেলারামেরও না হোক বাইশ চব্বিশ হবে। এত বয়স পর্যন্ত এই গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড়ো হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপর শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে এই গদিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত!

সন্ধে পার হয়ে গেল। ইটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁঝবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তাছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সদ্য এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতির চাদরটা খুলে আবার ভালো করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরীর চাপানের মতো আর কী আছে! না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল যেমন লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা-জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর একবার তাকায়। কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারী বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতোজোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো—ঝা চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখি না-দেখি না ভাব করে ব্যাপারীর জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড়ো মুখ খোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্লাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময়ে হাতছিপ্পু করে দু-প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেই সঙ্গে একমুঠো তেজপাতা আর এক গোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখিই পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সবজিবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে নদীয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সবজিওয়ালা টেমি জ্বেলে নিঝুম বসে আছে আলু কপি বেগুন সাজিয়ে। ব্যবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যবসা করা

দু-চক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতোজোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে অন্ধকারে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ও-প্রান্তে দোকান, এখনও বেশ খানিকটা দূর। নদীয়া ডানপায়ের চটিটা তুলে সবজিওয়ালার টেমির আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়েনি, রবারের নলীদুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিঁড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে বাতাসের ভর সয় না। চটিটা আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীয়া। না:, গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্দেক। আর এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো চটির যা দাম হয়েছে আজকাল। চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারী দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদীয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে?

চামার সীতারামের দোকানটা সবজি বাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভালো। একধারে লোহার আড়ত, অন্য ধারে ভুসিমালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দায় নীচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচির দোকান ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো। ছোটো চৌখুপিটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরোনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথাও ওঠে না। আছে কেবল পুরোনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয় বসে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে গেছে সীতুয়া, তবু এখনও গর্তের ভিতর থেকে শকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার-না-কার পুরোনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদীয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদীয়া কপাল দিয়ে আর একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ত জুতোয়।

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খসখস করে দু-চারবার ঘষে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদীয়া বলে—দ্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কিনা।

নদীয়াকুমার ভালো খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে—এ তো ভিখমাঙ্গাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা?

নদীয়া রেগে গিয়ে বলে—বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটো সুতোর টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলে—ফুটো হবে কোথায়? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদীয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না কোনোদিন। খরচের ভয়ে নদীয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল—দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোয় টান দিয়ে বলল—দেখবেন নদীয়াবাবু, জুতো মাথায় মুখে লেগে যাবে। অত ঝুঁকবেন না।

—লাগবে কী, লেগেছে। নদীয়া বিরস মুখে বলে।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এনে ভুসভুসে রবার ফুটো করতে করতে বলে—বাবুলোকেরা মাথা নীচু করতে জানে না তো, তাই ওইসব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

—এঃ, ব্যাটা ফিলজফার। বলে নদীয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড়-কাটাই কলের সামনে নদীয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না।। আজকাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। মাথায় টেরিকাটা পুরুষমানুষের চুল, পরনে পাঞ্জাবি-ধুতি, পায়ে চপ্পল, বাঁ হাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষীর চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নদীয়া। মুখটা অন্য ধারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদীয়া। সময় খারাপ পড়লে মানুষ স্বপ্নটাও ভালো দেখে না। তো সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে উঠে বসে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে—ওঠ, ওঠ রে নদীয়া! নদীয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিলে ফেলে নদীয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুছি পড়ে আছে। নদীয়ার ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জি। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল—খবরদার আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদীয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলের মুঠি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো? তা ছাড়া বড়ো কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদীয়ার সাহস হয়নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদীয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। পড়শীরা ডাক্তার কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদীয়া শশধর হোমিয়োপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে? সেই বড়ো কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সবসময়ে কাছে কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ওই যে খড়-কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদীয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদীয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সীতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার খয়রাতিতে ফেলে দিল। এখন এই হাওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না হোক খরচা হল।

—এই নদীয়া! বউ ডাকল।

নদীয়া এক পলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু। মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল—শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদীয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের টিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন আহাম্মক!

মন্দাকিনী পিছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে বলল—তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নিব্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি! রক্ত বমি হয়ে মরবি যে।

ফস করে নদীয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে—ছেলেপুলে নেই তো কী! হবে।

—হবে? ভারী অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাত চালিয়ে দেয়।

—আলবাত হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি না হয়! তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই!

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদীয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদীয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদীয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে দেখে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে পারে নদীয়া। ওই যে চায়ের ভাঁড় ওর দাম কখনও উসুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হেক্কোড় হল ওই শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনোদিন দাম শুধবে না। বেশি কিছু বলাও যায় না, কবে রাত-বিরেতে এসে দলবল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরোনো তুষের চাদরটা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল নদীয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশি ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদীয়া ভারী দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভালো করে শেষও হয়নি, শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কী গো, নদীয়াদা! তোমার চটির হালটা এরকম হল কবে? এ পরে বেড়াও নাকি? খবরদার রবারের চটি পরো না, চোখ খারাপ হয়। আর ওই কুকুরে-খাওয়া চটি ভদ্রলোকে পরে?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো। নদীয়া আড়চোখে দেখে। বেশ বাহারি জুতো। চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা। রংটাও ভালো। নদীয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে। শ্বাস ফেলে বলে—নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া?

শোভারাম বিস্তর রংঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে! শোভারাম ভেবেচিন্তেই বলে। কারণ, সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদীয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে।

নদীয়া রসিকতা করে বলে—কিনিসনি! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি? না কি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস।

অপমানটা হজম করে শোভারাম। কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোখা চটে লাভ কী! ভালোমানুষের মতো বলে—না গো নদীয়াদা, সে সব নয়। গেল হপ্তায় বৈরাগী মণ্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম। টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেয়ে। তো বৈরাগী মণ্ডল জুতোজোড়া কিনে দিল। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, মনে হচ্ছে এক সাইজ ছোটো কিনে ফেলেছি। বেদম টাইট হচ্ছে। দ্যাখো তো, তোমার পায়ে লাগে কিনা—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয়। নদীয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কী! ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়!

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা একরকম রয়ে গেলে নদীয়াদা! তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল। নাও তো, পরে দ্যাখো! পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেব। ত্রিশ টাকায় কেনা, তা সে কত টাকা জলে যায়। পরে দ্যাখো।

নদীয়া এবার একটু নড়ে। বলে—কত টাকা বললি?

শোভারাম হাসে, বলে—ত্রিশ টাকা। মূর্ছা যেয়ো না শুনে। ওর কমে আজকাল জুতো হয় না।

নদীয়া উঠে এসে জুতো জোড়া পায়ে দিল। পাম্প-শুর মতোই। কিন্তু ঠিক পাম্পশু নয়। বেশ নরম চামড়া। দু-চার পা হেঁটে দেখল নদীয়া। আরে বা! দিব্যি ফিট করেছে তো! এই শীতে পায়ে বড়ো কষ্ট। চামড়া ফেটে হাঁ করে থাকে, ভিতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে কষ্ট হয়। তা ছাড়া পাথরকুচির রাস্তায়, অসমান জমিতে পা পড়লে হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোড়া পরেই নদীয়া টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দু-খানা ঘরবন্দি হয়ে গেল। ধুলোময়লা, পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশি হয়ে বলে—বাঃ গো নদীয়াদা, জুতোজোড়া যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটোলোকী পায়ে কি আর ওসব পোষায়! তুমিই রেখে দাও! আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেব। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহাড় নিয়ে বসে আছে।

নদীয়া একটু দ্বিধা করে বললে—টায়ারের চটি কি সস্তা নাকি রে? হলে বরং আমিও একজোড়া—

—আরেþ না না! শোভারাম মাথা নেড়ে বলে—সে বড়ো শক্ত জিনিস। তোমরা পায়ে দিলে ফোস্কা পড়ে কেলেঙ্কারী হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলিমজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ বিশ টাকা দিয়ে দিয়ো, তোমার ধর্মে যা সয়।

সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে—ও বাবা, বলিস কী সব্বোনেশে কথা, ডাকাত কোথাকার! দশ-বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ! আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদীয়ার দিকে। তারপর খুব ধীরে বলে—তোমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে নদীয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠান্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কীরকম ধারা রুগি তুমি? দুনিয়ায় কত কী আরামের জিনিস চমকাচ্ছে,—তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছ।

নদীয়া না-না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালোও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড়ো বাহার। আরামও কম কি! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে। নিজে রোজগার করতে নেমে আর বাবুগিরি হয়নি। বলল—দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে!

—দশ কি বলছ? বিশ টাকা না হয় পনেরোই দিয়ো। সেও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোটো হয়, আর তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনও বাজার ঘুরলে বিশ-পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

—বারো টাকা দেব। ওই শেষ কথা। যা, ও মাসে নিবি।

হ্যা-হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে—বারো? তার চেয়ে এমনিই নাও না। ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদীয়াদা!

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে। নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদীয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাই মাল যদি গছিয়ে দিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকোনো, নদীয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কি না কে জানে। নদীয়ার কোনো কাজই তো সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী, নদীয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার জুতোজোড়া দেখে নেয়। মিটমিটিয়ে একটু হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা ... ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো!

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ সিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দুজনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে। তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তার পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদীয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদীয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস ফেলে আড়চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল, এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ-তেইশ বছরের আই জোয়ান চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কী হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায়। তেমনি মাস্টারজিকে ভয় খায় খেলা। মাস্টারজি সটাং ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে, কষাকষ হিন্দি বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারী বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কী বললাম বলো তো।

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়। ভেলুরাম গদির ওপর বসে ছানিপড়া চোখে নাতির দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে থাকে।

শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারের মধ্যে শীতের কুয়াশায় নেমে গেল। তার ভিতরে কত বিদ্যে গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে আসতেই শুনল, দাদু ভেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে—কোথায় সারাটা দিন লেগেছিলি চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়! পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে বসে থেকে চলে গেল! জুতোচোরের ব্যাটা!

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশায় মাখা। একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে। বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছো-বাজার পেরোবার সময়ে। তখনও কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্যে বসে আছে কুপি জ্বালিয়ে। এইসব লোকেরা শেলীকীটস পড়েনি, শেকসপীয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য, তবু বেশ বেঁচেবর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে? সত্য বটে একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন—ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়। যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন দিতে পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও টের পায়। এই যে গঞ্জের পরিবেশ, ওই ম্লান একটু কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না, কিংবা ফটিকচাঁদের টিবিতে একা শিরীষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনো মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো, তবে সে বইয়ের জগতের তালেবর লোক। বিস্তর পড়াশোনা তার। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায়নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও খায়। তবু কী একটা খাঁকতি থেকেই যাচ্ছে। সে কি ওই উপলব্ধি বা দর্শনের?

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎস্নামাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল।

হচ্ছে না। মনের পর্দায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে!

পাঁচ-সাতটা লোক হাল্লা-চিল্লা করতে করতে কাছে এসে পড়ল। সব কটা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বুঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—রাম রাম মাস্টারজি, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নীচু-নজরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিওলা ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর ঢিবি—

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো! বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজি? আমার বাপকে আর খেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-সুতরো হয়ে গেছি। ভালো লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়োই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছেঁকে নেওয়ার নেই। পুথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজি। ফটিকচাঁদের ঢিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে—হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফটিকচাঁদের ঢিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হিরে-জহরত একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় ঢিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ ব্যাং আর ইট পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয়নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে ঢিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদীয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল। নতুন জুতোজোড়া পুরোনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাপারের তলায় বগলসাই করে নিয়েছে। পায়ের পুরোনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধহয় নদীয়াকেই গালমন্দ করছিল। করবেই। সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশায় জ্যোৎস্নায় যেন দুধে মুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোয় শীত সেঁধোচ্ছে। বাবাকেলে তুষের চাদরটায় মাথামুখে ঢেকে হাঁটছিল নদীয়াকুমার। চৌপথীর কাছে বাড়ি, মাঝপথে ফটিকচাঁদের ঢিপিতে কারা যেন গোপনে কী সব করছে। দু-চারটে ছায়া ছায়া লোকজন দেখা গেল। নদীয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভালো নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে মাঝে নতুন জুতোজোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুক ফাক করে সুখের হাসি হেসে ফেলছে নদীয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিন দশ বাদ দিয়ে পরবে। চোরাই জুতো এর মধ্যে যদি খোঁজখবর হয় তো গেল তেরোটা টাকা। দামটা বেশিই পড়ে গেল। তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কি আর জুতোনো যায়?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদীয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে জবা গাছটার তলায়। মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত? তার বাড়িতে আবার মেয়েমানুষ কে আসবে?

নদীয়া বলল—রাম রাম, কে?

—আমি।

নদীয়া ফের আঁতকে উঠে বলে—কে আমি?

—আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, ঊর্ধ্বমুখে তার পানে তাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষমানুষের মতো চুলওলা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

'আঁ, আঁ' করে ওঠে নদীয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী!

—তোমার এই সাজ? ভারী অবাক হয় নদীয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে—কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি! সদরের কোন ডাইনিকে পছন্দ করে এসেছ, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে ঘটস্থাপনা করবে—তাতে বুঝি ছাই দিলাম। ঝ্যাঁটা মারি—

এইসব বলতে বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদীয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কী টেনে হিঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদীয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কি তবে ফিরল! নতুন জুতো! বউ!

গহিন রাতে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুঁড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে। নদীয়া খুব আহলাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী। এইরকমই অশান্তি করত।

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদীয়া বলে—কাঁদো কেন? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড়ো দুঃখী লোক, কেঁদো না।

মন্দাকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে—আমি এখন চুল পাব কোথায়! কত লম্বা চুল ছিল আমার! তুমি কি এখন আর আমাকে ভালোবাসবে চুল ছাড়া!

—দূর মাগি! নদীয়া আদর করে বলে—চুলে কী যায় আসে!

ভোর রাত পর্যন্ত সাত মাতালে ঢিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ বের করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলশি বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরও। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখণ্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী!

সাত মাতালের বুকের ভিতরে জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাতাড়ি কোদাল, গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প অল্প মাটি সরে, আর বস্তুটা বেরোয়। কী এটা? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে কড়া বা কলশি নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো জিনিস। ফটিকচাঁদের বসত বাড়িটা নাকি?

খোঁড়াখুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফোসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্যরকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পষ্ট। সাত মাতাল চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরোনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর ; কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়েছিল এইখানে। জংধরা লোহা হলদে রং ধরেছে।

কেউ কোনো কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম।

খেলা দুলে দুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা! ব্যাটা বোধহয় ভদ্রলোক হবে একটা!

ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

উকিলের চিঠি

ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝাঁক তাড়াতে খেতের মধ্যে নেমে গেল।

গোসাবা থেকে দুই নৌকো বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভিতর বাগে কোনো বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড়ো কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবনবয়স। মনটা সব সময়ে অন্যধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আজকাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে যে উনুন ফেলে দৌড়োবে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড়ো অতিথিপরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তাছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভিতর-বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে পুকুরে। বাঁকে করে দু-বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছতলায় দাঁড়াল।

কালও বড্ড ঝড়জল গেছে। ওই দক্ষিণধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়সওয়ার ঝড় আসে মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়োয়, ডিমের মতো বড়ো বড়ো ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটিদশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে খেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে সব। আমতলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে, ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝাঁক উড়িয়ে দিল। ট্যাঁ ট্যাঁ ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয়, মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমনধারা লোক যেন! রোগা-ভোগা ভীতু-ভীতু চোহারা, পেটে সব খোঁদল-খোঁদল উপোসী ভাব। জুল-জুল করে চারধারে চায় আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল, ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ময়লা ঘেমো তেলচিটে গেঞ্জিটা খুলছে না, বুকের পাঁজর দেখা যাবে বলে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁটে এসে বলল—আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

খেত ভর্তি আনাজ। অভাব কীসের? মিছরি বলল—এক্ষুনি এসে পড়বে। খেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

—একটু হলুদ লাগবে, আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয় তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কী! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই সে কি আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল—সব দেওয়া হচ্ছে। ডাল চালটা ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সংকোচের গলায় বলল—বেলা হয়েছে।

সে কথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জিতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোত্থেকে এল, কোথাই বা যাচ্ছে? ছোটো বোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয় তবু বোনে বোনে ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রকপরা চিনি তিনটে ব্যাং লাফ দিয়ে মসলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে উঠোনে রেখে ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এই যে মসলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দ্যাখো সব, নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নীচু হয়ে দেখল।

বলল—উরে ব্বাস, গরমমসলা ইস্তক। বাঃ বাঃ, এ নাহলে গেরস্ত!

চিনি দুটো নাচুনী পাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল—যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড্ড মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোওয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নীচু ডালের একটা পাকা আম দুবার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই খ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনও পড়েনি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনো লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়িতে হেসেখেলে সময় যায়। কিন্তু ওই চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোটো কাকা প্রায় সমানবয়সি। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ-মাসের ছোটো। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে 'ছোটো কাকা' বলে ডাকে।

ছোটো কাকা মিছরির নাকের ডগায় দু-বার নীলচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল—রোজ যে আমার কাপড় কাচতে খিটখিট করিস, আর করবি?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত—করব, যাও যা খুশি করোগে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল—কাপড় কাচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবু ও কাচতে বড়ো ঘেন্না হয়।

—ইঃ ঘেন্না! যা তাহলে, চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাব।

—আচ্ছা, আচ্ছা, কাচব।

—আর কী কী করবি সব বল এই বেলা। বৌদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম?

—না।

—দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি?

—মাইরি না।

—মনে থাকে যেন! বলে ছোটোকাকা চিঠিটা শুঁকে বলল—এঃ, আবার সুগন্ধী মাখিয়েছে!

বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকোয় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটাপথ। কত দূর যে! কত যে ভীষণ দূর!

খামের ওপর একধারে বেগনে কালিতে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়—ফ্রম বসন্ত মিদ্দার, বি.এ.এল.এল-বি অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম ঠিকানা লেখা অন্যধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায় বুঝি একফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলেছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড়ো যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময়

নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে—ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কি আবার গ্যাঁজা টানতে বসে নাকি দ্যাখ।

বড়ো বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হাভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর তারা বাবুর সঙ্গে এক চাটাইতে বসে কথাবার্তা বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধসেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি খেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল—বিপিনদা, তোমার হল? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে—বিশটা মদ্দ খাবে, কম তো লাগবে না। হুট বলতে হয়ে যায় নাকি! যাচ্ছি, বলো গে হয়ে এল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজ। কাগজের ওপরে আবার বসন্ত মিদ্দার এবং তার ওকালতির কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড়ো ভালোবাসে।

হুট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখো, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে।

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে একটা ছোট্ট ডোবায় কে একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিলবিলিয়ে একশো জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের জোঁক ছাড়াচ্ছে। খেতের উঁচু মাটির দেয়ালের ওপর কোনো কায়দায় একটা গোরু উঠে পড়েছে কে জানে। এইবার বাগানের মধ্যে হড়াস করে নেমে আসবে।

নামুকগে। কত খাবে। বাগান ভরতি সবজি আর সবজি। অঢেল, অফুরন্ত। বিশ বিঘের খেত। খাক।

উকিল লিখেছে—হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতেষু প্রাণপ্রতিমা আমার......। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে। লিখবে না! কত লেখাপড়া করেছে।

হু-হু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের।

উকিল লিখেছে—ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি! একটু থমকে যায় মিছরি। কথাটা কী! ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধহয় তাড়াহুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত হয় ভুল মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাঁক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বলল—এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধহয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল—হবে হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি!

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারও মুখে কথা নেই! মিছরি নড়ল না। চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝাঁক আসছে গাঙ পেরিয়ে। আসুক।

ছোটোকাকার এক বন্ধু ছিল, ত্র্যম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ বাড়িতে। বিয়ের পর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনোদিন মনের কথা কিছু বলেনি তাকে ত্র্যম্বক। কিন্তু খুব ঘন ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দশবার আগুন চাইত।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে—ত্রিশ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবি, বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর এক বছর চার মাস হল ঠিক ঠিক। আর কি পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়, তার ওপর পুরুষমানুষ, লাফ ঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ, লঙ্কাগাছে জল ঢেলে কি বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনা জলে নোনাগাঙে জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি ......

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আম গাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলার ময়লা মোটা পৈতেটা বেরিয়ে গেঞ্জির ওপর ঝুলে আছে। বড্ড রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জি খোলেনি পাঁজর দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোটোকাকাকে বলল—বউ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব কদিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি বাদার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেব। মশাই, কোনোখানে একটু ঠাঁই পেলাম না আমরা। বাঁচতে তো হবে নাকি!

ছোটোকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে আসতে এতদূর এসে পড়েছি আর একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দুজনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

উকিলবাবু আর কী লেখে? লেখে—সোনামণি, আমার তিনকুলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধরো। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু হইবেই। ওকালতিতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোনো-না-কোনো পেতনি এসে আমার জায়গায় ডেঁড়েমুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভরতি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কি বাঁচব উকিলবাবু?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁ-হাতে সকলের পাঁচ-ছটা করে কাঁচা লঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি এখনও নামেনি। সবাই কাঁচা লঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কী লেখে আর? লেখে—বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায়? ভালো দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো.....

গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে—আস্তে খা। ফুঁইয়ে ফুঁইয়ে ঠান্ডা করে নে।

—উঃ, যা রেঁধেছ না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে।

মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছতলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড়ো তেজ।

দলের মাতব্বর জিজ্ঞেস করে মিছরির বাবাকে—ওদিকে কি কোনো আশা নেই মশাই? অ্যাঁ! এত কষ্ট করে এতদূর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড়ো কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে—আশা হারাইয়ো না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে...।

ঘণ্টাধ্বনি

সাঁঝবেলাতে গোয়ালঘরে ধুনো দিতে গিয়ে কালিদাসী শুনতে পেল, রামমন্দিরে খুব তেজালো কাঁসি বাজছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

গুণ্টু দুপুর থেকে বাড়ি নেই। আলায় বালায় সারাদিন ঘোরে। মাথা-গরম ছেলে। যখন তখন হাফ-পেন্টুল খুলে পুকুরে ঝাঁপায়। চৌপর দিন জলে দাপাদাপি করে। কবে জলের ঠাকুর টেনে নেয় ছেলেটাকে! তবে ভরসা এই, গুণ্টুর প্রাণে ভক্তি আছে। সন্ধে হলেই রামমন্দিরে গিয়ে বুড়ো বাজনদার আফিংখোর গোবিন্দর হাত থেকে কাঁসি কেড়ে নিয়ে নেচে নেচে বাজায়। ওই বাজাচ্ছে এখন। কাঁইনানা কাঁইনানা।

কেলে গোরুটার নাম শান্তি। ভারী নেই-আঁকড়া। কালিদাসীকে পেয়ে গলা এগিয়ে দিল। ভাবখানা—একটু চুলকে দাও। তা দেয় কালিদাসী। খানিকক্ষণ তুলতুলে কম্বলের মতো গলায় আঙুলের কাতুকুতু দিতে থাকে। অন্য গোরু শিপ্রা ফোঁসফাঁস করতে থাকে। শিং নাড়া দেয়; কালিদাসী বলে—রোসো মা তোমাকেও দিচ্ছি। এ মুখপুড়ির আর কিছুতেই আরাম ফুরোয় না।

মন্দিরে আরতি হচ্ছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের এই সময়ে প্রায়দিনই ভাব হত। ভাব হলে হাত-পা টানা দিয়ে চিত হয়ে পড়ে মুখে গাঁজলা তুলে নানা কথা বলত। সেসব কথা স্বয়ং ভগবানের। একবার কালিদাসীকে বলেছিল—ও, কালী, ভুরের পায়েস খাব, এনে দিবি?

তা ভুরে গুড় দিয়েছিল কালিদাসী। একটু-আধটু নয়, আধ মণেরও বেশি হবে। তাই দিয়ে সেবার বিরাট পায়েস ভোগ লাগানো হল মন্দিরে।

চক্কোত্তিমশাই এখন বয়সে পঙ্গু হয়ে টিনের চারচালায় দাওয়ায় চৌকি পেতে বসে থাকে দিনরাত। তামাক খায়। সেজো ছেলে মনোরঞ্জন এখন মন্দিরের সেবাইত। কালিদাসীর এখন আর যাওয়ার সময় হয় না। প্রায়ই ভাবে একদিন গিয়ে বসে আরতি দেখবে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার গোয়ালঘরে কালিদাসীর ভালো করে ঠাহর হয় না কিছু। টেমি হাতে এগিয়ে গিয়ে খড়ের গাদা গোছ করতে হাত বাড়িয়েই মধ্যের আঙুলে কাঁকড়াবিছের হুল খেয়ে উঃহুঃ করে ওঠে।

ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম কাঁকড়াবিছের হুল খেয়েছিল কালিদাসী তখন যন্ত্রণার চোটে সে কী দাপাদাপি! হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল! পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সে বিষ ব্যথা থানা গেড়েছিল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে।

তারপর মাসটাক যেতে না যেতে ফের একদিন হুল দিল। আবার দাপাদাপি। আবার হাসপাতাল। কিন্তু কাঁকড়াবিছেরা কালিদাসীকে সেই থেকে কেমন যে পেয়ে বসল। কাছে পেলেই হুল দেয়। এই ত্রিশ বছর ধরে মাসে দু-তিনবার দিচ্ছে। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন, তেমন লাগে না।

কালিদাসী টেমি রেখে খানিক কাঁচা গোবর বাঁ-হাতের মাঝের আঙুলটায় বসাল ঠিক যেমন গোলাপগাছের কলমচারার ডগায় লোকে গোবরের ঢিবলি দেয়।

কালিদাসীর শরীরটা কাঁকড়াবিছের বিষে ভরে গেছে। এখন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়।

আশ্চর্য এই বাচ্চা দেওয়ার সময়ে মেনি বিড়ালটা গোয়ালঘরে এসে ওই খড়ের গাদায় বাসা বাঁধে। ফুলি কুকুরটা তো ফি-বছর খড়ের মাচার নীচে গর্ত করে চার-পাঁচটা ছানা বিয়োয়। গোরু দুটো সম্বচ্ছর এই ঘরে রাত কাটায়। এগুলোকে কোনোদিন হুল দেয়নি পোড়ারমুখোরা। মানুষের ওপর যত ওদের রাগ। আর মানুষের মধ্যে আবার সবচেয়ে ঘেন্নার হল ওদের কালিদাসী হতভাগী।

আঙুলে-গোবরে করে টেমি হাতে কালিদাসী গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের কপাটটা টেনে দিতে দিতে আপনমনে বকবক করছিল—ঝ্যাঁটাখেকো, কেলেঘেন্না, খালভরাগুলো কোথাকার! কালিদাসীর কাছে বড়ো জো পেয়েছিস।

নীচের তলার নতুন ভাড়াটে হেম ঘোষ, নতুন বিয়ে করেই মা-বাপ-ভাই ছেড়ে আলাদা বাসা করে উঠে এসেছে। তার বউ রেবা নাকি বড়োঘরের মেয়ে, কাজকর্ম করতে পারবে না। শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে থাকত বলে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বেধে পড়ত। হেম ঘোষ বউয়ের পক্ষে। বাড়ি ছেড়ে উঠে এল। চাকরি তার তেমন কিছু নয়। দাশনগরে এক তালা তৈরির কারখানায় চাবির খাঁজ কাটে। ত্রিশ টাকার ঘর ভাড়াও দু-মাস বাকি ফেলেছে। তবু বউয়ের সুবিধের জন্য সবসময়ে কাজ করার বাচ্চা ঝি বহাল করেছে, তার ওপর ঠিকে কাজের লোক তো আছেই।

দাওয়ায় বসে লুঙ্গি পরে হেম বিড়ি খাচ্ছিল। কালিদাসীর বকবকানি শুনে বলল—কী হল দিদিমা? কাঁকড়াবিছে কামড়াল বুঝি?

কালিদাসী বলল—তা কামড়াবে না কেন বাবা? কালিদাসী যে ভালো-মানুষের মেয়ে হয়ে শতেক পাপ করেছে।

হেম ঘোষ বিড়িটা ফেলে একটু তটস্থ হয়ে বলে—এ তো বড়ো মুশকিলের কথা হল দিদিমা! এ বাড়িতে বড্ড দেখছি কাঁকড়াবিছের উৎপাত! রেবাকে যদি কামড়ায় তো রক্ষে নেই।

কালিদাসী মনে মনে বলে—বউকে তাজমহলে নিয়ে গিয়ে রাখো গে যাও। দেখালে বটে তোমরা বাপ! আজকালকার রত্তি মেয়েরা কী করে যে গোটাগুটি পুরুষ মানুষগুলোকে হজম করে বসে থাকে!

ওপরের বারান্দায় উঠে আসতে আসতে কালিদাসী ফের মন্দিরের শব্দ শোনে। গুণ্টু কাঁসি বাজাচ্ছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

টেমি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় কালিদাসী। বুড়ো বয়সের ভুল। মন্দার মা বারান্দায় বসে উনুন সাজাচ্ছে, এক্ষুনি দেশলাই চাইবে। টেমিটা না নেবালে, দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচত। ছাদে গিয়ে উনুন ধরাতে মন্দার মা না হোক চার-পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবে।

এ সবই কালিদাসীর জ্বালা। সংসারে আছে এক উড়নচণ্ডী ছেলে, আর মেয়ের ঘরের নাতি ওই গুণ্টু। তবু সংসারের হাজার চিন্তায় কালিদাসীর ডুবজল।

।। দুই ।।

কানাই মাস্টারের আজ সারা দিন বড়ো হতভম্ব লাগছে।

এমনিতে কানাই বড়ো নিরীহ লোক। তিন বছর হল তার দশ বছর বয়সি ছেলেটা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী প্রায়। শরীরের সব কটা হাড়ের জোড়ে বিষযন্ত্রণা। হাঁটু, কনুই, কব্জি সব ফুলে আছে। শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঠারেঠোরে বলেছে, ভালো হওয়ার রোগ নয়।

কানাই মাস্টারের একটাই ছেলে, আর মেয়ে দুটো। তার নিজের বয়স বেশি নয়, চল্লিশ-টল্লিশ হবে। কিন্তু এ বয়সেই বড়ো বুড়োটে মেরে গেছে কানাই। ছেলের চিন্তা উদয়াস্ত ভিতরটা কুরে খায়। তার ওপর কটা টিউশনি করে রসকষ আরও মরে যাচ্ছে ক্রমে।

আজ হল কী, ইস্কুলের আট ক্লাসে থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিচ্ছে। মদন নামে ধেড়ে ছেলে আছে একটা। তার গলায় আবার কালো তাগায় বাঁধা রুপোর তক্তি। রাঙামুলো চেহারা। কোনোকালে পড়াশুনোর ধার মাড়ায় না। পড়া জিজ্ঞেস করলে শুভদৃষ্টির সময়ে নববধূ যেমন চোখ নামায় তেমনি নতচোখে চেয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার বাপ বড়ো কারবারি, তাই মাসকাবারে ইস্কুলের বেতন কখনও বাকি পড়ে না। সেই কারণে কেউ বড়ো একটা ঘাঁটায়ও না মদনকে। আছো মদন, থাকো মদন গোছের ভাব করে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়। প্রতি ক্লাসে তিন-চার বছর করে থাকলে মদনের বাবদ ইস্কুলের একটা স্থায়ী আয় তো বহাল রইল। এমনিতেই ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ষাট-সত্তরজনই ডিফলটার। কারও সাত-আট মাসের বেতন

বাকি পড়ে আছে। ধমক চমক করলে গারজিয়ানরা এসে হেডস্যারের হাতে-পায়ে ধরে। সেইসব গারজিয়ানরাও 'দিন আনি, দিন খাই' গোছের। কেউ বিড়ি বাঁধে, কারও তেলেভাজার দোকান, একজন গামছা ফিরি করে ময়দানে। এই রকম সব। তাদের মধ্যে মদনের বাবা হচ্ছে নৈবেদ্যর কলা।

মদনা ক্লাস এইটে পড়লেও তো আর ছেলেমানুষ নয়। বয়সের ডাক দিয়েছে। শরীর জাম্বুবানের মতো বড়োসড়ো।

বয়সের দোষই হবে। রোজই ইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে বীণাপাণি ইস্কুলের মেয়েরা যায়। ইস্কুলের বড়ো ক্লাসের ধেড়ে ছেলেরা এই সময়টুকুতে রাস্তার মোড়ে, সামনের বারান্দায়, পাশের মাঠে জমে থাকে। কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট টানে, কেউ সাইকেলে করে বোঁ চক্কর মারে। যার যা আছে সব দেখায় মেয়েদের। হাসি-টাসি তো আছেই। ছেলেদের এইসব বোকামি দেখে মেয়েদের কেউ কেউ হাসিতে ঢলাঢলি করে যায়, কেউ গম্ভীর মুখে দৌড়-হেঁটে পালায়, দু-একজন 'জুতো মারব, লাথি মারব' গোছের কথা বলে শাসিয়েও গেছে। নিত্যিকার ঘটনা, কারও গায়ে লাগে না। আজ হল কী, থার্ড পিরিয়ডে যখন কানাই ক্লাস নিচ্ছে তখন টুকটুক করে একটা ফুটফুটে বছর দশেকের মেয়ে সোজা সরল পায়ে ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পাখির কণ্ঠে বলল, মাস্টারমশাই!

কানাই অবাক। মেয়েটার পরনে ইস্কুলের সাদা ইউনিফর্ম, হাঁটু পর্যন্ত বাহারি মোজা। মুখচোখ ভারী তিরতিরে সুন্দর।

কানাই মাস্টার মুগ্ধ হয়ে বলল, এসো মা। কী হয়েছে বলো তো?

মেয়েটা ক্লাসে ঢুকে একটা ভাঁজকরা কাগজ কানাইয়ের সামনের টেবিলে রেখে বলল, মাস্টারমশাই একটা দুষ্টু ছেলে আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় আমার হাতে এটা দিয়ে বলল, এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পোড়ো। কী সব বাজে কথা লেখা আছে দেখুন। ওই ছেলেটা। বলে মেয়েটি মদনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—

কানাই চিঠিটা খুলে দেখে তাতে লেখা—প্রীয়তম রোজী আমি তোমাকে ভালোবাসে আমার মোনের কথা তুমি কী বুঝিতে পারো না? কিস জানিবে। তোমার প্রীয় মদন।

চিঠির ওপর শ্রীকালী লিখতেও ভুল হয়নি।

কানাই দুটো কারণে চটে গিয়েছিল। এক তো মেয়েদের চিঠি দেওয়া সাঙ্ঘাতিক বেয়াদবি। তার ওপর এইটুকু একটা চিঠিতে এতগুলো বানান ভুল!

—তুমি এসো মা, আমি দেখছি। এই বলে কানাইমাস্টার রোজিকে বিদায় করে মদনকে ডাকল। যখন ডাকল তখনই একটা বেসামাল রাগ পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছিল তার। সেই রাগে হাত থরথর করে কাঁপে, মাথাটা ঘোলা লাগে, দাঁতে দাঁতে বাতাস পেষাই হয়।

মদন কাছে আসতেই বিনা প্রশ্নে প্রথমে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ঠক করে টেবিলে ঠুকে দিল কানাই। সেই সঙ্গে পিঠে যত জোরে সম্ভব এক কিল। বোঝা গেল মদনের চেহারাটা বড়োসড়ো হলেও গাটা নরম। কিলটা নরম চর্বির থাকে এমন পড়ল যেন জলে কিল মারবার মতো মনে হল।

মদন এমনিতে ঠান্ডা ছেলে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। আজও কাড়ল না। তাইতেই কানাইয়ের মাথাটা আরও বিগড়ে গেল। হারামজাদা, গিদ্ধড়, পাজি, বদমাশ, নরাধম ঠিক নামতার মতো মুখে বলে যাচ্ছে কানাই আর মারছে। সে কী মার! মারের চোটে একবার গিয়ে দেয়ালে পড়ল, একবার ব্ল্যাকবোর্ডে ফার্স্ট বেঞ্চের ডেস্কের কোণায় লেগে কপালটা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সমস্ত ক্লাস পাথরের মতো নিশ্চল। শুধু সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বেধড়ক ঠ্যাঙানি চলেছে তো চলেইছে। ডাস্টারটা দিয়েও কানাই মাস্টার মদনের চোয়াল, মাথা কান ফাটিয়ে দিয়েছিল আজ।

এরকম মার বড়ো একটা দেখা যায়নি স্মরণকালে। আর কানাই মাস্টার নিজের ছেলের অসুখ হওয়ার পর থেকেই মারধর করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের খ্যাপা মার দেখে আশপাশের ক্লাস ফেলে মাস্টারমশাইরা ছুটে এসে দরজার কাছে ভিড় করে ফেললেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে বা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। শেষ

পর্যন্ত হেডস্যার এসে মাঝখানে পড়ে সেই আসুরিক ব্যাপার থামালেন। মদন তখন রক্তমাখা মুখে, ফাটা ঠোঁটে, ফোলা গাল, ছেঁড়া চুল আর তোবড়ানো জামাকাপড়ে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে—স্যার, আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! জুতো মারুন স্যার, আমি আজই সুইসাইড করব স্যার।

মদন এত কথা কখনও বলে না। মার খেয়ে আজ তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। মার খাবার পরও তার চেঁচানি আর থামে না। কেবল কাঁদে আর আরও মারতে বলে, সুসাইড করবে বলে চেঁচায়। নিজের ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে সে সারা ইস্কুলময় দৌড়োদৌড়ি করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

কানাই মাস্টারের কুপিত বায়ু যখন ঠান্ডা হল তখন সে মদনের আচরণ দেখে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলেটার হল কী?

টিচার্স রুমে কানাই মাস্টারকে সবাই ধরে এনে পাখার তলায় বসিয়েছে । ইস্কুলের সামনে পাবলিকের ভিড় জমে গেছে। এই অবস্থায় মদন দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মাস্টার- মশাইদের পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে বলছে, লাথি মারুন স্যার জুতো মারুন স্যার। আবার উঠে গিয়ে আর একজনের পায়ে পড়ে ওরকম বলে।

হেডমাস্টারমশাই এসে কানাই মাস্টারের কানে কানে বললেন—ছেলেটার ব্রেনটা বোধ হয় ড্যামেজ হয়েছে। আপনি আর স্পটে থাকবেন না, বাড়ি চলে যান।

শুনে কানাইয়ের শরীর হিম হয়ে গেল। আর বুকের কী ধড়ফড়ানি! শশী বেয়ারা রিকশা ডেকে দিল। কানাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই শয্যা নিয়ে রইল। সারাদিন ভাবছে—এ আমার আজ কী হয়েছিল? এ আমি করলাম কী?

বিকেলের দিকে একবার উঠে এসে নিজের ছেলের বিছানায় বসল কানাই। কৃশ করুণ মুখ তুলে ছেলেটা চাইল বাবার দিকে। একটু হাসল। সে হাসি কান্নার ওপরকার সরের মতো। বড়ো সহ্যশক্তি ছেলেটার। কত সহ্য করছে! কানাই ভাবে, ওর ব্যথাগুলো কেন আমার হয় না?

ভাবতে ভাবতে বিছের হুলের মতো মদনের কথা মনে পড়ে। বড়ো যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে। এত পাপ কি ভগবান সইবেন। মদনের যদি ভালোমন্দ কিছু হয় তো তার কর্মফল কানাইকেও অর্সাবে। যদি সেই পাপ ছেলেটার ওপর এসে পড়ে?

বাইরে কে ডাকছে। কানাইয়ের বউ দিনরাত কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে আজকাল বড়ো রোগা হয়ে গেছে। চেনা যায় না! সে এসে বলল, ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে।

বুক কেঁপে গেল। তবু নিজেকে শক্ত করে উঠে এল কানাই।

বড়ো ক্লাসের কয়েকটা ছেলে গম্ভীরমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। একজন মাতব্বরগোছের ছেলে বলল—স্যার মদনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—হাসপাতাল! বলে কানাই হাঁ।

অন্য একটা ফচকে ছেলে বলল—আপনি ঘাবড়াবেন না স্যার। কয়েকটা স্টিচ পড়েছে মাত্র। আর কিছু নয়।

ছেলেরা চলে গেলেও হতভম্ব ভাবটা যায়নি কানাই মাস্টারের। ঘর থেকে কয়েকদিন না বেরোনাই ভালো। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই ক্ষেপে আছে। কে কোথা থেকে আধলা ছুঁড়বে হয়তো। নাহলে ধরে ঠ্যাঙালেই বা কী করার আছে! সবচেয়ে চিন্তির হয় যদি মদনের বাবা পুলিশের কাছে যায়। যায় নি কি আর! গেছে। পুলিশও বোধহয় এতক্ষণে রওনা হওয়ার জন্য কোমরের কষি বাঁধতে লেগেছে। রক্তপাতে ফৌজদারি হয় সবাই জানে।

ছেলের মা এসে বলল, বাজারে যাও। তেল-মশলা কিছু নেই।

শ্বাস ছেড়ে কানাই ওঠে। সন্ধের মুখে রামমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। সঙ্গে ঠনঠন কাঁসির আওয়াজ রোজ ভালো লাগে না। আজ লাগল। ঘণ্টা ডাকছে।

কানাই বেরিয়ে পড়ে। চোখে জল আসছে। বুকটা কেমন করে। কোনোকালে মন্দিরে যায় না কানাই মাস্টার। আজ ভাবল একবার যাবে। বুড়ো চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। সবাই বলে লোকটা খুব বড়ো মানুষ। এককালে তাঁর ভর হত। জিজ্ঞেস করবে—আমার পাপ কি ছেলেতে অর্সাবে ঠাকুর?

।। তিন ।।

রেবার গানের মাস্টারমশাই এসেছে। লোকটা ছোকরা, তার উপর গান শেখায়। এসব লোক বড়ো বিপজ্জনক হয়।

তাই প্রথম প্রথম গানের মাস্টার এলেই হেম গিয়ে ঘরে মোড়া পেতে বসে সব লক্ষ করত। গানের আড়ালে আবডালে দুজনের কোনো হেলন দোলন নজরে পড়ে কিনা।

একদিন রেবা ধমক দিল মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর। বলল—সুরের কিছু বোঝো না, তবু সামনে গিয়ে অমন করে হাঁ করে বসে থাকো কেন বলো তো? তুমি সামনে থাকলে আমার গাইতে বড়ো লজ্জা করে। আর কখনও ওরকম করবে না বলে দিচ্ছি।

কপাল এমনই যে হেমের বউ রেবা বেশ সুন্দরীই। সাদাটে রং, লম্বাটে গড়ন, মুখখানা মন্দ নয়, তার ওপর চোখ দুখানা ভারী মিঠে। এমন করে তাকায় যেন সবসময় বড়ো অবাক হয়ে আছে। এইরকম বউ যার থাকে তার বড়ো জ্বালা।

হেমের আজকাল বার বার ডাইসে হাত পড়ে যায়। গরম লোহার ছেঁকাও বিয়ের পর থেকে বড্ড বেশি খাচ্ছে হেম। কারখানায় কাজের সময়ে অন্যমনস্ক থাকলে আরও কত বিপদ হতে পারে। রেবার মতো সুন্দরী বউ জুটবে এমন ভরসা তার ছিল না কখনও, তবু কোন পুরুষ না বিয়ের আগে সুন্দরী বউয়ের কথা ভাবে। হেমও ভাবত। কিন্তু এ জ্বালা জানলে বিয়েতে বসবার আগে আর একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখত সে।

বিয়ের পর একদিন হাওড়ার খুরুট রোডের কাছে সিনেমা দেখতে গেছে। টিকিট কাটবার পর শো শুরু হতে দেরি আছে দেখে হেম রেবাকে নিয়ে লেমোনেড খেতে গেল। রেবা লেমোনেড দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি খেল। রেবার বড়ি খাওয়ার দৃশ্যটা হাঁ করে দেখছিল হেম। দেখতে গিয়ে এত মজে গিয়েছিল যে সে নিজেও রেবার মতো ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে বড়ি গেলার মতো ভাব করে ফেলেছিল নিজের অজান্তে। তারপর যখন রেবা লেমোনেডের ঝাঁঝে মুখচোখ কোঁচকালো তখন তাই দেখে হেমেরও কোঁচকালো। আর এইসব হওয়ার সময়ে দোকানের চওড়া আয়নায় হেম হঠাৎ দেখতে পায় তিন-চারটে বখা ছেলে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রেবার দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি বলাবলি করছে।

ভ্রূ কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকে সে। মাথা বিগড়ে গেল। সে গুন্ডা নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, হলে ভালো হত। তার বউয়ের দিকে নাহক লোকে তাকাবে—এ কেমন কথা?

হলে ঢুকবার পর গণ্ডগোলটা পাকাল। সেই তিনটে ছোঁড়া একেবারে পিছনের সীটে। হেম ছবি দেখবে কী, বারংবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখছে। নিউজরীল শেষ হয়ে ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলবার সময়ে দেখল এক ছোকরা রেবার সীটের পিছনে হাত রেখেছে। আর যাবে কোথায়!

—কীরকম ভদ্রলোক হে তুমি? ভদ্রমহিলার একেবারে ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছ? এই বলে খেঁকিয়ে উঠেছিল সে।

ছেলেগুলো আচমকা ধমক খেয়ে প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপরই তেড়ে- ফুঁড়ে উঠে তারাও তড়পাতে থাকে—কে মেয়েছেলের ঘাড়ে হাতে রেখেছে? আপনি তুমি-তুমি করে বলছেন কেন? অত ছুঁচিবাই থাকলে মেয়েছেলে সিন্দুকে ভরে রেখে আসবেন। লেডিজ সীটে গিয়ে বসাবেন এবার থেকে।

হেম হাতফাত চালিয়ে দিত ঠিক। রেবাই তাকে সামলায়। পরে বাড়ি ফেরার সময় বলেছিল—ওরা কিছু তো করেনি, তুমি রেগে গেল কেন?

রাগ যে কেন হয় হেমের, তা কারও বোঝার নয়। এই জীবনটা এইরকম জ্বলে পুড়ে যাবে।

ছোকরা গানের মাস্টার ঘরে সন্ধের আলো জ্বালবার মুখটাতেই এসে হাজির। রেবা প্রায় দুপুর-দুপুর বেলা থেকে খুব সেজে বসে আছে। কোলে খোলা গানের খাতা নিয়ে বিছানায় আসন পিঁড়ি হয়ে বসে তখন থেকে 'তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায় কেউ বা সিরাজি মাগে' লাইনটায় সুর লাগাচ্ছে। হেমকে দেখেও দেখছে না।

হেম ঘোষের গলায় এক সময়ে সুর ছিল। না ঠিক গানের গলা নয়! তবে সিনেমা বা রেডিয়োর গান গুনগুন করতে করতে প্রায় সুরটা এনে ফেলত।

আচ্ছা, এমন হতে পারে না কি যে, হেম খুব গোপনে কোনো বড়ো ওস্তাদের কাছে গিয়ে গান শিখে খুব বড়ো গাইয়ে হয়ে গেল একদিন। রেবা টেরও পেল না এত কাণ্ড। তারপর কোনোদিন হয়তো রেবার মাস্টার গান শেখাতে এসে সুর তুলতে গলদঘর্ম হচ্ছে, এমন সময়ে সাদামাটা চাবির কারিগর হেম ঘোষ হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত সুরে গানটা গেয়ে দিল! রেবা তখন যা অবাক হয়ে তাকাবে না। সেই দিনই মাস্টারকে অহংকারের সঙ্গে বলে দেবে—আর আপনাকে দরকার হবে না প্রভাসদা। তারপর হেমের সঙ্গে যখন একা হবে রেবা তখন দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে হেমের কালো মোটা ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলবে—তোমার ভিতর কত জাদু আছে বলো তো! তখন হেম খুব হাসবে। খুব হাসবে। একেবারে হেঃ হেঃ করে পেট ভরে হেসে নেবে একচোট।

দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ এইসব ভাবল সে। ঘর থেকে গান আসছে, গোয়াল থেকে মশা। আর শুকনো গোবরের গন্ধ। কাঁকড়াবিছের চিন্তাটাও বড্ড পেয়ে বসেছে হেমকে। চক্কোত্তিমশাই অনেক ওষুধ জানেন। দিনেকালে কত শক্ত রোগ ভালো করেছেন বলে শোনা যায়। একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে গিয়ে কাঁকড়াবিছে কামড়ালে কী ওষুধ দিলে আরাম হয় তা ফাঁকমতো জেনে আসবে হেম। রেবার যা সুখের শরীর, একবার বিষবিচ্ছুর কামড় খেলে ফুলের মতো শরীরটা নীলবর্ণ হয়ে নেতিয়ে পড়বে না? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

'... কেউ বা সিরাজি মাগে—এ-এ' গানের মাস্টারের ভরাট গলার সঙ্গে ডুয়েটে রেবার কোকিলস্বর জড়ামড়ি করছে। সইতে পারে না হেম ঘোষ। বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, আর ধরাতে ইচ্ছে হল না। ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরোবে।

হেমের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর জামাটা চড়িয়ে নিলে হত। কিন্তু এ সময়টায় ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না। রেবা রেগে যাবে ঘরে ঢুকলে।

উঠোন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের গায়ে বেরোনোর দরজা। ঠিক দরজার চৌকাঠে মুখোমুখি কালিদাসীর ছেলে অভয়পদর সঙ্গে দেখা। অভয়পদর হাতে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি। ঝালের চোটে শিস টানছিল। হেম ঘোষকে দেখে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল। হেম হাত পাতলে ঠোঙা উপুড় করে দেয় অভয়। তলানি মুড়িতে যত কুঁড়ো মিশে আছে। তাই মুখে ফেলে হেম ঘোষ বলে—খবর কী?

—আর খবর! অভয়পদ বলে—আজও মোহনবাগানের একটা পয়েন্ট গেল।

হেম ঘোষ খেলার মাঠের খবর রাখে না। তবু অভয়পদকে তোয়াজ করবার জন্য বলল—এঃ হেঃ! একটা পয়েন্ট চলে গেল?

অভয়পদর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাওড়ায় বিখ্যাত মাতব্বর জ্ঞান সরকারের শাগরেদ। জ্ঞানদা ওর মাথাটা খেয়ে রেখেছে। ঘুমে জাগরণে সবসময়ে ওর মুখে জ্ঞানদা আর মোহনবাগানের কথা। কবে জ্ঞানদা ডেকে অভয়পদর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেছে, কবে যেন বলেছে—অভয়, আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা চাকর ঠিক করে দিস তো, কবে হয়তো জ্ঞানদার গাড়িতে উঠে বড়োবাজারের লোহাপট্টিতে গেছে এ সবই অভয়পদর বলবার মতো কথা। আজকাল অভয়পদকে দেখলেই লোকে সটকাবার তাল করে। কাঁহাতক জ্ঞানদার বৃত্তান্ত শোনা যায়!

হেম ঘোষের সেই ভয়। তবে কিনা অভয়পদর আর কোনো দোষ নেই। বরং জ্ঞানদার শাগরেদি করে সে চিরকুমার রয়ে গেছে, মেয়েমানুষকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে, লোকের বেবিফুড জোগাড় করে দেয়, ইলেকট্রিক

বিল জমা দিয়ে আসে পাঁচজনের। মড়া পোড়াতে যায়। বাড়ি ভাড়ার টাকা তুলে, দুধ আর ঘুঁটে বেচে মা কালিদাসী সংসারটাকে কষ্টেসৃষ্টে টেনে নেয়। নিষ্কর্মা অভয়পদ তাই বড়ো সুখে আছে।

অভয়পদ বলল—আজ একটা মিটিং আছে জ্ঞানদার বাড়িতে, বুঝলে? চা-টা খেয়েই বেরোব।

—খুব ভালো। বলে হেম বেরিয়ে আসছিল।

মানুষ যে কেন খামোকা মিটিং করে মরে আজও হেম বোঝে না। যত সব ফালতু কারবার। দশটা মাথা এক হয়ে যত সব গুজুর গজুর, ফুসর ফসুর।

সিঁড়ির মুখ থেকে অভয়পদ ফিরে এসে বলল—ও হেম, শোনো।

হেম ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। মিটিং-এর কথা না ফেঁদে বসে। ওসব কথায় বড্ড মাথা বিগড়ে যায় তার।

অভয়পদ গলার স্বর নামিয়ে বলে—তোমার বউ কি সিগারেট-টিগারেট টানে নাকি! রাতে ওপরের বারান্দা থেকে যেন দেখলুম উঠোনে রেবা সিগারেটে টান মারতে মারতে পায়চারি করছে।

কী কেলেঙ্কারী! হেমের ভিতরটা যেন লজ্জায় গর্তের মতো হয়ে যায়। কাল তখন অনেক রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী জ্যোছনা দেখতে উঠোনের দিকে দাওয়ায় এসে বসেছিল একটু। এমনিতে হেম ঘোষ সিগারেট খায় না, রেবার চাপাচাপিতে ইদানীং খেতে হচ্ছে। কাল রাতেও খাচ্ছিল। সদ্য ধরানো সিগারেটটায় দু-টান দিতে না দিতেই রেবা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল—আমি খাব।

হেম অবাক। দেখে, রেবা দিব্যি ফসফস টান মারছে। কাশিটাশি নেই, চোখে জলও এল না ধোঁয়ার। বলল—আগে খেতেটেতে নাকি?

—কত! বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে অনেক খেয়েছি। বেশ লাগে।

বলে রেবা সিগারেট টানতে টানতে উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে সময়ে বাড়ির কারও জেগে থাকবার কথা নয়। তারাও কিছু টের পায়নি। রামচন্দ্র হে! অভয়পদ দেখে ফেলেছে তবে!

হেম ঘোষ হেসে আমতা আমতা করে বলে—ওই শখ করে দুটো টান দিয়েছিল আর কী! তারপর কেশে-টেশে ফেলে দেয়।

অভয়পদ আদর্শবাদী লোক। মুখটা কেমনধারা করে বলল—দেশটা যে একেবারে সাহেব হয়ে গেল হে হেম! ভারতবর্ষের কত সম্পদ ছিল!

কথাটা ভালো বুঝল না হেম। অভয়পদও বুঝিয়ে বলল না। চলে গেল।

রেবাকে সিগারেট খেতে অভয় দেখেছে, লজ্জা শুধু সেজন্যই নয়। হেম ঘোষ আর একটা কথা ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে জিভ কাটল। কী কেলেঙ্কারী! কাল জ্যোছনায় তাদের দুজনেরই বড়ো রস উস্কেছিল। নিরিবিলি, নিশুতি জ্যোছনায় পরির মতো বউটাকে দেখে খুব দু-চারটে দেহতত্ত্বের কথা হেসে হেসে বলে ফেলেছিল হেম। রেবাও দু-চারটে ভালো টিপ্পনী ঝেড়েছিল। দোষের কথা নয়। স্বামী-স্ত্রী একা হলে এরকম কত কথা হয়! কিন্তু সেসবই যে শুনে ফেলেছে অভয়পদ! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

এই জিভ কাটা অবস্থায় হেম ঘোষ যখন দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই একজোড়া মাঝবয়সি স্বামী-স্ত্রী ভুঁইফোঁড়ের মতো তার সামনে কোত্থেকে হাজির হয়ে আচমকা বলল—আচ্ছা মশাই, গুণ্টু কি বাড়িতে আছে?

আর এক দফা লজ্জা পেয়ে হেম বলে—না, সে মন্দিরে কাঁসি বাজাতে গেছে।

।। চার।।

গুণ্টু যখন কাঁসি বাজায় তখন সে নিজেই শব্দ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কীরকম হয়, কাঁসি বাজাতে বাজাতে শব্দটা আস্তে আস্তে বড়ো হতে থাকে। কাঁইনানা কাঁইনানা হয়ে বাজতে বাজতে কানে তালা ধরে আসে, শরীর ঝিমঝিম করে। তারপর শব্দটা যেন তার চারধারে লাফাতে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বহুদূর চলে যায়। আবার ফিরে আসে। তারপর সে পরিষ্কার টের পায় শব্দটা আকাশ বাতাস সব হাঁ করে গিলে ফেলল। প্রকাণ্ড হয়ে গেল। দুনিয়াভর হয়ে গেল। আকাশভর হয়ে গেল। তারপর আর গুণ্টু নিজেকে টের পায় না। বড়ো মজা হয় তখন। গুণ্টু শব্দ হয়ে যায়।

মাস দুই আগে গুণ্টু চৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাগানে পেয়ারা চুরি করতে ঢুকেছিল। দুপুরবেলা। কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা শিরীষগাছে এক হনুমানকে দেখতে পেল সে, বুকে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে।

যে-কোনো কিছুকে লক্ষ করে ঢিল ছোঁড়া গুণ্টুর স্বভাব। বে-খেয়ালে কত সময় কত মারাত্মক জায়গায় ঢিল ছুঁড়েছে সে। চলন্ত গাড়ির হেডলাইট ফাটিয়েছে একবার, রাস্তার আলো ভেঙেছে কতবার, জ্ঞান সরকারের বাইরের ঘরের দেয়ালঘড়িটা রাস্তা থেকে ঢিল ছুঁড়ে ভেঙেছিল।

সেই স্বভাববশে হনুমানটার দিকেও খামোকা একটা মুঠোভর ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। হনুমানটার তেমন লাগেনি তাতে। কিন্তু হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেটা হড়হড় করে গাছ থেকে নেমে এসে তাড়া করল গুণ্টুকে। গুণ্টু দৌড় দৌড়। জংলা বাগানটার মাঝ- বরাবর পুরোনো পুকুর, তাতে সবুজ শ্যাওলা থিকথিক করছে, বড়ো বড়ো মাছ। অন্যদিকে পথ না পেয়ে গুণ্টু সেই পুকুরে ঝাঁপ খায়।

গুণ্টু সাঁতরায় ভালোই। কিন্তু ত্যাঁদড় হনুমানটার জ্বালায় কিছুতেই আর জল ছেড়ে উঠতে পারে না। যেদিক দিয়ে উঠতে যায় সেদিকেই সেটা গিয়ে হুপ হুপ করে হাঁক ছাড়ে। সেই হাঁক-ডাকে আরও কয়েকটা হনুমান কোত্থেকে এসে জুটল। অথৈ জলের মধ্যে গুণ্টুকে সারাক্ষণ হাত-পা নেড়ে ভেসে থাকতে হয়েছিল। ফলে পচা আঁষটে গন্ধ, শ্যাওলার লতা বারবার পায়ে হাতে জড়াচ্ছে, বড়ো বড়ো জাহাজের মতো মাছ মাঝে মাঝে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘষটে যাচ্ছে। কয়েকবার লেজের ঝাপটা খেল। এক হাত তফাত দিয়ে সাঁতরে চলে গেল একটা জলঢোঁড়া। পায়ের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ডুব দিয়ে বহুবার থই খুঁজে পেল না গুণ্টু। তার কচি বুকে দম বেশি ছিল না তো। তাই এক সময়ে হঠাৎ চোখের সামনে সূর্য নিবু নিবু হয়ে গেল, বুকে বাতাসের টান, হাতে পায়ে খিল। সে তখন বিড়বিড় করে বলেছিল—আমি যে রোজ সন্ধেয় তোমার মন্দিরে আরতির সময়ে কাঁসি বাজাই!

তারপরেই হঠাৎ যেন এক পাতালপুরীর হাত এসে গুণ্টুকে টেনে নিল জলের তলায়।

সেইখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। মরলে তো সবাই তাঁর দেখা পায়। গুণ্টু গিয়ে দেখে আরেব্বাস। সেখানে পেল্লায় চৌকি পেতে বুড়ো চক্কোত্তিমশাই বসে তামাক খাচ্ছেন। তাকে দেখে বলে উঠলেন—গুণ্টু রাজার গালে হাত! গুণ্টু রাজার গালে হাত! গুণ্টু রাজার গালে হাত।

তা গালে হাত দেওয়ারই দাখিল। যা অবাক হয়েছিল। তবু গুণ্টু চক্কোত্তিমশাইকে অচিন জায়গায় পেয়ে ভারী খুশি। প্রণাম করে ফের ভালো করে তামাক সেজে দিল। চক্কোত্তিমশাই বললেন—তা শব্দ হওয়া ভালো। দুনিয়াটা হলই তো শব্দ থেকে। যেখানে সেখানে ভালো করে যদি শুনিস তো দেখবি, দুনিয়ায় সব শব্দ। তুইও শব্দ, আমিও শব্দ। মনে করিয়ে দিস, তোকে ভালো দিন দেখে একটা শব্দ দেবো'খন। সে এমন শব্দ যে কাঁসির শব্দ তার কাছে কোথায় লাগে। এখন যা।

ডোবার আধঘণ্টা পর গুণ্টু ফের ভেসে উঠেছিল। পেটে জল, মুখে গাঁজলা, চোখের মণি ওল্টানো, জ্ঞান নেই, মৃত্যুক্ষীণ নাড়ি চলছে না। তাই দেখে হনুমানগুলো এমন হাল্লাচিল্লা ফেলে দিয়েছিল যে চৌধুরী বাগানের বুড়ো মালী এসে পড়েছিল দুপুরের ঘুম ভেঙে। সেই তোলে গুণ্টুকে। পেটের জল বার করে সেঁক তাপ দেয়। ডাক্তার-বদ্যি করতে হয়নি, হাসাপাতালেও যেতে হয়নি। কেউ তেমন টেরও পায়নি ঘটনা।

বেঁচে গিয়ে তেমন অবাক হয়নি গুণ্টু। কেমন করে যেন মনে হয়—মরলেই হল আর কী! চক্কোত্তিমশাই সব জায়গায় পাহারা দিচ্ছে না! যেখানেই যাও গিয়ে দেখবে ঠিক বুড়ো মানুষ আপদবিপদের দোর আগলে চৌকি পেতে বসে তামাক খাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

রাম মন্দিরে আরতির সময় এখনও বেজায় ভিড় হয়। নতুন ঠাকুরমশাই আরতিও করেন ভালো, তবে কিনা চক্কোত্তিমশাইয়ের আরতি যারা দেখেছে তাদের চোখে অন্য কিছু আর লাগে না। তবু অভ্যাসবশে মানুষ এসে দাঁড়ায় খানিক।

এখান থেকে চারচালাটা বেশি দূর নয়। নাটমন্দিরের পর একটা মাঠ তারপর একটা কাঁচা রাস্তা, সেটা পেরিয়েই বাগানের বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঠের ফটক। কয়েকটা ফুল গাছের ঝোপ, জোনাকি পোকার

আলো, একটু অন্ধকার। খোলা দাওয়ায় একটা চৌকি পাতা, সাদা বিছানা, মেঝেয় চটি জোড়া নিখুঁতভাবে রাখা, একপাশে গড়গড়া। বিছানায় চক্কোত্তিমশাই দুটো বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে থাকেন। গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ হয়।

আউন্তি যাউন্তি মানুষজন দু-দণ্ড দাঁড়ায় এসে সামনে। বলে—চক্কোত্তিমশাই, মন্দিরের পুজোয় আর যে যান না!

বুড়ো মানুষটি একগাল হেসে বলেন—রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মেয়েরা ততদিন এই পুতুল খেলে যতদিন বে না হয়। বিয়ে করে আসল ঘরসংসার পেলে আর পুতুল খেলে কে রে?

লোকে একটু আধটু বোঝে না যে তা নয়।

গুণ্টু বোঝে। আরতির পর গুণ্টুর অনেকক্ষণ সাড় থাকে না। মগজে তখন কেবল ঘণ্টার শব্দ, কেবল কাঁসির আওয়াজ।

একদিন বলে ফেলেছিল গুণ্টু—আরতির পর আমি এক অন্যরকম ঘণ্টার শব্দ শুনি। সে আওয়াজ মন্দিরের নয়, অন্য জায়গা থেকে আসে।

চক্কোত্তিমশাই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—খুব মনপ্রাণ দিয়ে শুনবি। কাউকে বলিস না।

গুণ্টুর মায়ের কথা মনে নেই। সে মায়ের পেট থেকে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা যায়। সেই থেকে সে দিদিমার কাছে। তার বাবা আবার বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে ঝাড়গ্রাম থেকে বাবা তাকে দেখতে আসে। ভারী নিরীহ, ভীতু মানুষ, দ্বিতীয় পক্ষের দাপটে অস্থির। দ্বিতীয় পক্ষ আসতেও দেয় না বড়ো একটা। কিন্তু বাবা এলে গুণ্টুকে দেখে ভারী খুশি হয়। এক গাল হাসে, বড়ো চোখে হাঁ করে এমনভাবে দেখে যেমন লোভী লোক খাবারের দোকানের দিকে চায়।

বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—বলো তো বাবা, তোমার কে কে আছে?

গুণ্টু ভেবেচিন্তে বলেছিল—দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাই।

বাবা অবাক হয়ে বলে—চক্কোত্তি আবার কে?

—সে আছে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—আর আমি?

গুণ্টু তখন লজ্জা পেয়ে বলে—হাঁ বাবা, তুমিও। আর সৎমা।

—ছিঃ বাবা, সৎমা বলতে নেই। লোকে খারাপ ভাববে। শুধু মা। আরও বলি বাবা, তোমার কিন্তু আর দুটি বোন আছে। তারা তোমাকে ভারী দেখতে চায়। তোমার মা-ও বলে, এবার গুণ্টুকে নিয়ে এসো।

গুণ্টুর যে যেতে অনিচ্ছে তা নয়। কিন্তু দিদিমা ছাড়তে চায় না। কথা উঠলে বলে, আঁতুড় থেকে মানুষ করছি ওর নাড়ি আমি ছাড়া আর তো কেউ চিনবে না। অন্যের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হল, গুণ্টু শুনেছে, তার সৎমায়ের দুটি মাত্র মেয়ে, আর নাকি ছেলেপুলে হবে না। কিন্তু সৎমায়ের খুব ছেলের শখ। তাই এখন প্রায়ই গুণ্টুর বাবাকে বলে, সতীনপোকে নিয়ে এসো, তাকে নিজের ছেলে করে নেব।

তাই বাবা আজকাল খুব ঘন ঘন আসে। গুণ্টুও জানে, একদিন তাকে হয়তো ঝাড়গ্রামে চলে যেতে হবে। সৎমাকে সে দেখেনি। তবে 'মা' বলে কাউকে ডাকতে খুব ইচ্ছে করে তার। আবার এ জায়গা ছেড়ে, দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাইকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছেও করে না। গুণ্টুর আজকাল তাই মনটা দু-ভাগ হয়ে গেছে।

মামা প্রায়ই গুণ্টুকে বলে—তোকে যা একটা লিডার তৈরি করব না গুণ্টু, দেখে নিস। একটু বড়ো হ, তখন জ্ঞানদার কাছে নিয়ে গিয়ে এমন ট্রেনিং দেওয়াব। জ্ঞানদার হাতে কত লিডার তৈরি হয়েছে।

গুণ্টুর লিডার হতে খুব ইচ্ছে।

আরতির শেষে আজ বড়ো একা একা লাগছিল গুণ্টুর। কাঁসি বাজানোর সময় আজ তিনধা নাচন নেচেছে। এখন তাম্রপাত্র নিয়ে নাটমণ্ডপের ধারে বসে হাজারটা হাতের পাতায় তামার কুশি দিয়ে চরণামৃত দিচ্ছে। কত হাত! হাতগুলোতে ভয় লোভ হিংসে মাখানো। এক-আধটা হাত ভারী ঠান্ডা। দেখে দেখে আজকাল বুঝতে পারে সে।

একটা সাদা কাঁপা-কাঁপা হাত থেকে খানিক চরণামৃত চলকে পড়ে গেল। মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই গুণ্টুর। কিন্তু সে ঠিক টের পায় এ হাতটা হল কানাই মাস্টারের। কানাই স্যারের প্রাণে আজ বড়ো কষ্ট।

একটা ছ্যাঁকা খাওয়া, কড়া পড়া বিদঘুটে হাত দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল গুণ্টু, এ হল হেম ঘোষ। হেম ঘোষের হাতটা কাকে যেন খুন করতে চায়।

একবার চক্কোত্তিমাই একটা কচি বেলগাছ দেখিয়ে গুণ্টুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বল তো কত পাতা আছে গাছটায়।

ভেবেচিন্তে গুণ্টু বলে—হাজার দুই হবে।

—দ্যাখ তো গুণে।

সে বড়ো কষ্ট গেছে। এক মানুষ সমান উঁচু গাছটার নীচে টুল পেতে তার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাতা গুণতে হল। দাঁড়াল চার হাজারের ওপর। তবু একটা আন্দাজ হল।

সেই থেকে চক্কোত্তিমশাই এরকম হরেক জিনিস আন্দাজ করতে শেখান গুণ্টুকে। করতে করতে গুণ্টুর আন্দাজ ভারী চমৎকার হয়েছে। খুব ঝুপসি গাছ হলেও তা দেখে টকাস করে বলে দিতে পারে তাতে পাতা কত। জানে, গুণে দেখলে ঠিক মিলে যাবে।

চক্কোত্তিমশাই শিখিয়েছেন, রোজ রাতে শোয়ার আগে বিছানায় বসে সারা দিনের কথা ভাববে। সকাল থেকে কী করলি, কী খেলি, সব হুবহু মনে করা চাই। এ না করে ঘুমোবি না।

তাই করত রোজ গুণ্টু। ছ-মাস পর তার বেশ তড়তড়ে মন হল। টক করে সব মনে পড়ে যেতে থাকে। তখন চক্কোত্তিমশাই শেখালেন, এবার রোজকার কথা, আর তার সঙ্গে আগের দিন, আগের আগের দিন এইভাবে মনে করবি। করতে করতে দেখবি একদিন তোর আর জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে।

—তাতে কী হয় চক্কোত্তিমশাই?

—তাহলে আর মানুষ মরে না। দেহ ছাড়ে, কিন্তু মরে না।

গুণ্টুর দিকে আর একটা হাত এগিয়ে আসে। হাতে শাঁখা, তাতে সিঁদুরের দাগ। গুণ্টু যেন এ হাত চেনে। কুশি তুলেও গুণ্টু থেমে থাকে। এ হাত কি চরণামৃত চায়? না। এ হাত একটা ছেলে চায়। এ হাতের বড়ো আকুলি বিকুলি।

হাতটা ওই অত হাতের ভিড়ের ভিতর থেকে একটু ওপরে উঠে এসে গুণ্টুর থুতনি ধরে মুখখানা ওপরে তুলল। আর তখন নাটমন্দিরের জোর আলোয় একজোড়া জল টলটলে চোখ দেখতে পায় গুণ্টু। ঘোমটার নীচে ফর্সা মুখ। ঠোঁটে একটা কান্নার ভেজা হাসি। পিছনেই বাবা দাঁড়িয়ে। ভারী তটস্থভাবে বাবা মহিলাটির কাঁধে হাত দিয়ে বলল—এখন না। ও এখন ব্যস্ত। বাড়িতে যাক, ভালো করে দেখো।

চোখ বুজে মহিলাটি বলে—এ যে দেবতার মতো ছেলে। আমার সতীন বড়ো ভাগ্যবতী ছিল।

গুণ্টু ভারী লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাতে হাতে চরণামৃত ঢেলে দিতে থাকে সে। মাথা নীচু। কারও মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই।

।। পাঁচ ।।

রেবা ঝুঁকে গানের খাতা দেখছিল। গানের মাস্টার প্রভাস খানিকক্ষণ তবলায় আড়া চৌতাল তুলবার চেষ্টা করে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। নতমুখী রেবার দিকে চেয়ে রইল খানিক। বেশ দেখতে মেয়েটা। মাঝে মাঝে এমন করে তাকায় যে ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

প্রভাস অনেকদিন ধরেই বুঝবার চেষ্টা করছে, রেবার হাবভাবে কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা। মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, আছে। আবার কখনও মনে হয়, না নেই।

আছে কি নেই সেটা বুঝবার জন্যও একটা কিছু করা দরকার। ধসা কানা হয়ে বসে থেকে কোনোদিনই তা বোঝা যাবে না।

ভাবতে ভাবতে প্রভাস একবার বাঁয়ায় একটা টুম শব্দ তুলল। রেবা তাকাল না। বাঁ-হাতখানা হারমোনিয়মের ওপর দিয়ে এসে ঝুলছে। কী চমৎকার আঙুল! এই মেয়ের বর কিনা হেম ঘোষ! কাকের মুখে কমলালেবু।

প্রভাস আন্দাজ করে, হেম ঘোষের বউ হয়ে রেবা নিশ্চয়ই খুব সুখী নয়। তাহলে রেবা প্রভাসকে একেবারে হ্যাটা করবে না।

ভেবেচিন্তে প্রভাস আজ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। একটা কিছু হোক। হয়ে যাক।

গানের সময়ে আজকাল ঘরের লোকজন তাড়িয়ে দরজা দিয়ে জানলার পর্দা টেনে-টুনে দিয়ে বসে রেবা। সেটাও কি একটা ইঙ্গিত নয়? কোন বোকা এসব ইঙ্গিত ধরতে না পারে?

খুব সাহস হল প্রভাসের। আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

একটু ঝুঁকে প্রভাস হঠাৎ রেবার ঝুলন্ত হাতখানা খপাৎ করে চেপে ধরে ডেকে উঠল—রেবা!

জানলার পর্দার ওপাশে অভয়পদ একটা অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা শ্বাস ছেড়ে বেশ জোরে বলে উঠল—আগেই বলেছি কিনা মা, যে মেয়ে সিগারেট খায়, তার চরিত্র ভালো হতে পারে না! এসে দেখে যাও এখন স্বচক্ষে।

ঘরের ভিতরে প্রভাস তখন ছিটকে নেমে পড়েছে চৌকি থেকে। টর্চ জ্বেলে তাড়াহুড়ো করে চটি খুঁজছে। মনের ভুল। ঘাবড়ে গিয়ে ভুলে গেছে যে, চটি দরজার বাইরে ছেড়ে আসে রোজ।

রেবা সাদা মুখে প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল—কী করলেন বলুন তো প্রভাসদা! এখন এ বাড়িতে কি আর থাকা যাবে! কত কষ্টে বাপের বাড়ির কাছে এই বাসা খুঁজে বের করেছি। এখন যদি ছাড়তে হয় তবে ও ঠিক আবার ওদের সংসারে নিয়ে গিয়ে তুলবে।

প্রভাস দরজার কপাট হাতড়ে ছিটকিনি খুঁজছে তাড়াতাড়ি।

রেবা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—এ বাসায় কত সস্তায় ছিলাম জানেন! এ অঞ্চলে পঁচিশ টাকায় ঘর আর পাওয়া যাবে? বাড়িউলি মানুষটা কত ভালো ছিল। ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কী করলেন বলুন তো!

প্রভাস ছিটকিনি খুলে চটি খোঁজার জন্য আর ঝামেলা করল না। দুই লাফে উঠোন পেরিয়ে খালি পায়ে রাস্তায় নেমেই একটা রিকশায় উঠে পড়ল। বলল—জোরে চালাও ভাই।

রেবা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে সজল চোখে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর কেঁদে ফেলল। ইস, অভয়দা দেখে ফেলেছে। এখন ঠিক বাড়ি-ছাড়া করবে তাদের।

উঠোনের ওপাশের অন্ধকার থেকে কালিদাসীর গলা আসছিল—তোরই বা উঁকি মারতে যাওয়ার কী দরকার! ওসব লোক ওরকমই হয় বাবু। তুই নিজের কাজে যা।

—যাচ্ছি।

—গুণ্টুটাকে ডেকে দিস তো। দুপুর থেকে ছেলের টিকি নেই।

রেবার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—মাসিমা, আমাদের বাসা ছাড়তে বলবেন না। আমি গানের মাস্টারকে ছাড়িয়ে দেব।

কিন্তু তা আর বলা হল না। সিঁড়িতে শব্দ করে কালিদাসী উঠে গেল।

গুম হয়ে বসে রইল রেবা। এ বাড়িতে যে কত সুবিধে! খুব সস্তায় কালিদাসীর কাছ থেকে ঘুঁটে কেনে রেবা। আড়াইটাকা সের দরে খাঁটি গোরুর দুধ কেনে।

প্রভাসের জন্য সব গেল।

।। ছয়।।

নাটমন্দিরের নীচে নেমে এসে কানাই মাস্টার হাজার জোড়া জুতোর মধ্যে নিজের জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটা একটু অন্ধকার মতোও বটে।

হেম ঘোষ নেমে এসে বলল—কী খুঁজছেন মাস্টারমশাই, জুতো? বলে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরল।

কানাই জুতো খুঁজে পেয়ে হেম ঘোষকে বলল—যাবেন নাকি বাজারের দিকে?

একা চলাফেরা করতে আজ কানাইয়ের ঠিক সাহস হচ্ছে না। মারাটা বড়ো খারাপ হয়েছে মদনকে। একবার যাবে চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে, ফাঁকমতো।

হেম ঘোষ উদাস গলায় বলে—সকালেই বাজার করেছি। তা আমার আর কাজ কী, চলুন বরং বাজার থেকে ঘুরেই আসি একটু। বাজার জায়গাটা ভালো।

হেমের মনে একটা পোকা কামড়াচ্ছে তখন থেকে। একা ঘরে রেবা আর গানের মাস্টার। চোখে চোখে কথা হচ্ছে না তো! কিংবা হারমোনিয়ামের রীডে একজনের আঙুলে অন্যজনের আঙুলে ছোঁয়া লাগে যদি! এর চেয়ে নিজেদের সংসারে বেশ ছিল। দশ জোড়া পাহারা দেওয়ার চোখ ছিল সেখানে। কাঁকড়াবিছের কথাও ভাবে হেম ঘোষ। ওষুধটা চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

মনের কথা মনে রেখে দুজনে অন্য সব কথা বলতে বলতে বাজারপানে যেতে থাকে।

।। সাত।।

কালিদাসী ডাক শুনে বারান্দায় এসে দেখে উঠোনে জামাই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে বউ আর দুটো মেয়ে।

কালিদাসী শ্বাস ছাড়ে। জামাই আসবে জানাই ছিল। গুণ্টুকে বুঝি এবার নিয়ে যায়।

—এসো। বলে নীরস গলায় ডাকে কালিদাসী।

ওরা উঠে আসে।

জামাই প্রণাম করতে করতেই বলে—গুণ্টুকে নিয়ে যেতে এলাম মা। অনেকদিন হয়ে গেল। আপনারও কষ্ট বুড়োবয়সে।

কালিদাসী মন্দার মাকে মিষ্টি আনতে পাঠায়। তারপর গম্ভীরমুখে এসে সামনে বসে। বলে—যার ধন সে তো নেবেই। ঠেকাব কোন আইনে। এই বুঝি মেয়ে দুটি? বেশ মিষ্টি হয়েছে দেখতে। আর এ আমার নতুন মেয়েটিও বেশ।

এ সবই মুখের ভদ্রতা। বুকটা ভিতরে ভিতরে জ্বলে যায়। কাঁকড়াবিছে কোন ফাঁকে পাঁজর কেটে বুকের ভিতর সেঁধিয়েছে। এ হুলের বড়ো জ্বালা।

খানিকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে ওরা চলে গেল। কাল সকালে গুণ্টুকে নিতে আসবে।

কালিদাসী একটা চাদর গায়ে নীচে নেমে এসে ডাকল—রেবা। ও রেবা!

রেবা শুয়ে ছিল বিছানায়। ডাক শুনে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। এই বুঝি বাড়ি ছাড়বার কথা বলতে এসেছে!

কিন্তু না। কালিদাসী বলল—আমাকে একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে যেতে হবে। মন্দার মা বাড়ি গেল, তা তুমি যদি একটু সঙ্গে চলো মা। আমার তো চোখে ভালো ঠাহর হয় না রাতবিরেতে।

—যাচ্ছি মাসিমা। বলে রেবা তক্ষুনি চটি পায়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে অবশ্য জিভ কাটল রেবা। চটিজোড়া তার নয়, প্রভাসের। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বুঝতে পারেনি। এখন আর কিছু করার নেই।

রেবা বলল—মাসিমা, আমার কী দোষ বলুন। লোকটা যে ওরকম তা কি জানতাম!

কালিদাসীর বুকভরা তখন গুণ্টুর চিন্তা। বলল—সে জানি বাছা। আজকালকার লোক বড়ো ভালো নয়। সাবধানে থাকবে।

রেবা কালিদাসীকে ধরে খুব যত্নে কাঁচা ড্রেনটা পার করাল। মনে মনে বলল—চক্কোত্তিমশাই, দেখো বুড়ি যেন আমাদের না তাড়ায়।

।। আট।।

গুণ্টুকে নিয়ে রেলগাড়ি হাওড়া ছেড়েছে অনেকক্ষণ। জানলার ধারে বসে সে এখন বাইরে গ্রাম আর খেত দেখছে। গা ঘেঁষে ছোটো বোন দুটি বসে। মা একটু তফাত থেকে মাঝে মাঝে মুগ্ধচোখে তার মুখের দিকে চাইছে। আর বার বার জিজ্ঞেস করছে, খিদে পেয়েছে বাবা তোমার? কিছু দিই? সন্দেশ আছে, রসগোল্লা, লুচি। কত এনেছি দ্যাখো! বাবা একবার কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিল—মাকে তোর পছন্দ হয়েছে তো গুণ্টু?

গুণ্টু ঘাড় নাড়ল। বেশ মা। বোন দুটিও বড়ো ভালো। এরকম মা বোন তার ছিল না তো এতদিন! দিদিমা বড়ো কেঁদেছে ভুঁয়ে পড়ে। মামা স্টেশন পর্যন্ত শুকনো মুখে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসেনি। মনটা বড়ো খারাপ লাগে। আবার ভাবে, নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে না জানি কত ফুর্তি হবে! কত খেলা!

।। নয়।।

দিন ফুরোয়। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। কানাই মাস্টার টিউশনিতে বেরোল। হেম আজ গেল রেবাকে নিয়ে সিনেমায়। অভয়পদ পরোটা খেয়ে পুজো কমিটির মিটিং-এ যাওয়ার সময় বলে গেল—মা, যাই। কালিদাসী শুনতে পেল না, সে তখন গোয়ালঘরে গোরু দুটোর সঙ্গে রাজ্যের কথা ফেঁদে বসেছে।

দিনটা গেল, যেমন যায়।

লড়াই

পালান আমাদের খেতে কাজ করে।

সে ভালো লোক কী মন্দ লোক তা বোঝা খুব মুশকিল। তবে সে জানে খুব ভালো মাঞ্জা দিতে, মাছের এক নম্বর চার তৈরি করতে, কাঠ-মিস্ত্রির কাজও তার বেশ জানা, আর পারে গভীর ভাঙা গলায় গেঁয়ো গান গাইতে।

পালান গাছের নারকোল চুরি করে বেচে দিয়ে আসে। নিশুতরাতে পুকুরে জাল ফেলে মাছ তুলে নিয়ে যায়, খেতের ফসল চুরি করে। কিন্তু ধরা পড়লেই দোষ স্বীকার করে পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। অনেক কাজের কাজি বলে আর তার হাসিটি বড়ো নির্দোষ আর সরল বলে দাদু তাকে তাড়ায় না।

আমাদের দিশি কুকুরটার নাম ঘেউ। ভারী তেজী কুকুর। মেজোকাকা যখন বিয়ে করে কাকিমাকে ঘরে আনলেন—বেশিদিনের কথা নয়—তখন কাকিমার বড়োলোক বাপের বাড়ি থেকে যেমন হাজার রকমের দামি জিনিস দিয়েছিল তেমনি আবার দুটো প্রাণীও দিয়েছিল সঙ্গে। এক প্রাণী হল এক যুবতি ঝি, তার নাম অধরা, অন্য প্রাণীটি হল ঘেউ।

ঘেউয়ের রং সাদা, চেহারা বিশাল আর চোখ রক্তবর্ণ। সে আসবার পর থেকে এ বাড়িতে বাইরের লোক আসা প্রায় বন্ধ। ঘেউ ডাকে কম কিন্তু কামড়ায় বেশি। সে আসার পর থেকে এ বাড়িতে অন্য বাড়ির ছেলেরা আসে না, অন্যের কুকুর-গোরু আসা বন্ধ। হাঁস-মুরগি পর্যন্ত ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

মেজোকাকিমা বড়ো সুন্দরী। হাঁটু পর্যন্ত এক ঢাল চুল, দুধে-আলতায় গায়ের রং, রূপকথার রাজকন্যের মতো চেহারা। তিনি আস্তে হাঁটেন, কম কথা বলেন, দুটো বড়ো বড়ো চোখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে চারধার দেখেন। জেঠিমা, মা, বড়োকাকিমা যখন উদয়াস্ত সংসারের কাজ করছেন তখন মেজোকাকিমা শুয়ে বসে বই পড়ে সময় কাটান। তাঁর ছাড়া কাপড় অধরা কেচে মেলে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, আলতা পরিয়ে দেয়। সবাই গোপনে বলে নতুন বউ কারও বশ মানবে না।

তা হোক, তবু মেজোকাকিমাকে আমাদের বড়ো পছন্দ। তাঁর কাছে জিনিস কেনার পয়সা চাইলেই পাই। শিশুদের তিনি বড়ো ভালোবাসেন। প্রায়ই মিষ্টি কিনে এনে আমাদের খাওয়ান।

আমার দাদুর অনেক পয়সা। লোকে তাকে বিরাট ধনী বলে জানে। কিন্তু বড়োলোকদের মতো চালচলন দাদুর নয়। যেটুকু সময় ওকালতি করেন সেটুকু বাদ দিলে অন্য সময়ে তার হেঁটো ধুতি, খালি গা—আর হাতে হয় দা নয়তো কোদাল কিংবা বেড়া বাঁধবার বাঁখারির গোছা। দাদু কখনও বিশ্রাম করতে ভালোবাসেন না। বলেন, বিশ্রাম এক ধরনের মৃত্যু। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টা ঘুমোবে। বাকি সময়টায় কাজ করবে।

পালান আর ঘেউ দাদুর ছায়া হয়ে ঘোরে। বাড়িতে ধোপা বা নাপিত এলে ঘেউ তাদের তাড়া করবেই। তখন দাদু বা পালান তাকে ধমক দিলে তবেই ক্ষান্ত হয়। অন্য কারও ধমককে সে গ্রাহ্য করে না, এমনকি মেজোকাকিমা বা অধরার ধমককেও নয়। তাই মেজোকাকিমা একদিন রাগ করে অধরাকে বললেন বাপের বাড়িতে থাকতে ঘেউ আমার কত বাধ্য ছিল। এখন বেয়াড়া হয়েছে। অধরা, ওকে এখন থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবি।

মেজোকাকা কাকিমাকে বড়ো ভয় পেতেন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে প্রায়ই চোখে চোখে তাকাতে পারতেন না। কাকিমা তাঁকে শেকল কেনার কথা বলতে কাকা খুব মজবুত বিলেতি শেকল কিনে এনে দিলেন। ঘেউ বাঁধা পড়ল।

দাদু এসব টেরও পাননি। পরদিন বাগানে গিয়ে গাছপালার পরিচর্যার সময়ে একটু অবাক হয়ে চারপাশ দেখে বললেন, কুকুরটা কই রে?

পালান বলে, বাঁধা আছে দেখেছি।

—বাঁধা? কে বাঁধল?

—ওই খোঁচড় ঝিটাই বোধ হয়।

দাদু ডাকলেন, ঘেউ! কোথায় রে তুই?

মেজোকাকার ঘরের পিছনের বারান্দা থেকে এখন ঘেউয়ের করুণ আর্তনাদ আর শিকলের ঠুনঠুন শব্দ ভেসে এল। আর কী ভীষণ যে দাপাদাপি করতে লাগল সে। মেজোকাকিমা কঠিন স্বরে ঘেউকে বললেন, বেত খাবে এরপর।

ঘেউ চুপ করল।

দাদু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমরা আলায়-বালায় ঘুরি, অতশত খেয়াল করি না। তবু টের পেলাম, বাড়ির হাওয়ায় একটা থমথমে ভূতুড়ে ভাব।

সেবার পুজোর কিছু আগে মেজোকাকিমার বাপের বাড়ি থেকে তত্ব এল। সে তত্ব দেখে লোকে তাজ্জব। বিশাল বিশাল পেতলের পরাতে থরে-বিথরে সাজানো সব জিনিস। খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, গয়নাগাঁটি পর্যন্ত। কম করে পনেরোজন লোক বয়ে এনেছে, সঙ্গে আবার বল্লমধারী পাঁচজন পাইক।

সে তত্ব দেখতে বিস্তর লোক জমা হয়েছিল। ঘেউ বাঁধা আছে বলে লোকে তখন আসতে সাহস পায়।

জীবজন্তু বা পোকামাকড় মারা দাদু খুব অপছন্দ করতেন। এমনকি সাপ পর্যন্ত মারা নিষেধ ছিল। আমাদের বাড়িতে বহুকাল ধরে একজোড়া গোখরো ঘুরে বেড়ায়। বাস্তুসাপ বলে তাদের আমরা খুব একটা ভয় পেতাম না। তারা যেখানে সেখানে বিড়ে পাকিয়ে পড়ে থাকে। কখনও রোদ পোহায়, হাততালি দিলে চলে যায় ধীরেসুস্থে।

এই সাপ দুটোকে ভয় পেতেন কাকিমা। মাঝে মাঝে রাগারাগি করে বলতেন, সাপকে কোনো বিশ্বাস আছে? এক্ষুনি এদের মেরে ফেলা দরকার।

তাঁর সে কথায় কেউ কান দেয়নি। এমনকি মেজোকাকাও না। সবাই বিশ্বাস করত, সাপ দুটো এ বাড়ির পরম মঙ্গল করছে।

মেজোকাকিমার বাপের বাড়ির তত্ব এসেছিল ঠিক দুপুরবেলায়, পুরুষমানুষ কেউ তখন বাড়িতে নেই। তত্ববাহক লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বাড়ির মেয়েরা ব্যস্ত।

সেই সময়ে মেজোকাকিমা পাইকদের ডেকে বললেন, দুটো গোখরো সাপ আছে ও-বাড়িতে। একটু আগেও উঠোনের পশ্চিম ধারে তুলসীঝাড়ের তলাকার গর্তে ঢুকতে দেখেছি ওদের। ও দুটোকে খুঁজে বের করে মেরে ফেল।

পাইকরা মহা বাধ্যের লোক। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোঁটা আর বল্লম বাগিয়ে উঠে পড়ল।

এক পাইক তুলসীঝাড়ের তলাকার গর্তে শাবল চালিয়ে মুখ বড়ো করে ফেলল। ভিতর থেকে ফোঁসফোঁসানির শব্দ আসছিল। ঠিক সেই সময়ে দৃশ্যটা দেখে বারান্দা থেকে ঘেউ বুকফাটা চিৎকার করে দাপাদাপি শুরু করল। তার দুই চোখ লাল, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, শিকলটা প্রায় সে ছেঁড়ে আর কী!

মেজোকাকিমা একটা লম্বা বেত নিয়ে এসে সপাটে কয়েক ঘা বসালেন ঘেউয়ের পিঠে। ঘেউ সে মার গ্রাহ্য করল না। উলটে শিকল প্রায় ছিঁড়ে মেজোকাকিমাকে কামড়াতে গেল।

পুকুরে নেমে পানা পরিষ্কার করছিল পালান। ঘেউয়ের চিৎকারে কী যেন বুঝতে পেরে উঠে এসে উঠোনে দাঁড়াল। বিশাল কালো চেহারা তার, কালো কাঁধে তখনও সবুজ কচুরিপানা লেগে আছে।

অবাক হয়ে সে তুলসীঝাড়ের কাছে পাইকদের কাণ্ড দেখে হঠাৎ দু-হাত তুলে ধেয়ে আসতে আসতে বলল, সর্বনাশ। সর্বনাশ!

মেজোকাকিমা তখন রাগে আগুন। পাইকদের চেঁচিয়ে বললেন, এ লোকটা মহা চোর। এটাকে ঠান্ডা করো তো। তারপর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও বাড়ি থেকে।

পালান একবার ঘুরে তাকাল মেজোকাকিমার দিকে। মনে হল এক রাগী দৈত্য তাকিয়ে আছে সুন্দরী রাজকন্যার দিকে।

পরমুহূর্তেই পালান লকড়ির ঘরে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে বেরিয়ে লাফিয়ে উঠোনে নামল।

ততক্ষণে অবশ্য পাইকরা একটা গোখরো সাপকে বল্লমে বিঁধে মেরে ফেলেছে। উঠোনে সাপটাকে শুইয়ে তারা অবাক হয়ে সাপটার বিশাল দৈর্ঘ্য দেখছিল। দুজন পাইক ওদিকে শাবল আর বল্লমের খোঁচায় দ্বিতীয় সাপটাকেও জখম করে ফেলেছে।

এ সময়ে পালানের লাঠি তাদের একজনের কাঁধে পড়তেই লোকটা 'বাপ' বলে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে। অন্য পাইকরা মুহূর্তের মধ্যে সজাগ হয়ে যে যার অস্ত্র হাতে নেয়।

তারপরই উঠোন জুড়ে এক বিশাল লড়াই বেধে যায়। একদিকে পালান একা, অন্যদিকে পাঁচজন পাইক সমেত পনেরোজন জোয়ান।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু মেয়ে কমললতা গিয়ে হঠাৎ খুব সাহস করে ঘেউয়ের গলার বকলশ থেকে শেকলের হুকটা খুলে দিল। ঘেউয়ের সাদা শরীরটা আলোর ঝলকানির মতো উঠোনে ছুটে গেল।

সারা পাড়া জুড়ে বিশাল হাঙ্গামার গোলমাল ছড়িয়ে পড়ল। ভিড়ে ভিড়াক্কার। আমরা ছোটোরা সেই ভিড়ের পিছনে পড়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু বিকট গালাগাল আর চেঁচানি শুনতে পাচ্ছিলাম।

সব লড়াই-ই একসময়ে থামে। এটাও থামল। দেখি, ভিড়ের ভেতর চ্যাংদোলা করে পালানকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছে কিছু পাড়ার লোক। তার পেটে বুকে বল্লমের ফুটো, মাথা রক্তের টুপি পরে আছে। ঘেউ মাটিতে পড়ে করুণ আর্তনাদ করছিল। অনেক চেষ্টাতেও সে কোমর আলগা করে দাঁড়াতে পারছিল না।

মানুষ কীভাবে যুদ্ধে জিতবে তার কোনো নিয়ম নেই। অনেক সময়ে মানুষ যুদ্ধে জিতেও হারে, আবার কখনও হেরেও জিতে যায়।

এই ঘটনার দু-মাস বাদে দেখা যেত, পালান আবার খেতের কাজে নেমেছে। তবে আগের মতো অতটা দৌড়ঝাঁপ গাছবাওয়া পারে না। ধীরেসুস্থে টুকটুক করে কাজ করে বেড়ায়, দাদুর সঙ্গে ছায়া হয়ে লেগে থাকে।

ঘেউও আগের মতো নেই। তার একটা ঠ্যাং সব সময় উঁচু হয়ে থাকে। তিন ঠ্যাঙে সে নেংচে নেংচে ঘোরে দাদুর সঙ্গে।

দাদু নির্বিকার। সেই হেঁটো ধুতি, খালি গা আর হাতে সবসময়ে গৃহকর্মের নানা সরঞ্জাম।

মেজোকাকিমা তখন ঘোমটা টেনে খুব লজ্জা-বউয়ের মতো নানা কাজকর্ম করে বেড়ায়। জেঠিমা, মা, কাকিমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই খায়, গল্প করে, হাসেও।

এখন অধরার বড়ো কাজ বেড়েছে। সামনে অগ্রহায়ণে পালানের সঙ্গে তার বিয়ে, পালানকে সেইজন্য দাদু একটু জমি দিয়েছেন ঘর বাঁধতে, তাতে অবসর সময়ে ঝুড়ি দিয়ে মাটি ফেলতে হয় অধরাকে। ভিত করে তারপর বাঁশবাঁখারি টিন দিয়ে ঘর উঠবে। বড়ো খাটুনি। মেজোকাকিমা তাকে যখন-তখন ডাকলে সে একটু বিরক্ত হয়ে বলে, বাবা রে বাবা, সবসময়ে তোমাদের কাজে মাথা দিলেই চলবে! আমার নিজের বুঝি কাজ নেই?

বাঘ

এইখান দিয়ে একটু আগে একটা বাঘ হেঁটে গেছে। নরম মাটিতে এখনও টাটকা পায়ের দাগ। বাতাস শুঁকলে একটু বোঁটকা গন্ধও। বাঘটা শুধু যে বেড়াতে বেরিয়েছিল, এমন নয়। ফেরার পথে বাজারও করে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ বুড়ো হরিচরণের একটা বাছুরও নিয়ে গেছে মাঠ থেকে তাই কাদা মাটিতে বড়ো বড়ো রক্তের চাপ পড়ে আছে। জেলির মতো জমে গেছে। হ্যাট মাথায় কয়েকজন হাফ প্যান্টপরা শিকারি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝোপে ঝাড়ে। বিটাররা নদীর ধারের জঙ্গলের ওপাশ থেকে টিন, ঘণ্টা আর যা পেয়েছে সব বাজাতে বাজাতে আসছে। একজন পাইপ মুখে শিকারি বন্দুকটা ধাঁ করে মাঝখানটায় ভেঙে কার্তুজ পরীক্ষা করে নিল, তারপর ফড়াক করে আবার সোজা করল বন্দুক। সবাই তৈরি।

বাঘটা সেবার বেরোয়নি। কিন্তু বহুকাল আগের দেখা এই দৃশ্যটা আজও ভুলতে পারে না জোনাকিকুমার।

বাঘটা বেরোয়নি বলেই কি আজও এইরকম অপেক্ষা করছে সে?

মাঝদুপুরে আজ বৃষ্টি নামল। তারপরই হঠাৎ থেমে গেল। আবার নামল, আবার থেমে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে জোনাকিকুমারও এক-একবার এক-একটা বাড়ির সদরে বা লবীতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং এইভাবে সে ময়দানের কাছে একটা আঠারোতলা অফিস বিল্ডিংয়ে পৌঁছেছে সীতানাথের সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখা হল না। সীতানাথ তেরোতলায় বসে। শুনল সে আজ ফুটবল খেলা দেখতে গেছে। জোনাকি একটু হতাশ আর নিঃসঙ্গ বোধ করে। সীতানাথকে পেলে কদমের মেস-এ গিয়ে তাস পেটানো যেত। হল না। কিন্তু তেরোতলা থেকে একঝলক ময়দান দেখে সে বড়ো অবাক হয়ে গেল। এ বাড়িতে সীতানাথের অফিসই সদ্য উঠে এসেছে, এই প্রথম সীতানাথের অফিসে এসেছে জোনাকি। তেরোতলা থেকে ময়দান সে আর কখনও দেখেনি। কী আশ্চর্য সবুজ! বিশ্বাস হয় না। কলকাতা নয়, ঠিক বিলেত বলে মনে হয়। ভিকটেরিয়া মেমোরিয়ালটা পর্যন্ত চেনা বলে মনে হয় না। নীচে চৌরঙ্গীর রাস্তা, টিকিওলা ট্রাম যাচ্ছে, ভোঁতা ডবলডেকার গাড়ি—সবই অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। ছিমছাম এক ইউরোপের শহর যেন। ময়দান এত সুন্দর জানা ছিল না তো!

জোনাকি আবার লিফটে নেমে এল। আগাগোড়া বাড়িটা এয়ারকন্ডিশন করা, ভেজা গায়ে শীত করছিল। বেরোবার মুখে দেখল, ফের বৃষ্টি নেমেছে। নামুক। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই। এ ব্যাপারটা সে আজকাল মাঝে মাঝে টের পায়। কোথাও যাওয়ার নেই। এত কম লোকের সঙ্গে তার চেনাশোনা।

বছর দুই আগে তার একজন সুন্দরী প্রেমিকা ছিল, তিতির। দু-বছর আগে তিতিরের কাছে যাওয়ার ছিল। তখন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনে হত—তিতির। অফিস ছুটি হলেই মনে হত—তিতির। ছুটির দিন কাছে এলেই মন বলত—তিতির। তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। দু-বছর আগে তিতিরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই জোনাকির জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ বৃষ্টি পড়ছে। গাছপালা, মানুষজন, চাষ-আবাদ সবই দেখতে হয় বৃষ্টিকেই। শেষ বর্ষায় সে তাই বকেয়া কাজ মিটিয়ে দিচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে অফিসের মুখটায়। তার মধ্যে জোনাকিও। তার কোনো জায়গার কথা মনে পড়ছে না, বৃষ্টির পর যেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটানো যায়। তাই সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। বিটাররা বাজনা বাজাচ্ছে, শিকারিরা বন্দুক হাতে তৈরি। বাঘটা কি বেরোবে?

তা জীবনে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। জোনাকিরও বেরিয়েছিল। যে মফসসল শহরে সে বাঘ দেখতে শহরতলি ছাড়িয়ে নদীর ধারের গাঁয়ে গিয়েছিল, সেই শহরের একটা ইস্কুল থেকে সে স্কুল ফাইনালে দশম স্থান অধিকার করে। পড়াশুনোয় অবশ্য বরাবরই ভালো ছিল সে, ফার্স্ট হত ক্লাসে। পরীক্ষাও ভালোই

দিয়েছিল। কিন্তু তা বলে দশম? নিজেই সে বড়ো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ঘটনার পর সবাই জোনাকির দিকে তাকাল ভালো করে। দারুণ জিনিস আছে তো ছেলেটার মধ্যে।

আর সেইটেই ছিল জোনাকির অস্বস্তির কারণ। তার ভিতরে যে তেমন কিছু নেই এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পেত। মুশকিল হল, একবার দশম হয়ে গেলে পরে আর রেজাল্ট খারাপ করা যায় না, লোকে হাসবে। তাই জোনাকি খুব খেটে আই এস-সি দিল। ফার্স্ট ডিভিশনটাও হল না। তারপর থেকে সে হাঁফ ছেড়ে সাদামাটা হয়ে গেল। বি এস-সি-তে পিওর ম্যাথেমেটিকসে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেল, এম এস-সি পড়ল না। চাকরি পেয়ে করতে লাগল।

সেই টেনথ হওয়ার কথা ভাবল। আজকাল ভারী লজ্জা করে। কেন যে সে টেনথ হতে গেল! ওই একবার টেনথ হওয়ার ফলে সবাই পরবর্তী জোনাকিকে দেখে দুঃখ করে। বলে—তোমার ব্রিলিয়ান্ট ক্যারিয়ার হওয়ার কথা ছিল হে জোনাকি, এ তুমি কী হলে? এরকম দুঃখ মাঝে মাঝে জোনাকিরও হয়।

কেউ কেউ বলে সায়েন্স না পড়ে আর্টস পড়লেই জোনাকি ভালো করত। কিন্তু তা জোনাকির মনে হয় না। সে তো সেই আই এস-সি পড়ার সময় থেকেই বিস্তর খোঁজখবর রাখত। ই ইজ ইকুয়াল টু এস সি স্কোয়ার, আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত ইকুয়েশন পর্যন্ত জানা ছিল তার। এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু মাস টাইমস দি স্পীড অফ লাইট স্কোয়ারড। কজন জানত তা? বি এস-সি বই থেকে সে অঙ্ক কষত ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে। তবু পারা গেল না। আসলে বোধহয় জীবনে ওই একটাই ভুল করেছিল সে, স্কুল ফাইন্যালে দশম হয়ে। সেটা না হলে আজ কারও দুঃখ থাকত না। তার নিজেরও না।

যে চোখ বাঁধা ম্যাজিসিয়ান এতক্ষণ এলোপাতাড়ি তির ছুঁড়ছিল মাটিতে, সে এবার তার খেলা থামিয়েছে। বৃষ্টি ধরল। না ধরলেও ক্ষতি ছিল না। জোনাকির কোথাও যাওয়ার নেই।

বেরোবার মুখে একজন বয়স্ক লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। বলল—এরকম বৃষ্টির কোনো মানে হয়? বলুন তো?

জোনাকির মনে হয় মুখটা চেনা-চেনা। সে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটা তার দিকে চেয়ে একটা চেনা-হাসি দিয়ে বলে—সীতানাথকে খুঁজতে এসেছিলেন? ওর ভীষণ ফুটবলের নেশা।

জোনাকি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে বলে—আপনি কি ওর অফিসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছেন আমাকে, মনে নেই বোধহয়। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি, সীতানাথের কাছে মাঝে মাঝে পুরোনো অফিসে আসতেন। তখন থেকেই চিনি। আপনি তো জোনাকি সেনগুপ্ত স্কুল ফাইন্যালে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জোনাকি তাড়াতাড়ি বলে লোকটাকে কথাটা শেষ করতে দেয় না।

—সীতানাথকে তো পেলেন না, এখন কোনদিকে যাবেন?

—ভাবছি। বলে জোনাকি।

—ভাবাভাবির আর কী? চলুন আমার বাসায় চলুন।

জোনাকি অবাক, বলে—আপনার বাসায়? লোকটা অমায়িক হেসে বলে—বেশিদূর নয়। বেকবাগান। আমার ছেলেমেয়েরা কখনও স্ট্যান্ড করা ছাত্র দেখেনি। আপনাকে দেখলে খুব ইমপেটাস পাবে। চলুন না, সবাই খুব খুশি হব আমরা।

হঠাৎ জোনাকি রাজি হয়ে গেল, বলল—চলুন।

দুই

তিতিরের মাথা নানা রকম রান্নার পোকা ঘুরে বেড়ায়। যেমন আজ সন্ধেবেলা তিতির একটা অদ্ভুত রান্না করল, ডিমের সঙ্গে বেগুন দিয়ে ওমলেট। তার নাম দিল—ডিমবেগ। পাতলা করে কাটা বেগুনের চাক

ফেটানো ডিমে ভিজিয়ে ডোবা তেলে ভাজা। মন্দ নয় খেতে, একটা চেখে দেখল তিতির। তেলটা বড্ড বেশি লাগে।

ভেবে একটু ভ্রূ কোঁচকায় তিতির। বেশি তেলের ব্যাপারটা তাকে খোঁচা দেয়। বাস্তবিক, এই তেল-টেল নিয়ে ভাবতে তার একদম ভালো লাগে না। ভাবার অবশ্য দরকার নেই। তার সংসারে অভাবের ছিটেফোঁটাও নেই, বরং সবই অঢেল আছে। আসছেও। কিন্তু তবু বেশি তেল লাগার ব্যাপারটা তাকে তার বাপের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে এখনও তার আত্মীয়রা তেল, চাল ইত্যাদির ব্যাপারে বড়ো সতর্ক। সেই মানসিকতা আজও একটু রয়ে গেছে তিতিরের।

ফেটানো ডিম আর বেগুনের চাক সরিয়ে রেখে রান্না করার লোক চিত্তর দিকে তিতির তাকাল। সে রান্না করছে বলে চিত্ত এতক্ষণ সরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ সেরে নিচ্ছিল।

তিতির বলল—খাওয়ার সময়ে ওগুলো ভেজে দিয়ো।

চিত্ত ঘাড় নাড়ে। তিতির চলে আসে।

কী বিশাল এই ফ্ল্যাটবাড়িটা! হাঁটলে যেন জায়গা ফুরোয় না। এক লাখের কাছাকাছি দাম পড়ল ফ্ল্যাটটার। তার ওপরে মেইনটেনেন্স চার্জও অনেক পড়ে যায় প্রতি মাসে। এসব নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তবু হঠাৎ মনে হয়—কতগুলো টাকা!

এ-দেয়াল ও-দেয়াল জুড়ে জানলা। খুলে দিলে ঘরটা বারান্দা হয়ে যায়। সাত তলার ওপর থেকে নীচের দিকে তাকায় তিতির। এত ওপরে থেকে অভ্যাস নেই তো। মাথা ঘোরে। জানলাগুলোয় কেন যে ছাই গ্রিল দেয়নি ওরা! অমিতও অবশ্য গ্রিল লাগাতে রাজি নয়, বলে—গ্রিল দিলে খাঁচার মতো হয়ে যাবে। কিন্তু তিতিরের ভয় করে। আকাশটা যেন হাত বাড়িয়ে রয়েছে। একতলা পর্যন্ত বিশাল শূন্যের ব্যবধান যেন ক্রমাগত জানলা দিয়ে তাকে ডাকে—এসো, লাফিয়ে পড়ো।

তিতির সরে আসে। লাফিয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। তার জীবনে কোনো দুঃখ আছে?

অমিত দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফেরার সময়ে একটা মস্ত টেলিভিশন সেট নিয়ে এসেছে। সামনের ঘরে সেটা রাখা, ওপরে পুতুল, ফুলদানি। এখনও অবশ্য টেলিভিশনের পর্দা অন্ধকার। কলকাতায় টি-ভি চালু হলে তারা দেখবে সেই আশায় আগে থেকে এনে রেখেছে অমিত। বিদেশ থেকে আনা কত কী তাদের ঘরে!

তিতিরের মুখখানা ছিল সুন্দর। বয়সকালে শরীরটা দেখনসই হয়েছিল। তার জোরেই না অসম্ভব ভালো পাত্র জুটে গেল তার! তিতির আয়না দেখল না, কিন্তু টি-ভি সেটের সামনে একটা গদির হেলানো চেয়ারে বসে নিজের মুখখানার কথা, সৌন্দর্যের কথা ভাবতে লাগল।

দু-বছর হয়ে গেল, অমিত এখনও ছেলেপুলে চাইছে না। কিন্তু পুরুষমানুষের ছেলেপুলের ঝোঁক থাকেই। কবে বলবে—তিতির এবার ছেলে দাও।

যতদিন তা না চায় অমিত, ততদিন তিতির বেশ আছে।

না, খুব ভালো অবশ্য নেইও তিতির। ওই যে শিকহীন গ্রিলহীন মস্ত জানলাগুলি, ওগুলোকেই ভীষণ ভয় তার। দিনের বেলায় রোদভরা আকাশ, রাতে আকাশভরা জ্যোৎস্না বা অন্ধকার, নক্ষত্ররাশি হাওয়া সব কেমন হু-হু করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে! ঘরটা যেন বাহির হয়ে যায়। একা থাকে তিতির। ওপরের ফ্ল্যাটে বা পাশের ফ্ল্যাটে কোনো শব্দই হয় না, কারও গলার স্বর কানে আসে না। আর এই গভীর নিস্তব্ধতায় ওই খোলা জানালা দিয়ে হাতির মতো ঢুকে আসে বাইরেটা। ভীষণ হু-হু করে ঘরদোর। হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে সব উলটে পালটে দেখে, এঘর ওঘর খুঁজে বেড়ায়, বলে—খুব সুখী তুমি তিতির।

সুখীই তিতির। শুধু ওই খোলা জানালাগুলোই তাকে দুঃখ দেয়। আগে ছেলেপুলে হোক, তখন অমিতকে বলবে গ্রিল দিতে। ছোটো খোকা হামাগুড়ি দেবে, হাঁটতে শিখবে, ডিং মেরে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি দেবে—মাগো তখন যদি পড়ে যায়? খোকার জন্য তখন ঠিকই গ্রিল দিতে রাজি হবে অমিত। কিন্তু এসব

বাড়িতে গ্রিল দেওয়ার নিয়ম আছে কিনা কে জানে! হয়তো কোম্পানি থেকে বলে দেবে যে, গ্রিল-ট্রিল চলবে না, তাতে বাড়ির সৌন্দর্য থাকে না। তখন ওই বাইরের হাতিটা চিড়িয়াখানার হাতির মতো জানলার ওপাশে আটকে থেকে শুঁড় দুলিয়ে বলবে—খুব সুখী তুমি তিতির!

তিতির উত্তর দেবে—হ্যাঁ হাতিভাই, আমি খুব সুখী। তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যেয়ো।

বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসে না। না আসাই স্বাভাবিক। ওরা আসতে ভয় পায়। সংকোচ বোধ করে। বড্ড বড়োলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যে তিতিরের। সবসুদ্ধ তিন বোন তারা। তিতির ছোটো। বড়ো দুই দিদির ভালোই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা এখন সূর্যের পাশে মাটির পিদিম হয়ে গেছে।

এসব ভাবতে বুকে একটু দুঃখ আর একটু সুখ, দুটি ঢেউ ভাঙে।

টুং করে কলিং বেল-এ পিয়ানোর একটা রীডের শব্দ ওঠে। রোজ এরকম শব্দ। দরজায় একটা কাচের চৌখুপি আছে। সেইটি দিয়ে দরজা খোলার আগে দেখে নেয় তিতির। হ্যাঁ, অমিত।

অমিত ঘরে আসে। আগে আগে দরজার কাছেই সর্বাঙ্গ দিয়ে চেপে ধরত তিতিরকে, মুখের সর্বত্র চুমু খেয়ে নিত। আজকাল খায় না। অত কী? রোজ তো খাচ্ছেই অন্য সময়ে।

অমিত ঘরে ঢুকে বলে—আজও?

তিতির চমকে বলে—কী?

—তুমি ম্লানমুখী।

তিতির লজ্জা পেয়ে বলে—না। জানো, আমি না ওই জানালাগুলোর কথা ভাবছিলাম। বড্ড ভীষণ ফাঁকা।

—ওঃ! আমি ভাবি, বুঝি তিতির তার কোনো পুরোনো প্রেমিকের কথা ভাবছে।

তিতির রাগ করে বলে—ভাবছি তো! সে এসে ওই জানলা দিয়ে ডাকে। একদিন ঠিক ঝাঁপ দেব।

অমিত একটু বেঁটে, কালো, একটু মোটাও। ইদানীং মেদ কমানোর জন্য স্লিমিং কোর্স নিচ্ছে। অফিসের পর সেখানে যায়। আলু, মিষ্টি খায় না। কত খাবার বানায় তিতির। ও খায় না। কেবল একটু আধটু ড্রিঙ্ক করে। ওর বেহিসেবি হলে চলে না। কত কাজ ওর!

—আজ একটা নতুন খাবার করলাম মাথা খাটিয়ে।

—কী?

—ডিমবেগ। খেতে বসে দেখবে, আগে বলব না, কী দিয়ে তৈরি হয়েছে।

অমিত হেসে বলে—তোমার সেই নিরামিষ ডিমের কারিটা যেন কী দিয়ে করেছিলে?

—কেন, খারাপ হয়েছিল? ডিমের বাইরের সাদাটা করেছিলাম ছানা দিয়ে, আর ডালসেদ্ধ দিয়ে কুসুম।

—বেশ হয়েছিল। তবে কিনা ওসব বেশি খেলে আমার আবার না ফ্যাট বাড়ে।

—তা বলে না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলবে নাকি? ওসব চলবে না। ঘরভরতি এত খাবার, খায় কে বলো তো?

তিন

ভদ্রলোকের নাম শচীন দাশগুপ্ত। ছেলেমেয়েদের সামনে জোনাকিকে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন—এই ইনি স্কুল ফাইন্যালে—

জোনাকি লজ্জা পায় আজও। বাঘটা একবার বেরিয়েছিল, তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জোনাকিকে শচীনবাবু তাঁর ঘরের সবচেয়ে ভালো চেয়ারে বসালেন, এমনভাবে বসালেন যাতে মুখে ভালোভাবে আলো পড়ে। তাঁর চার-পাঁচজন ধেড়ে ধেড়ে ছেলেমেয়ে হাঁ করে দেখছিল, গিন্নিও এলেন। এক বুড়ো আত্মীয় কেউ এসেছেন, তিনি বাক্যহারা। স্ট্যান্ড করা ছেলে। ইয়ার্কি নয়।

কেবল জোনাকিই জানে—এটা কত বড়ো ইয়ার্কি। তবু খারাপ লাগে না। শচীনবাবুর বড়ো মেয়েটি যুবতি। সে বেশ চেয়ে থাকতে জানে। জোনাকির খারাপ লাগছিল না।

বুড়ো আত্মীয়টি জিজ্ঞেস করেন—কী করেন?

—চাকরি।

—আ হা, চাকরি করেন কেন? ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা এডুকেশন লাইনে থাকলে ছাত্ররা কত কী শিখতে পারে! বড়ো চাকরির লোভে কত ভালো ছেলে নিজেকে নষ্ট করে, দেশও বঞ্চিত হয়।

—আমি বড়ো চাকরি করি না। সামান্য কেরানি।

—সে কী? বলে শচীনবাবুর আত্মীয় চেয়ে থাকেন।

শচীনবাবু একটু মলম লাগানোর চেষ্টা করে বলেন—তাতে কী? উনি টেনথ হয়েছিলেন সেটা কি তা বলে মুছে গেছে? বোর্ডের খাতায় তো আর নামটা মুছে ফেলেনি। যাকে বলে দশজনের একজন।

—তা বটে। বলে আত্মীয়টি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন বোধহয়।

জোনাকির লজ্জা করছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারল, শচীনবাবুর মেজোছেলে তার মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে দোকানে গেল খাবার আনতে। শচীনবাবুর বড়ো মেয়ে জোনাকিকে একটুও অপছন্দ করছে না। কেবল আত্মীয়টি উঠে বললেন—চলি। রাত হল। কেউ তাকে থাকতে বলল না।

কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। কী করে হবে, এদের সঙ্গে যে মোটেই পরিচয় নেই। তাছাড়া টেনথ হওয়া ছেলে। মুখ ফসকে বেশি কথা বলা ভালোও দেখাবে না। মিষ্টি খেয়ে উঠে পড়ল জোনাকি।

শচীনবাবু আর তাঁর স্ত্রী বলবেন—আবার আসবেন। খুব ভালো লাগল।

শচীনবাবুর বড়ো মেয়ে নিমি আলাদা করে বলল—আসবেন কিন্তু। আগে খবর দেবেন, আমার বন্ধুরাও আসবে দেখতে।

জোনাকির বড়ো লজ্জা করছিল। বাঘটা মোটে একবার—

বেরিয়ে এসে জোনাকি দেখল, এখনও মোটেই রাত হয়নি। বাড়ি গিয়ে কিছু করার নেই। বাবা সাত সকালে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মা বড়ো মেয়ের বাচ্চার জন্য কাঁথা সেলাই করছে। সাঁঝ-ঘুমোনী ছোটো বোনটা বিবিধ-ভারতী চালিয়ে শুয়ে আছে। বড্ড ছোটো বাসা।

ওই বাসায় তিতিরকে মানাত না। তার চেয়ে বরং শচীনবাবুর বড়ো মেয়েকে বেশ মানায়। ভাবতেই হঠাৎ চমকে ওঠে জোনাকি। তাই তো! শচীনবাবুরা দাশগুপ্ত না! পালটি ঘর। তবে কি শচীনবাবু ভেবেচিন্তে প্ল্যানমাফিক জোনাকিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে? আশ্চর্য নয়। হয়তো অফিসের গেট-এ তাকে দেখেই শচীনবাবুর মাথায় কল্পনাটা খেলে থাকবে। কেরানি হোক আর যা-ই হোক, এক সময়ের টেনথ হওয়া ছেলে তো?

ভাবতেও জোনাকির লজ্জা করছিল। এ হয় না। ওই টেনথ হওয়ার জন্যই এক সময়ে তিতিরও তাকে পছন্দ করেছিল। পরে, ভুল বুঝতে পারে। বাঘটা একবারই—

খুব একটা সুন্দর রাস্তা দিয়ে এখন হাঁটছে জোনাকি। এসব রাস্তায় তো বড়ো একটা আসা হয় না। চারদিকে বিশাল বিশাল নির্জন সব অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠেছে, আরও কিছু বাড়ির কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। হুশ করে একটা দুটো মোটরগাড়ি চলে যায়। আর কোনো শব্দ নেই। কারা থাকে এখানে? শিকারি, না বাঘ?

বৃষ্টি এল। উপায় কী, জোনাকি দৌড়ে গিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় উঠে পড়ল। আসলে দরজাও ঠিক নয়, মস্ত গ্যারেজ ঘরের ফাঁকা জায়গা। দারোয়ান বসে বৃষ্টি দেখছে আর খইনির থুতু ফেলছে। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। জোনাকি দাঁড়িয়ে অজস্র ঝিকিয়ে ওঠা অস্ত্রের মতো বৃষ্টির ধারা দেখে। কিছু করার নেই। তবে অপেক্ষা করতে তার মন্দ লাগে না। কোথাও তো যাওয়ার নেই। সেই দু-বছর আগে, যখন তিতির ছিল, তখন যাওয়ার জায়গা ছিল। তিতিরই তো একটা জায়গা। কত সুন্দর সব দৃশ্য ছিল তিতিরের নানা ভঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে।

সেই ভীতু বাঘটা কেন কোনোদিনই বেরিয়ে এল না? কেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ওইভাবেই লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে? ওইভাবেই লুকিয়ে থেকে সে কি মরে গিয়েছিল একদিন? কেন গর্জন করে বেরিয়ে আসেনি? সত্য বটে শিকারিরা ছিল, তাদের হাতে ছিল কার্তুজ-ভরা

রাইফেল। কিন্তু এও তো সত্য যে ছিল অবারিত মাঠ, বিশাল পৃথিবীর মুক্তিও! সে উত্তাল গতিতে বেরিয়ে ছুটে চলে যেতে পারত, সেই মুক্তির দিকে। শিকারির গুলি কি সব বাঘের গায়ে লাগে। লাগলেই বা কী, তবু তো বুঝতে পারত, তার মৃত্যুও কারও কারও প্রয়োজন! তাই অত শিকারির আনাগোনা, অত সতর্ক দৃষ্টি অত ক্যানেস্তারা পেটানো। কত গুরুত্ব তার?

একটা গাড়ি কেমন চমৎকার সবুজ। কী বিশাল তার চ্যাপটা আর সবুজ দেহখানি। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। একজন লোক নেমে চলে গেল লিফটের দিকে। ফিরেও তাকাল না। হতে পারত জোনাকিও ওরকম। যদি কেবলমাত্র দশম হওয়াটুকু বজায় রাখতে পারত সে। কেন পারেনি, তা আর একবার ভাববার চেষ্টা করল সে। ভেবে দেখল, পারেনি বলেই পারেনি। বড্ড বেশি সচেতন হয়ে গিয়েছিল নিজের সম্পর্কে। মফসসলের স্কুলে এক গরিবের ছেলের অতটা হওয়ার কথা নয় তো! বড্ড বেশি পড়ত, তাতেই মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কিংবা কী যে হয়েছিল এতদিন পর তা আর মনে পড়ে না।

যদি হত তবে জোনাকিকুমার আজ এরকম একটা মস্ত ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে পারত, গাড়ি চালাত। তার বউ হত তিতির বা ওরকমই কেউ। খুব সুন্দর। এই বৃষ্টি বাদলার পৃথিবীতে কেবলই পথ ছেড়ে উঠে এসে পরের দরজায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে বৃষ্টি দেখতে হত না। বেশ সুখেই থাকত এক সফল জোনাকিকুমার। নিমির মতো হাঘরে মেয়েরা তাদের তুচ্ছ ঘর-সংসারে তাকে ডাক দেওয়ার সাহসই পেত না।

এত বৃষ্টি! ঝড়ের হাওয়ায় সমুদ্র থেকে উড়ে আসে মেঘ। পরতে পরতে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। রাস্তায় প্রতিহত জলকণা উঠে চারদিক ঝাপসা করে দেয়। চেনা পথ ধুয়ে যায় বৃষ্টিতে, ঘরে ফেরার দিকচিহ্ন উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়। আজও মনে হয়, এই দুর্যোগেও কোথাও যাওয়ার নেই জোনাকির। এই তো বেশ দাঁড়িয়ে আছে। কেটে যাচ্ছে আসলে খানিকটা সময়। জোনাকির সময়ের অভাব নেই। যে যদি সফল জোনাকি হত তো থাকত। কত ব্যস্ততা, কত টেলিফোন, কত নানাজনের ডাক। সেসব নেই জোনাকির। মস্ত বাড়ির তলায় নীচু গ্যারেজ ঘরে এই কেমন ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছে। অনেকগুলো গাড়ি চলে এল গ্যারেজ ঘরে। কত গাড়ি! দারোয়ান উঠে আলো নেভাচ্ছে। এর পর দরজা বন্ধ করবে। তার আগে হয়তো বা চলে যেতে বলবে জোনাকিকে। সে বড়ো অপমান। এ বাড়িতে তার ঘর নেই ঠিকই, কিন্তু তা বলে কোনো জায়গা থেকে কেউ চলে যেতে বললে আজও অপমান বোধ করে সে।

জোনাকি তাই বৃষ্টিতেই নেমে এল। কী প্রবল ধারা! গায়ে ছ্যাঁক করে শীতের ছোঁয়া লাগল প্রথমে। তার ফাঁকা মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা ডুগডুগ করে বেড়ে উঠল। লক্ষ আঙুল দিয়ে বৃষ্টি তাকে চিহ্নিত করে বলতে থাকে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

কোথাও যাওয়ার নেই। তবু যাওয়া থেকেই যায় মানুষের। কেন যে যায়! থেমে পড়লেই তো হয় মাঝপথে! কেন কেবল যেতেই হবে?

রাস্তায় লোকজন নেই। একা জোনাকি হেঁটে চলেছে। চোখ অন্ধ ও শ্রবণ বধির করে দিয়ে অনন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে যেতে থাকে। পোশাক চুপসে যায়। কাঁপুনি উঠে আসে শরীরে। ভিজে ভিজে হাঁটে জোনাকি। চারদিকে মেঘ ডাকছে। একটা বজ্রপাতের শব্দ হয়। জোনাকি একবার বলে—জানো না তো, তুচ্ছ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কীরকম আনন্দ আছে!

কাকে বলে কে জানে!

চার

—ওগো শোনো, কী ভীষণ ঝড় উঠল! তিতির ভয়ের গলায় বলে।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে অমিত বলে—ঝড়! তাতে কী? এ বাড়িতে কোনো ভয় নেই তো তিতির!

—বড্ড হাওয়ার শব্দ হচ্ছে যে!

—এত ওপরে একটু বেশি হাওয়া তো লাগবেই। কিছু ভয় নেই। আমার তো ইচ্ছে করে এই ঝড়ের মধ্যে বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে পড়ি। খোলা হাওয়া বৃষ্টির জল আমাকে ধুয়ে মুছে দিক।

—আহা।

—সত্যিই। খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি তো যেতে দেবে না।

—দেব না-ই তো!

—জানি। বড্ড রুটিন হয়ে গেছে জীবনটা।

—রুটিন না হলে চলে? তোমার কত কাজ! তিতির ওকে একটু আদর করে বলে।

একটু ড্রিঙ্ক করেছিল অমিত। বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তিতিরের আর ঘুম আসে না। সে উঠে এয়ারকুলার বন্ধ করে দিল। ঠান্ডা লাগছে।

একটা ধূসর পর্দায় জানালাগুলো ঢাকা। পর্দা নড়ছে না। কিন্তু বাইরে হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে ঝোড়ো বাতাস। কাচের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে অবিরল টোকা দেয় গোপন প্রেমিকের মতো। তিতিরকে ডাকে।

উঠতেই হয় তিতিরকে। একটা বাজ পড়ল কোথায়। বাড়িটা তার অজস্র কাচের শার্সি নিয়ে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। ঘুম আসবে না। একরম ঝড়বৃষ্টির রাতেই ভালো ঘুম আসে লোকের, কিন্তু তার আসবে না।

তিতির পর্দাটি সরিয়ে দেখে, কলকল করে জলস্রোত নেমে যাচ্ছে শার্সি বেয়ে। নীচে একটা ডাইনির শহর —যত না তার আলো তত বেশি ভূতুড়ে অন্ধকার। বাড়ি-ঘর সব যেন নুয়ে গেছে, গাছপালা হয়ে গেছে কাল্পনিক গাছের ছবির মতো, আলোগুলো বৃষ্টিতে দিপদিপ করে। এত উঁচু থেকে সবই মনে হয় বড্ড দূরের। মাঝখানে শূন্য। আর এই গভীর রাত্রে শার্সি ভেদ করে সেই শূন্যটা ঘরের মধ্যে চলে আসতে থাকে।

বাতি জ্বেলে টি-ভি সেটটার মুখোমুখি বসে এসে তিতির। হাই তোলে। অমিতের জন্য একটা সোয়েটার বুনছিল, সেইটে নিয়ে বসে।

হাতিটা ভেজা গায়ে সামনে দাঁড়ানো, বলে—খুব সুখে আছো তুমি তিতির।

—হ্যাঁ হাতিভাই। কেবল ওই জানলার গরাদ লাগানো বাকি। সেটা হয়ে গেলে আর কী চাই!

—সেটা লাগাতে খুব বেশি দেরি কোরো না তিতির। কী জানি, কবে তোমাকে আমি চুরি করে নিয়ে যাই জানলা দিয়ে।

—ও কথা বোলো না হাতিভাই। আমি তো কোনো পাপ করিনি যে মরব। বরং এত সুখে থেকেও আমি কখনও আর দশজনের কথা ভুলি না। গত রবিবারে আমরা আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিয়ে এলাম। শিরাতে ছুঁচ ফুটিয়ে কত রক্ত বের করে নিল বলো তো! অনাথ আতুরদের জন্য যে ফান্ড খোলা হয়েছে তাতে আমরা প্রতি মাসে অনেক টাকা দিই, মাঝে মাঝে কালেকশনে বেরোই। মূক-বধিরদের জন্য, অন্ধদের জন্য, আমরা সব সময়েই ব্যথিত। যা পারি, যতখানি পারি করি। সুখী বলেই স্বার্থপর ভেব না আমাদের।

হাই উঠছে। ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ। তবু ঘুমোতে গেলেই কী একটা হয়। এই ঝড়-জলের রাতটা তার দুর্যোগ নিয়ে কেবলই ঢুকে আসে ফ্ল্যাটে। কেন যে এত বড়ো বড়ো জানলা করেছে এ বাড়িতে। কোনো মানে হয় না। আকাশ ঢুকে পড়ে, বাতাস ঢুকে পড়ে। শূন্যতাও বেড়াতে আসে নির্লজ্জ প্রতিবেশীর মতো, এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিতিরের সুখ-দুঃখের খতিয়ান নিয়ে যায়। বিশ্রী। অমিত কিছুতেই তিতিরের একটা কথা শুনতে চায় না। ও কি বোঝে না যে জানলায় একটা প্রতিরোধ দরকার! ভীষণ দরকার!

টি-ভির পর্দাটা ঢালু, তার আলোহীন কাচে কোনো ছবি দেখা যায় না। কবে যে কলকাতায় টি-ভি চালু হবে! শোনা যাচ্ছে, ওয়ার্লড টেবিল টেনিস দেখাবে এবার। তাহলে কিছুদিনের জন্য বাঁচা যায়। স্নেহভরে একবার চমৎকার সেটটার দিকে চেয়ে থাকে তিতির।

হাতিটা এখনও যায়নি বুঝি। তিতিরকে ডেকে বললে—বলো তো সুখ কাকে বলে!

—সুখ! বলে তিতির ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। বলে—কী জানি বাবা! তোমার সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন। তবে মনে হয়, যার কখনও পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে না, যে কখনও অতীত নিয়ে ভাবে না, অনুতপ্ত বা দুঃখিত হয় না, যে কেবল প্রতিটি বয়ে যাওয়া মুহূর্তকে অনুভব করে—সেই সুখী।

উঠে ফের বাতি নিভিয়ে দেয় তিতির। বাইরে যে আজ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে! মাগো, গরিব-দুঃখীদের বড়ো কষ্ট।

—তোমার কিছু মনে পড়ে না তিতির?

হাতিটা তবে এখনও যায়নি! তিতির ভ্রূ কুঁচকে বলে—ওঃ! হ্যাঁ, চেষ্টা করলে আবছা সব মনে পড়ে। মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায়।

—কী রকম?

—এই ধরো না, আমি একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করতাম। সে স্কুল ফাইন্যালে টেনথ হয়েছিল। তারপর আর কিছু হয়নি। মনে পড়ে খুব একটা প্রেম হয়েছিল। ভারী মজার নাম ছিল তার। জোনাকি!

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শোওয়ার ঘরের দিকে চলেছে তিতির। আর একা একা খুব হাসছে। এত হাসি পায়। জোনাকি! কী নাম বাবা।

শোওয়ার ঘরে এসে একটু চমকে যায় তিতির। পর্দাটা সরানো। মস্ত জানালা কে অমন আদুড় করে দিল? বাইরে একটা ধূসর পাগলা ঝড়। মুহুর্মুহু কাচের শার্সিতে করাঘাত করছে এসে এক মহাশূন্য। বাতাস আকাশ। শার্সি জুড়ে এক বিশাল পর্দার টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে এক মহাজগতের মহাপ্রলয়।

শিউরে ওঠে তিতির। ও মা! জানলার একটা ধারের ছোট্ট একটা পাল্লা কে কখন খুলে দিল! বৃষ্টির প্রবল ছাঁট আসছে, বাতাস ঘূর্ণির মতো পর্দাটাকে ওড়াচ্ছে কোণের দিকটায়। তিতির জানলার কাছে দৌড়ে গেল। কিন্তু পাল্লার কাছে পৌঁছোতে পারল না। সেই আদিম পাগল ঝড়টা তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে—সরে যাও, সরে যাও, আমি তোমার ঘর তল্লাশি করতে এসেছি।

তিতির ভয় পেয়ে সরে আসে।

বিছানায় একটা হালকা চাদর গায়ে চাপা দিয়ে শুতে গিয়েই ফের ভীষণ চমকে ওঠে। অমিত কোথায় গেল?

—ওগো! বলে ভয়ার্ত তিতির উঠে বসে। কোনো উত্তর আসে না।

বাইরে হোহো করে হেসে ওঠে বাতাস। আকাশ বাঘের মতো ডেকে ওঠে শিকার খুঁজে পেয়ে।

—কোথায় গেলে তুমি?

অন্ধের মতো তিতির উঠে অন্ধকার ঘরে ঘুরতে থাকে। ঘরের একধারটা ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে বাতাসে। ওই রন্ধ্রপথে বার বার বাহির চলে আসে ঘরের মধ্যে। ঘরটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাইরে। আব্রু নষ্ট করে। অমিতকেও কি নিয়ে গেল?

ককিয়ে কেঁদে ওঠে তিতির। ও একটু আগেই বলেছিল, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ওর চলে যেতে ভালো লাগে। তিতির ভীষণ চিৎকার করে বলে—এত তাড়াতাড়ি আমার সব কেড়ে নিয়ো না। ওগো, কে তুমি বার বার আসো ঘরের মধ্যে? দয়া করো।

মস্ত ঘরের এককোণে একটু ছোট্ট দেশলাই কাঠির তিনকোনা আগুন জ্বলে ওঠে। অমিত বলে—তিতির, আমি তোমাকে খুঁজছি। এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দিয়েছ, দমবন্ধ লাগছিল, তাই একটা পাল্লা খুলে দিয়ে বসে আছি।

—ডাকোনি তো! তিতির চোখ মুছে, কান্না গিলে হেসে ফেলে।

অমিত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—সব সময়ে ডাকতে নেই তিতির। মানুষের মাঝে মাঝে একদম একা হওয়া দরকার। আমিও দ্যাখো না, একা বসে ঝড় দেখছি কখন থেকে!

তিতির কাছে গিয়ে বলে—কেন গো?

—ওঃ তিতির। কী প্রকাণ্ড এই আকাশ, কী বিরাট শূন্যতা চারদিকে। আর কী ভয়ংকর শক্তিমান ঝড়। এ-সব দেখলে নিজেকে তুচ্ছ লাগে বড়ো। মাঝে মাঝে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে কী যে আনন্দ হয়!

খানাতল্লাসি

আসুন ইনস্পেকটর, আসুন!

বলতে কী, একটা জীবন আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করেছি। আপনি আসবেন, খানাতল্লাশিতে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবেন আমার সযত্নে সাজানো সংসার, আপনি এবং আপনার সেপাইদের বুটের আওয়াজে চমকে উঠবে আমার শিশু ছেলের ঘুম, আমার বউ আর বোন কোণে লুকিয়ে কাঁপবে থরথর করে, আমার বুড়ো মা-বাপ ইষ্টনাম জপ করবে, আমার ভাই অকারণ গ্রেফতারের ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালাবে। দৃশ্যটা আমি দেখতে চেয়েছিলাম। জানিই তো ইনস্পেকটর একদিন আসবেনই তাঁর দলবল নিয়ে। বড়ো উৎকণ্ঠা ছিল, বড়ো ভয়। এই স্থায়ী ভয় থেকে পরিত্রাণ করতে আজ আপনি এলেন। যতদূর সম্ভব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যান আমার সংসার। এরপর আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। সুখীও।

আপনি লম্বা লোক, মাথাটা একটু নীচু করে আসুন। আমরা কেউ লম্বা নই বলে দরজাটা খুব উঁচু করে তৈরি করা হয়নি। জানেনই তো আমরা সব সাধারণ মানুষ, বেঁটেখাটো, আমাদের বড়ো দরজার দরকার হয় না।

এক মিনিট ইনস্পেকটর, আমার আগফা ক্লিক ক্যামেরায় আপনার একটা ছবি তুলে নিই!

না? নিয়ম নেই? তাহলে থাক। ক্যামেরাটা নিন, নিয়ে দেখুন, এর ভিতরে লুকোনো বোমা পিস্তল বা বিস্ফোরক নেই। ক্যামেরাই। তবে ফিলম, আছে কি না বলতে পারব না? ক্যামেরাটা 'আমার' বলে উল্লেখ করলাম, না? আসলে তা নয়। এটা আমার এক মাসতুতো বোনের। সে খুব বড়োলোকের বউ ছিল। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না। তার স্বামীর আবার অন্য মেয়েছেলে ছিল। বিয়ের পর থেকেই আমার সেই বোন দুঃখী। বড়ো কান্নাকাটি করত। সেই বোনই একবার নিমন্ত্রণে এ বাড়িতে এসে ক্যামেরাটা ফেলে যায় অন্যমনস্কতাবশত। সেই রাতে ফিরে গিয়েই টিক-কুড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করে। ক্যামেরাটা কেউ ফেরত নিতে আসেনি, আমরাও দিইনি। রয়ে গেছে। দিশি জিনিস, ভালো করে এর ট্রেডমার্কটা পরীক্ষা করতে পারেন। অন্তত এটা চোরাই আমদানি নয়।

আঃ, কী বিশাল চেহারা আপনার! আপনি যে রাজকর্মচারী তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ঠিক এরকমটাই আমি আশা করছিলাম। এরকম না হলে কি ইনস্পেকটরকে মানায়? আপনি যেমন লম্বা, তেমনি বিশাল আপনার কাঁধ, কী অসাধারণ আপনার দুটি দীর্ঘ ও সবল হাত! কী গম্ভীর আপনার পদক্ষেপ! আর কী অদ্ভুত তীব্রতা আপনার চোখে!

হ্যাঁ ইনস্পেকটর, এটাকেই বলতে পারেন আমাদের বাইরের ঘর। আপনি তো নিশ্চয়ই খরব রাখেন যে এটা আমার নিজের বাড়ি নয়? আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাড়া। একশো ত্রিশ টাকা, আর ইলেকট্রিক।

না, না, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা খুব লম্বা নই বলে দরজাটা উঁচু করে তৈরি করা হয়নি—এ কথার দ্বারা আমি কিন্তু এমন ইঙ্গিত করিনি যে বাড়িটা আমার বা আমাদের তৈরি। তা নয়। এখানে আমরা অর্থে আমরা সবাই। আমরা সবাই আজকাল বেঁটে মানুষ। যেমন আমি, তেমনি এ বাড়ির মালিক, তেমনি সব বাড়ির সবাই। ঢুকবার বা বেরোবার জন্য খুব বড়ো দরজার দরকার হয় না আমাদের। আপনার মতো দীর্ঘকায় অতিথিও তো বড়ো একটা আসে না আমাদের বাড়িতে।

হ্যাঁ, এটাই বাইরের ঘর। তবু বলি, মাত্র দু-খানা ঘর বলে এ ঘরটাকে আমরা এক্সক্লুসিভ করতে পারিনি। একাধারে ওই যে চৌকি দেখছেন, ওখানে আমার বাবা আর মা শোয়। মেঝেতে আমার বোন। না, ভাই শোওয়ার জায়গা পায় না। সে রাত্রিবেলা এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকে। ভিতরের ঘরটায় আমরা স্বামী স্ত্রী,

একটা ছোট্ট ছেলে। তবু এই ঘরটাই আমাদের বাইরের ঘর, কেউ এলে ওই যে সব তুচ্ছ চেয়ার দেখছেন ওগুলোয় বসে, গল্প-টল্প করে। এটাকে ড্রইংরুম বলা কি অপরাধ ইনস্পেকটর?

ফুলদানির মধ্যে কী খুঁজছেন ইনস্পেকটর? ফুলগুলো? হা-হা। না, ওসব ফুল আমি রোজ কিনি না। কী করে কিনি বলুন? হ্যাঁ, এখনও টাটকা তাজা ও সৌরভে ভরপুর ওই রজনীগন্ধা দেখে মোটেই ভাববেন না যে আমার রোজ ফুল কেনার পয়সা জোটে। বাড়তি পয়সা আমার মোটেই নেই। চুপি চুপি বলি ইনস্পেকটর, গতকাল আমাদের বিবাহ বার্ষিকী গেছে। না না, ওসব বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী পালন করা আমাদের হয় না। কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি, ফালতু উপহার কিনে পয়সাও নষ্ট করিনি, কেবল মায়াবশে স্মৃতিবিভ্রমে, ভাবপ্রবণতার দরুন একডজন ফুল কিনেছি। হে মহান ইনস্পেকটর, ক্ষমা করুন আমার এই হৃদয়দৌর্বল্য। না, সত্যিই আমাকে এসব মানায় না। ফুল দিয়ে কী হয়? কিচ্ছু না কিচ্ছু না। এ ফুল কেবল আমাদের বোকামির প্রতীক।

কিছু পেলেন ফুলদানির ভিতরে? না? আমিও জানতাম, কিছুই পাবেন না। ফুলগুলো ফেলে দিয়েছেন ছুঁড়ে। জল ঢেলে ফেলেছেন মেঝেয়, শূন্য ফুলদানিটা আছড়ে ফেলার জন্য হাত উদ্যত করেছেন, হে বৃহৎ, আপনাকেই এসব মানায়। চমৎকার। ফেলে দিন, লণ্ডভণ্ড করুন। আমি দেখি।

ওই কৌটোটা? না ইনস্পেক্টর, ওর মধ্যে কালো অন্ধকারে যা লুকোনো আছে তা নয় বুলেট বা বারুদ। ও হচ্ছে আমার মায়ের নামজপের মালা। দোহাই ইনস্পেকটর। বেডকভারটা তুলবেন না। ওর নীচে ছেঁড়া চাদর, তেলচিটে বালিশ।

তুললেন? হায় ঈশ্বর, আমি বরং দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকি। কী লজ্জা! ইনস্পেকটর, আপনি কি চাদর তুলে তোশকটাও দেখবেন? হায়। তবে আর লজ্জার কিছুই বাকি থাকবে না। কী করে তবে গোপন করব, ওই প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো তোশকটাকে? ওর তুলোগুলো চাপ বেঁধে খাপে খাপে স্তূপ হয়ে আছে, ছেঁড়া টিকিনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে তুলো, ওর সারা দেহে চন্দ্রদেহের মতো খানাখন্দ।

না মহান, আমি কাঁদছি না। তবে আপনি বড়ো নিষ্ঠুর। কেন দেখলেন ওসব?

ওই বাক্সটা? হা হা। না, ওটা বেঁটে বন্দুক বা লম্বা পিস্তল। হাসির কথা, আমার বাবা একসময়ে বেহালা বাজাতেন। আপনি কি কখনও বেহালার বাক্স দেখেননি? না, আমরা কেউ বেহালা বাজাতে জানি না। ওটা এমনি পড়ে আছে। দেখুন, ভালো করে দেখে নিন।

ফরেন মেড? আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বটে। তবে ওটাও সেই পঞ্চাশ বছর আগে ব্রিটিশ আমলে কেনা। তখনকার দিনে ওসব শৌখিন জিনিস বিদেশ থেকেই আসত। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই ক্ষুরটাও। বাবা ওটা দিয়ে দাড়ি কামান। অন্য কোনো কাজে লাগে না, বিশ্বাস করুন। না, এসব চোরাই চালানের নয়, স্মাগলিঙেরও নয়।

কালো টাকা?

হে বৃহৎ, হে প্রকাণ্ড, টেবিলের টানায় রাখা ওই সাঁইত্রিশ টাকা ষাট পয়সার কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? না ধর্মাবতার, ওটা কালো টাকা নয়, বরং ভীষণ রকমের সাদা টাকা। এত সাদা যে ওকে রক্তহীন ফ্যাকাসে টাকাও বলা যায়। মাসের আরও ছ-দিন বাকি মহাত্মন, ও টাকার আয়ু আর কতক্ষণ? সেই অন্তিম মুহূর্তের ভয়ে ওরা ফ্যাকাসে হয়ে আছে দেখছেন না?

ঘট? আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর মধ্যে আমার স্ত্রী খুচরো পয়সা জমান। ভাঙুন ইনস্পেকটর, ভাঙুন। আমার স্ত্রী কোনোদিন আমাকে তার মাটির ঘট ছুঁতে দেয় না। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো চালাকি চলবে না। হে সর্বশক্তিমান, আপনি ঘটটা ভেঙে দেখুন তো কত জমিয়েছে আমার বউ!

না, না, আপনাকে কষ্ট করে ওই দুই তিন নয়া পয়সার খুচরো গুনতে হবে না। আন্দাজ করছি দু-তিন টাকার বেশি নেই। তা এই দু-তিন টাকার মধ্যে একটা কালো টাকার ছায়া আছে। এটা প্রায় চুরির টাকা। ওটা আপনি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

এই নিন লোহার আলমারির চাবি। হা-হা মশাই, আলমারিটা আমার কিনা জিজ্ঞেস করছেন? না মহান, এই একটিমাত্র সত্যিকারের দামি জিনিস যা আমি বিয়েতে পেয়েছিলাম। এই স্টিলের আলমারি দিতে নারাজ হয়েছিলেন আমার গরিব শ্বশুর, তার ফলে আমার বিয়ে ভেঙে যায় আর কী! হা-হা। না, অবশেষে তিনি আলমারি দিতে রাজি হয়েছিলেন, বিয়েটাও হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এই আমার আর আমার স্ত্রীর ঘর। কী দেখছেন শ্রদ্ধাস্পদ? প্লিজ, প্লিজ, ওই বাঁশের চ্যাঙাড়িটা দেখবেন না। দোহাই আপনার, আমাদের মতো সামান্য মানুষেরও কিছু গুপ্ত জিনিস থাকে। বিপজ্জনক নয় মহাত্মন, লজ্জাজনক। পায়ে পড়ি, দেখবেন না।

লজ্জা ইনস্পেকটর, কি লজ্জা। ওই বাঁশের চ্যাঙাড়ির মধ্যে থাকে কনট্রাসেপটিভ। শ্রদ্ধাস্পদ, আমি আর আমার স্ত্রী যে উপগত হই—এটা কি লজ্জাজনক নয়? সবাই জানে, তবু কী লজ্জার! কেন দেখলেন ইনস্পেকটর? কেন দেখলেন? লজ্জায় আমি যে চোখ তুলতে পারছি না। ক্ষমা করুন মহাত্মন, আমাদের এই গোপনীয়তাটুকুর জন্য। আপনি তো ঈশ্বরের সমতুল, আমরা মানুষ মাত্র। জানি, আপনি এটুকু ক্ষমা করবেন। গরিবের অপরাধ।

আসছি ইনস্পেকটর, এক মিনিট। না, না আমি স্ত্রীর সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্র করছি না। আমি তাকে বলছি, সে আপনার জন্য একটু চা করুক। করার দরকার নেই? যেমন আপনার আদেশ।

আলমারিতে সোনা পেয়েছেন ইনস্পেকটর? আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ, ওগুলো সোনার গয়নাই বটে। মোট পাঁচ ভরি। হার, দুল, আংটি, বোতাম মিলে মোট পাঁচ ভরি। এ ছাড়া আরও কয়েক ভরি আছে মায়ের বাক্সে, সেসব মায়ের গয়না। আমাদের বাড়িতে মোট প্রায় দশ ভরি সোনার জিনিস আছে। হ্যাঁ ইনস্পেকটর, আমি অপরাধী। জানি মহাত্মন, ভারতবর্ষের শতকরা সত্তর ভাগ লোকেরই ঘরে দশ ভরি সোনা নেই। আমি সেই দুর্লভ শতকরা ত্রিশজনের একজন, যার ঘরে দশ ভরি—হ্যাঁ মহাত্মন—দশ ভরি সোনা আছে। বাজেয়াপ্ত করবেন ইনস্পেকটর? না? ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

আমার স্ত্রীকে দেখছেন ইনস্পেকটর? দেখুন, দেখুন। ওকে বহুকাল কেউ দেখে না। চেহারা এমনিতেও দেখনসই ছিল না, এখন আরও ভেঙে গেছে। না, বয়স খুব বেশি নয়। তবু ওইরকম। বহুকাল পরে আপনিই এক পরপুরুষ যিনি ওকে লক্ষ করছেন। ও বড়ো ভয় পেয়েছে, কাঁপছে। এমনিতে খুব কুঁদুলী, আমার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো চালাকি নয়। আপনি যে মহান, শক্তিমান, ভয়ংকর। আপনার সামনে আমরা আমাদের অস্তিত্ব কার্পেটের মতো পেতে দিয়েছি ধূলায়।

ইনস্পেকটর, সাবধান! আমার এক বছর বয়সের ছেলের ঘুম ভেঙেছে। ওই প্রচণ্ড হামা দিয়ে আসছে আপনার দিকে। কী সাহস! আপনার ভয়ংকর স্তম্ভের মতো জানু ধরে ওই উঠে দাঁড়াল। ইনস্পেকটর, ও যে আপনার কোমরের খাপে ভরা রিভলভারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে! ক্ষমা করুন ইনস্পেকটর, ক্ষমা করুন। এ সাহস ওকে মানায় না। ন্যালা-ভোলা ছেলে। ক্ষমা করুন।

করেছেন? বাঁচা গেল।

না শ্রদ্ধাস্পদ, ওই চিঠির বান্ডিলটা কোনো গুপ্ত কাগজপত্র নয়। তবে গোপনীয় বটে। বাচ্চা হতে আমার স্ত্রী কিছুকাল বাপের বাড়ি গিয়েছিল। তখন লিখেছিল। দেখবেন হা-হা। দেখুন, আপনার কাছে লজ্জা কী? না দাদা, না। চিঠিতে যা লেখা আছে তা হল আবেগের কথা, বিশ্বাসের কথা, কিন্তু সত্যিই কি তাই? যেমন ধরুন এই লাইনটা—তোমাকেই যেন জন্ম-জন্মান্তরে স্বামী পাই—এ কথাটা কি সত্যি হতে পারে? পাগল! আমি তো ভেবেই পাই না, আমার মতো এত সাদামাটা অসফল লোককে আমার স্ত্রী বার বার কেন স্বামী হিসেবে চাইবে! এ তো যুক্তিতে আসে না শ্রদ্ধাস্পদ! ও সবই বানানো কথা। বলতে হয় বলে বলা, লিখবার রেওয়াজ আছে বলে লেখা। তবে, আমি মাঝে মাঝে বের করে পড়ি। বেশ লাগে। মনে হয়, সত্যিই বুঝি!

হ্যাঁ, এই যুবতি মেয়েটাই আমার বোন। না, সুন্দরী নয়। কোত্থেকে সুন্দরী হবে? সুন্দরের ঘরেই সুন্দর জন্মায়। আমরা অতি সাধারণ। তাই ও সুন্দরী নয় বটে। তবে যুবতি। ইচ্ছে হলে আপন একটু তাকিয়ে থাকুন

ওর দিকে। ও ধন্য হোক।

কিছু কি পেলেন শ্রদ্ধাস্পদ? আপনার ভ্রূ কোঁচকানো, মুখশ্রী গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত। কিন্তু কী পেলেন মহান? ওই তো ভাঙা ঘটের মাটির চাড়া ছড়িয়ে আছে খুচরো পয়সার সঙ্গে। ওই পড়ে আছে ফুল, জল আর ফুলদানি। বিছানো ওলটানো বলে, বাক্স আলমারি খোলা বলে আমাদের সব ঢেকে রাখা ছেঁড়া আর ময়লা বেরিয়ে পড়েছে। প্রকট হয়েছে আমাদের তুচ্ছতা। তবু বলুন, কী পেলেন অবশেষে? কোন জিনিস বাজেয়াপ্ত করবেন ইনস্পেকটর?

আমার বুড়ো মা-বাবার ঘোলা চোখের মধ্যে তাকিয়ে কী খুঁজছেন আপনি? কী আছে ওখানে? কী খুঁজছেন আমার স্ত্রী আর বোনের চোখে? ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে? আমার ছেলের চোখেই বা কী আছে শ্রদ্ধাস্পদ? আমার চোখেও? বলুন, ইনস্পেকটর। বলুন!

আপনি ঘন শ্বাস ফেলে আপন মনে বললেন—পেয়েছি। শুনে আমার বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো ফাঁকা হয়ে গেল। দোহাই, আমাকে আর রহস্যের মধ্যে রাখবেন না।

পেয়েছেন? ও হরি, ও তো সকলেরই থাকে শ্রদ্ধাস্পদ! আপনি পেয়েছেন আমাদের চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা। শ্রদ্ধাস্পদ, আমাদের যে আর কিছু নেই। এ সবই অবশ্য অবান্তর, বাজে জিনিস। এ সব তো বাজেয়াপ্ত করার উপযুক্তও নয়।

ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর, হে শ্রদ্ধাস্পদ, সর্বশক্তিমান, আমাদের এটুকু কেড়ে নেবেন না। আমাদের আর সব নিয়ে যান, বাজেয়াপ্ত করুন। আমাদের ভিখারির পোশাকে বের করে দিন রাস্তায়! দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ওটুকু বাজেয়াপ্ত করবেন না। ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর...

হাওয়া-বন্দুক

দিন যায়। থাকে কথা।

মণিকার দিন যায়। কিন্তু কী ভাবে যায় কেউ তা জানে? তার সুখের ধারণাও খুব বড়ো নয়, দুঃখের ধারণাও নয় বড়ো। ছোটো সুখ, ছোটো দুখে দিন তার কেটে যেত। বুকের মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ন্ত একটুখানি সুখ, বা ছোট্ট কাঁটার মতো একটু দুঃখ—এ তো থাকবেই। নইলে বেঁচে যে আছে তা বুঝবে কেমন করে মণিকা! কিন্তু সুখদুঃখের সেই ছোটো ধারণা ভেঙে, দুয়ার খুলে বিশাল পুরুষের মতো অচেনা দুঃখ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন লুঠেরার মতো দাবি করে সর্বস্ব, তখন সেই দুঃখ আকাশ বা সমুদ্রের মতো ভুবন-ব্যাপ্ত বিশালতার ধারণা নিয়ে আসে। মণিকার দুর্বল মাথায় তা যেন ধরে না।

গড়ের মাঠে শীতের মেলায় তারা হেঁটেছিল দুজনে। তখন টুকুন ছিল না। সঞ্জয়ের সঙ্গে তখনও তার বিয়ে হয়নি। চুরি-করা দুর্লভ বিকেলে তারা ওইরকম বেরোতে পারত। সঞ্জয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসত, মণিকা পালাত কলেজ থেকে। একদিন তেমনি তারা গিয়েছিল শীতের মেলায়। মেলায় ছিল রঙিন আলো, সজ্জিত মানুষের ভিড়—নাগরদোলা, লক্ষ্যভেদের দোকান। ছিল ধুলো, শীতের বাতাস আর ছিল রোমহর্ষ। বিষণ্ণতা কোথাও ছিল না।

লক্ষ্যভেদের দোকানে চক্রাকারে সাজানো বেলুন, ঝুলন্ত খেলনা, বল, দোকানি ডাকছে—

—প্রতি শট পাঁচ পয়সা, আসুন, হাতের টিপ দেখে নিন।

সঞ্জয় দাঁড়ায়।

—মণিকা, হাতের টিপ দেখি?

মণিকা—কী হবে ছাই! হাতের টিপ দেখে?

—দেখিই না, যদি অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারি।

—তাহলে কী হবে?

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে কী যেন পেয়েছিল!

—দ্রৌপদী।

—আমিও পাব মণিকাকে।

—পেয়ে তো গেছই। সবাই জানে আমাদের বিয়ে হবে।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মণিকা তোমাকে বড়ো সহজে পেয়ে গেছি আমি। ঠিক। ডুয়েল লড়তে হয়নি, যুদ্ধ করতে হয়নি, মা-বাবা বাধা দেয়নি। কিন্তু এত সহজে কিছু কি পাওয়া ভালো?

মণিকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ভালো নয়, তবে তুমি কি চাও তোমার আমার মধ্যে বাধাবিঘ্ন আসুক?

—না না তা নয়।

—তবে কি তুমি আমাকে মোটেই চাও না আমি সহজলভ্যা বলে?

—তাও নয়। তোমাকে চাই। কিছু এত সহজে নয়। সহজে কিছু পেলে মনে হয় পাওয়াটায় সম্পূর্ণ হচ্ছে না। জয়ের আনন্দই আলাদা।

মণিকা হাসল, বলল—তবে বরং আমি কিছুদিনের জন্য অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে যাই! কিংবা চলে যাই দু-বছরের জন্য দিল্লির মাসির বাড়িতে, বি.এ. পরীক্ষাটা না হয় ওখানেই দেব। নইলে চলো, ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকি। তুমি অনেক ঝামেলা-টামেলা করে আমাকে ফের বাঁচিয়ে তোলো। তাতে বেশ দুর্লভ হয়ে উঠি আমি।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলে—না, না, অতটা করার কিছু নেই। বরং ওই টারগেটের দোকানে চলো। একটা বেলুন দেখিয়ে দাও। আমি ফাটাব।

—ফাটালে কী হবে?

—তোমাকে জয় করা হবে।

—না পারলে?

—জয় করা হবে না।

—তাহলে আমাদের বিয়েও হবে না?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল—না।

—বাবা, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সবকিছু সহজে পেতে ভালোবাসি।

সঞ্জয় তার হাতখানা ধরল। বলল—মণিকা।

—উঁ।

—ওই যে মাঝখানের হলুদ রঙের বেলুনটা, ওটাকে ফাটাব। তিন চান্সে।

—যদি না পারো?

—না পারলে—

কথা শেষ করে না সঞ্জয়।

—না পারলে?

—বিয়ে হবে না।

মণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, শোনো।

—কী?

—তুমি ইয়ার্কি করছ?

—না।

—সিরিয়াস?

—ভীষণ!

মণিকা শ্বাস ছেড়ে বলে,—তুমি ভীষণ জেদি। পুরুষমানুষের জেদ থাকা ভালো, কিন্তু যার উপর আমাদের মরণ-বাঁচন তা নিয়ে তোমার খেলা কেন?

সঞ্জয় কাতর স্বরে বলে,—মণিকা, আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন থেকেই তোমার আমার ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে বড়ো হয়েছি। বড়ো হতে হতেই জেনে গেছি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কত সহজ ব্যাপারটা বলো তো! কোনো রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই; প্রতিযোগিতা নেই। এ কেমন পাওয়া! আজকের দিনটাই একটু ক্ষণের জন্য এসো একটু দুর্লভ হই। কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তা খেলা করুক আমাদের সম্পর্কের মধ্যে।

মণিকার বড়ো অভিমান হয়েছিল মনে মনে। সে কি বাজিকরের দোকানের জিনিসের মতো হয়ে গেছে? সে কি লটারির পুরস্কার? তাদের এতদিনকার সম্পর্ক একটা হলুদ বেলুনের আয়ুর ওপর নির্ভর করবে অবশেষে? ছোট্ট একটু দুঃখ কাঁটার মতো ফুটল বুকে। ছোট্ট কাঁটা, কিন্তু তার মুখে বড়ো বিষ, বড়ো জ্বালা। মণিকার চোখভরে জলও কি আসে নি? এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে সে সেই জলটুকু মুছে ছিল গোপনে। বলল—শোনো, আমি লটারির প্রাইজ নই। আমি তোমাকে পেতে চেয়েছি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তোমাকে যে ভালোবাসি সে আমার পুজো। আমি কেন নিজেকে অত হালকা হতে দেব? তুমি চলো, ওই দোকানে যেয়ো না। ও খেলা ভালো নয়।

কিন্তু সঞ্জয় বড়ো জেদি, ওই জেদই তাকে পুরুষ করেছে! ও জেদই মণিকাকে মুগ্ধ করেছে কত বার। সঞ্জয় মাথা নাড়ল। মুখে হাসি নিয়ে বলল—শোনো মণিকা, বেলুনটা আমি ঠিক ফাটাব।

—এসব নিয়ে খেলা কোরো না। চলে এসো।

—না, প্লিজ, তিনটে চান্স দাও।

মণিকা একটা শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে করে বলল, কিন্তু মনে রেখো, যদি না পারো এ বিয়ে হবে না।

—আমিও তো তাই বলছি!

মণিকার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। গলা ধরে যায় আবেগে। সঞ্জয়ের কাছে তার অস্তিত্ব কি এতই পলকা! যদি ও না পারে তবে সে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে! এই সামান্য খেলায় সারা জীবনের এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে তারা? মণিকা ইচ্ছে করলে সঞ্জয়কে টেনে আনতে পারত জোর করে, কিংবা কেঁদে-কেটে বায়না করে নিবৃত্ত করতে পারত, যেমন সে অন্য সময় করে। কিন্তু ওই সর্বনাশা মুহূর্তে হঠাৎ এক অহংকার-অভিমান-জেদ চেপে ধরল মণিকাকেও। তার জলভরা চোখ থেকে বিদ্যুৎ বর্ষিত হল। কান্নাটা চেপে রেখে সে বলল—বেশ।

দোকানি বন্দুক ভরে এগিয়ে দিল। সঞ্জয় বন্দুক তুলে একবার মণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল—মাঝখানের ওই হলুদ বেলুনটা। বুঝলে লক্ষ করো।

—করছি। গম্ভীরভাবে বলে মণিকা।

সঞ্জয় কাঁধ পর্যন্ত বন্দুক তোলে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য স্থির করতে থাকে। মণিকার একবার ইচ্ছে হয়, বন্দুকটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে তৃষিত চোখে চেয়ে দেখছিল, সঞ্জয়ের দীর্ঘকায়, সুন্দর দেহটি। ধারালো মুখ। অবিন্যস্ত চুল নেমে এসেছে কপালে। ওই পুরুষ, আবাল্য পরিচিত মানুষটি একটু ভুলের জন্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে জীবন থেকে! এ কী ছেলেমানুষি!

ট্রিগার টিপল সঞ্জয়। শব্দটা ছড়াক করে মণিকার বুকে এসে ধাক্কা মারল। নড়িয়ে দিল তার দুর্বল হৃৎপিণ্ড। দেয়াল ঘড়ির দোলকের মতো বুক দুলতে থাকে। সঞ্জয় পারেনি। হ্যাঁ এবং না—এর ভিতরে, আলো আর অন্ধকারের ভিতরে, সুখ ও দুঃখের ভিতরে টিক-টিক-টিক-টিক করে যাওয়া-আসা করে তার বুকের দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলাম। সে শুধু ফিসফিস করে বলে—আর মাত্র দুটো চান্স। দ্যাখো, সাবধান।

সঞ্জয়ের মুখের হাসি মুছে গেছে। ভ্রূ কোঁচকানো। সে আবার বন্দুক নেয় দোকানির কাছ থেকে। তোলে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু মণিকা লক্ষ করে, ওর হাত কাঁপছে! বড়ো মায়া হয় মণিকার। সে বুঝল, এবারেও সঞ্জয় পারবে না, দু-চোখ ভরে আবার জল এল তার। ভাঙা কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন অদ্ভুত দেখায় চারধারকে, তেমনি চোখের জলের ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল, রঙিন আলোর সুন্দর মেলাটি যেন ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রতিবিম্বই বলে দিচ্ছে, এ পৃথিবীর সুখ ভঙ্গুর, জীবন কত অনিশ্চিত।

সঞ্জয়ের হাওয়া-বন্দুকের শব্দ এবারও কাঁপিয়ে দিল মণিকাকে। সেই সঙ্গে যেন কেঁপে উঠল পৃথিবী, ভেঙে পড়ার আগে আর্তনাদ করে উঠল সমস্ত ভুবন। দ্রুত দোল খেতে লাগল। বুকের দোলকটি, যেন বা খসে পড়ার আগে সে তার শেষ দোলায় দুলছে। এবারও লাগেনি।

সঞ্জয়ের মুখে রক্ত এসে জমা হয়েছে। ফেটে পড়ছে ভয়ংকর মুখখানা। দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উত্তেজনায়। তার ঠোঁট সাদা। দোকানি আবার বন্দুক ভরে এগিয়ে দেয়। নির্লিপ্ত গলায় বলে—এবার মারুন। ঠিক লাগবে।

—লাগবে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

দোকানদার তো ভিতরের কথা কিছু জানে না। সে তাই ভালো মানুষের মতো বলে—আসলে মনটা স্থির করাই হচ্ছে সত্যিকারের টিপ। চোখ আর হাত তো মনের গোলাম। মনটাকে স্থির করুন, ঠিক লাগবে।

সঞ্জয় বন্দুকটা শেষ বারের মতো হাতে নিল। তারপর মণিকার দিকে ফিরে চাপা গলায় ডাকল, মণিকা।

—উঁ!

—যদি না লাগে, তবে?

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানোই।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলে—জানি, ঠিক। তাই একটা কথা বলে নি যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক কবে থেকে শেষ হবে।

মণিকা ধীর গলায় বলল, আজ। এখন থেকে।

—আমরা একসঙ্গে ফিরব না?

—না।

—তুমি একা ফিরবে?

—হুঁ।

—আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে? আমার মণিকা আর থাকবে না তুমি?

—তুমিই তো ঠিক করেছ সেটা।

সঞ্জয় ম্লান একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল—মণিকা, এবারও যদি না লাগে তবে আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে যাবে। তবু তোমাকে বলিনি, আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালোবাসতাম। আর কখনও কাউকে এত ভালোবাসতে পারব না।

মণিকা রুমাল তুলে দাঁতে কামড়ে ধরল, তবু কি পারে দমকা কান্নাটাকে আটকাতে! কোনোক্রমে কেবল অসহায় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শোনো।

—কী?

—শেষ চান্সটা থাক। মেরো না।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভীষণ।

—আমিও।

—তবে ওটা থাক। সারাজীবনের জন্য বাকি থাক।

—হেরে যাব মণিকা? পালাব?

—তাতে কী? কেউ তো জানবে না।

সঞ্জয় দ্বিধায় পড়ল কি? বন্দুকটা রাখল, একটা সিগারেট ধরাল। ভ্রূ কোঁচকালো, চোয়ালের পেশি দ্রুত ওঠানামা করল। সিগারেটটা গভীরভাবে টানল সে। ধোঁয়া ছেড়ে সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মণিকার অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, কেউ জানবে না? কিন্তু তুমি তো জানবে?

—কী জানব?

—আমি যে পালালাম।

—আমি ভুলে যাব।

সঞ্জয় মৃদু হাসে। মাথা নাড়ে। —তা হয় না। আমাকে বুকের মধ্যে নিয়েও তুমি মনে মনে ঠিকই জানবে যে এ লোকটা কাপুরুষ। এ লোকটা শেষবার বন্দুক চালাতে ভয় পেয়েছিল। মণিকার চোখের জল গড়িয়ে নামল। দোকানদার অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। সামান্য বেলুন-ফাটানো টারগেটের খেলায় কান্নাকাটির কী আছে তা তো তার জানা ছিল না। রঙিন আলোর মেলায় আনন্দিত মানুষজন কেউই জানত না, মেলার মাঝখানে কী এক সর্বনাশা ঘটনা কত নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে! সঞ্জয় ধীরে বন্দুকটা তুলে নেয়। মণিকা মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাওয়া বন্দুকটা ধীরে ধীরে কাঁধের কাছে তুলে নিচ্ছিল সঞ্জয়। দিন যায়, কথা থাকে। দোকানদার বলেছিল—হাত আর চোখ হচ্ছে মনের গোলাম। মন স্থির থাকলে লক্ষ্যভেদ হয়।

মণিকা ভাবে—তবে কি মনই স্থির ছিল না সঞ্জয়ের? মণিকার প্রতি তবে কি স্থির ছিল না সঞ্জয়ের মন? তাহলে কেন বন্দুকের খেলার ওই হেলাফেলা উদাসীনতা? মণিকা দাঁতে রুমাল ছিঁড়ে ফেলল টেনে। দু-হাত

প্রাণপণে মুঠো করে তার চারধারে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের পৃথিবীকে দেখে নিল। নিষ্ঠুর, এবার চালাও ওই খেলনা-বন্দুক। ভেঙে পড়ুক মণিকার জগৎ-সংসার। সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে আজ একা ঘরে ফিরে যাবে মণিকা।

চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুন। ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটা। ফাটবে, না কি ফাটবে না? সঞ্জয় অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করে। নলের ওপর দিয়ে চেয়ে থাকে বেলুনটার দিকে। পৃথিবীর সুতোয় দুলছে। ছিঁড়বে। এক্ষুনি ছিঁড়বে।

হাওয়া-বন্দুকের শব্দ শেষবারের মতো বেজে উঠল। সঞ্জয়ের স্খলিত হাত থেকে বন্দুকটা খসে যায়। মণিকা শিউরে ওঠে। ফিরে তাকায়।

চক্রের মাঝখানে হলুদ বেলুনটা নেই। ফেটে গেছে। নরম রবার ঝুলে আছে ন্যাকড়ার মতো। দোকানদার বলল, বাঃ, এই তো পেরেছেন!

তারা দু-জনে কেউই বিশ্বাস করেনি প্রথমে যে বলুনটা সত্যিই ফেটেছে। বুঝতে সময় লাগে।

বিহ্বল গলায় সঞ্জয় ডাকে—মণিকা!

—উঁ।

—লেগেছে।

—যাঃ।

—সত্যিই। দ্যাখো।

মণিকা কাঁদে। তারপর চোখের জল মুছে হাসে। মেলাটা কেমন রঙিন আলোয় ভরা। সজ্জিত মানুষেরা কেমন হেঁটে যাচ্ছে চারদিকে। অবিরল ঘুরে যাচ্ছে নাগরদোলা। বেলুনটা ফেটেছে—সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে শীতের বাতাস চলে যায় দিগ্বিদিকে। চারধারকে ডেকে যেন সেই বাতাস বলতে থাকে—আনন্দিত হও, সুন্দর হও, সব ঠিক আছে।

তবু দিন যায়। কথা থাকে। বিয়ের পর চার বছর কেটে গেছে। তারা দুজন এখন তিনজন হয়েছে। টুকুন তিন বছরে পা দিল। সেই মেলায় পা দিল। সেই মেলার হাওয়া-বন্দুকের খেলা তাদের কি মনে পড়ে? পড়ে হয়তো, কিন্তু কেউ মুখে বলে না। সঞ্জয় সিগারেট খেত খুব। মণিকা কোনোদিন আটকাতে পারেনি। রাতবিরেতে উঠে কাশত। মণিকা ঘুম ভেঙে উঠে উদবেগের গলায় বলত—ইস। কী কাশি হয়েছে তোমার। মাগো!

সঞ্জয় কাশতে কাশতে বলে—স্মোকারস কাফ। ও কিছু নয়, বলেই আবার সিগারেট ধরাত।

—আবার সিগারেট ধরালে?

—সিগারেটের ধোঁয়া না লাগলে এ কাশি কমবে না। সিগারেট থেকেই এই কাশি হয়। সিগারেট খেলেই আবার কমে যায়।

—বিছানায় বসে খাচ্ছ, ঠিক একদিন মশারিতে আগুন লাগবে।

সঞ্জয় উদাস স্বরে বলে—লাগুক না।

—লাগুক না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। শীগগির সিগারেট নেভাও।

সঞ্জয় হাসতে থাকে, সিগারেট সরিয়ে নিয়ে বলে—আগুন লাগলে কী হবে মণিকা! সংসারটা পুড়ে যাবে। এই তো? পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাক না পুড়ে।

মণিকা শ্বাস ফেলে বলে—তুমি বড়ো পাষাণ, বুঝলে! বড়ো পাষাণ!

সঞ্জয় উত্তর দেয়—তুমি তো জানোই।

মুখে যাই বলুক মণিকা, মনে মনে জানে, একটুও নিষ্ঠুর নয় সঞ্জয়, একটুও পাষাণ নয়। বরং বেশি মায়ায় ভরা সঞ্জয়ের মন। তবু তারা সুখীই ছিল। সংসারে নানা সুখ-দুঃখ ছায়া ফেলে যায়। ছোটো ছোটো সুখ, ছোটো ছোটো দুঃখ। সে সুখ-দুঃখ কোনো সংসারে নেই। সঞ্জয় মোটামুটি ভালো একটা চাকরি করে। তিন

বছরের টুকুন সকাল আটটায় তার নার্সারি স্কুলে যায়। সারাদিন সংসারের গোছগাছ নিয়ে থাকে মণিকা। সে জানে তার স্বামী সঞ্জয় একটু উদাসীন তা হোক, তবু স্ত্রৈণ পুরুষের চেয়ে অনেক ভালো।

সংসারের হাজার কাজের মধ্যে যখন অবসর পায় মণিকা, তখন দক্ষিণের জানালার ধারে আলোয় এসে বসে। টুকুনের জামার ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে। বাপের বাড়িতে চিঠি লিখে, রেডিয়ো বাজিয়ে কখনও বা নিজেই গান গায় গুনগুন করে। সেইসব অন্যমনস্কতার সময়ে কখনো কখনো হঠাৎ মনে পড়ে দৃশ্যটা। চারধারে সেই রঙিন ভয়ংকর খেলাটা বেশ জেগে ওঠে। দূরাগত চিৎকার শুনতে পায়, এক দোকানদার ডেকে বলছে প্রতি শট পাঁচ পয়সা, আসুন হাতের টিপ দেখেন।

আর তখন, মণিকা যেন সত্যিই দেখতে পায়, সামনে চক্রাকারে সাজানো হরেক রঙের বেলুনের ঠিক মাঝখানে হলুদ বেলুনটি। সঞ্জয় হাওয়া-বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে মুমূর্ষু পৃথিবী ভেঙে পড়ার আগে কেঁপে উঠছে, মণিকার বুকে দেয়াল ঘড়ির দোলক ধাক্কা দেয়, পড়তে থাকে।

রাতে আজকাল সঞ্জয় বড়ো বেশি কাশে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে তার। মণিকা ওঠে জলের গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলে—জল খাও তো!

—দাও।

—কাল তুমি ডাক্তারের কাছে যেয়ো।

—দূর দূর! ডাক্তাররা একটা না একটা রোগ বের করেই, রোগ না থাকলেও। এ কাশি কিছু না। সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে।

—খেয়ো না, পায়ে পড়ি।

—আঃ দাও না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া কমবে না।

—রোজ তোমার এক কথা। তুমি আগে ডাক্তার দেখাও তো!

—ডাক্তাররা কিছু জানে না।

—তুমি খুব জানো।

—আমি ঠিক জানি। বরং একটা ওষুধ কিনে আনব।

মণিকা বিছানায় বসে সঞ্জয়ের চওড়া রোমশ বুকের ওপর হাত রাখে স্নেহে, এই পুরুষটিকে সে খুব চিনে গেছে। ভারী একগুঁয়ে, জেদি। তবু ভিতরে ভিতরে মেয়েদের মতোই নরম।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মণিকা বলে—নিজের ওপর তোমার একটুও নজর নেই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ওপরে আছে। এত ভালো নয়, বুঝলে? কাল থেকে সকালে আর দু-কাপ চা দেব না, দ্বিতীয় বারে, চায়ের বদলে দুধ দেব।

—ধুস।

—ওসব বললে চলবে না। খেতে হবে, আর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। সারাটা দিন তো বাসাতেই থাকো না। ঠিক যেন পেয়িং গেস্ট।

—সারাক্ষণ ঘরে থাকা যায়?

—তাহলে আমি কী করে থাকি?

—মেয়েরা পারে, সংসারে তাদের জান পোঁতা হয়ে থাকে।

—তাই নাকি! আর, তোমার জান কোথায় পোঁতা আছে শুনি! নতুন করে কারও প্রেমে পড়োনি তো?

সঞ্জয় হাসে, ইচ্ছে তো করে একটা হারেম বানিয়ে ফেলি কিন্তু এ বয়সে কে আর ফিরে তাকাবে বলো।

ফিরে তাকাবার লোকের অভাব নেই। সেদিন মনুর বিয়েতে ওর যে একদল কলেজের বন্ধু এসেছিল তাদের মধ্যে একজন শ্যামলা মতো মেয়ে হাঁ করে তোমাকে খুব দেখছিল।

—যাঃ! তোমার যত বানানো কথা।

—সত্যি বলছি, মাইরি।

—আমার গা ছুঁয়ে বলছ তো।

—ও বাবা! বলে মণিকা হাত টেনে নেয়।

—কী হল! হাতটা সরিয়ে নিলে কেন?

—তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম যে।

সঞ্জয় হাসে, গা ছুঁয়ে বলতে সাহস হচ্ছে না, তার মানে মিথ্যে কথা বলছ।

—না-গো, সত্যিই মেয়েটা দেখছিল।

—তবে গা ছুঁয়ে বলো।

—না না। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনও দিব্যি গালি না।

সঞ্জয় বলল—তাহলে বলি, তুমি যে বড়ো দর্জির দোকানে ব্লাউজ বানাতে দাও সেখানকার সুন্দরমতো সেলসম্যানটি তোমার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে—

—যাঃ, বলবে না, নোংরা কথা। বলে মণিকা।

আর সেদিন পাড়ার ছেলেরা যে চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন কেন তোমার কাছে জল খেয়ে গেল জানো?

—এই, এই, এমন মারব না ; কেবল বানাচ্ছে, চুপ করো। ওসব শুনলেও পাপ।

তারা দুজনেই খুব হাসতে থাকে। কারণ তারা জানে ওসব কথা সত্যিই নয়, কিংবা হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ভালোবাসা গভীর, গভীর।

সকালে টুকুন দুলে দুলে পড়ছে—ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শীপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার থ্রী ব্যাগস ফুল।

মণিকা রান্নাঘরে ঝিকে বকছে—রোজ তোমার আসতে বেলা হয়ে যায়। এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে ঝাঁটপাট হয়নি, সাতটা বেজে গেল, টুকুনের স্কুলের বাস আসবে এক্ষুনি, কখন কী হবে বলো তো?

ঝি উত্তর দেয়, কী করব বৌদি, বড়ো বাড়িতে বেশি মাইনে দেয়, তারা সহজে ছাড়তে চায় না। কেবল এটা করে যাও, ওটা করে যাও। তোমার বাড়ি সেরে আবার এক্ষুনি ও বাড়ি দৌড়তে হবে।

—বেশি মাইনে যখন, তখন ও বাড়ির কাজই ধরে রাখো, আমারটা ছেড়ে দাও। আমি অন্য লোক দেখে নিই, পইপই করে বলি আমার ছেলের সকালে ইস্কুল, কর্তারও অফিস নটায় একটু তাড়াতাড়ি এসো। তুমি কেবল বড়োলোকের বাড়ির বেশি মাইনের কাজ দেখাও।

[বাথরুম থেকে ক্রমান্বয়ে কাশির শব্দ আসে]

টুকুন একনাগাড়ে ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শীপ পড়ে যাচ্ছে। মণিকা ডাক দিয়ে বলে, টুকুন কেবল ওই কবিতাটা পড়লেই হবে? একটু অঙ্ক বইটা দেখা নাও। কাল অঙ্কে ব্যাড পেয়েছ।

মণিকা—বাথরুম থেকে ক্ষীণ গলায় সঞ্জয় ডাকে।

মণিকা উত্তর দেয়, কী বলছ?

—একটু শুনে যাও।

—দাঁড়াও, আমার হাত জোড়া, ডালে সম্বর দিচ্ছি।

—এসো না।

—উঃ আমি যেতে পারব না। টুকুনের টিফিন বাক্স গোছানো হয়নি, জলের বোতলে জল ভরা হয়নি। এক্ষুনি বাস এসে পড়বে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে, তারপর আবার শোনা যায়, তার কাশির শব্দ। দম বন্ধকরা সেই কাশি; তারপরই ওয়াক তুলে বমি করার শব্দ হয়।

—ওমা! কী হল! বলে মণিকা উঠে বাথরুমের বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দেয়—এই কী হয়েছে? এই—ভিতর থেকে উত্তর আসে না, কেবল বেসিনে জল পড়ে যাওয়ার শব্দ হতে থাকে।

দরজায় ধাক্কা দেয় মণিকা। এই, দরজাটা খোলো না। কী হয়েছে তোমার? বমি করছ কেন?

সঞ্জয় উত্তর দেয় না।

মণিকা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেয়—এই, কী হয়েছে? ওগো, দরজাটা, খোলো না।

মণিকা চিৎকার করে ডাকে সুধা, এই সুধা—

সুধা দৌড়ে আসে—কী হল গো বৌদি?

—দ্যাখো, তোমার দাদাবাবু দরজা খুলছে না। কী জানি কী হল, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

—শরীর খারাপ ছিল?

—হ্যাঁ, তুমি শীগগির বাড়িওয়ালাকে খবর দাও।

কিন্তু খবর দেওয়ার দরকার হয় না। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়, দরজা খুলে দেয় সঞ্জয়। তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বিমূঢ় হয়ে যায়। অত বড়ো মানুষটাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে। ঠোঁট সাদা, মুখে রক্তাভা, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে। একটা হাত বাড়িয়ে সঞ্জয় বলে—ধরো আমাকে।

মণিকা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তার মানুষটাকে। কী মস্ত শরীর, মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক স্বামীটি তার কী হল, কী হতে পারে মানুষটার?

—কী হয়েছে তোমার ওগো?

—কী জানি, কাশি এল খুব, কাশতে কাশতে বমি হয়ে গেল। আমাকে একটু শুইয়ে দাও।

...বাইরে বাসের হর্ন বাজে। টুকুন দৌড়ে আসে। মা, বাস এসে গেছে। টিফিন বাক্স আর জলের বোতল দাও।

—দিচ্ছি, দিচ্ছি বাবা।

টুকুন বাবাকে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে বাবা?

—কিছু না।

—শুয়ে আছো কেন? আজ তোমার ছুটি?

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে—ছুটি! না ছুটি নয়। তবে বোধহয় এবার ছুটি হয়ে যাবে।

—কেন বাবা?

—মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয়ে যায় বিনা কারণে। বলে সঞ্জয় হাসে। বলে, তোমাকে খ্যাপালাম। কিছু হয়নি। তুমি ইস্কুলে যাও।

—যাই বাবা, টা টা।

—টা টা।

বাইরে বাসের শব্দ হয়।

মণিকা গম্ভীরভাবে ঘরে আসে। হাতে দুধের কাপ। চামচে দিয়ে ভাসন্ত পিঁপড়ে তুলছে। কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দুধটা খেয়ে নাও।

—খেতে ইচ্ছে করছে না। এখনও বমির ভাবটা আছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

—আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

সঞ্জয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও।

—না, আর সিগারেট নয়।

—দাও না, মুখটা টক-টক লাগছে। সিগারেট খেলে বমির ভাবটা কমবে।

মণিকা বলল, না, এত বাড়াবাড়ি আমি করতে দেব না।

ওঃ বলে সঞ্জয় হতাশভাবে চেয়ে থাকে।

—শোনো, তুমি টুকুনকে কী বলছিলে?

—কী বলব?

—কিছু বলোনি? আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি।

সঞ্জয় একটু হাসে—কী শুনেছ?

—ওইটুকু ছেলেকে ওইসব কথা বলতে তোমার মায়া হল না?

—ওকি বুঝেছে নাকি?

—না-ই বা বুঝল! তুমি বললে কেন? ছুটি মানে কী তা কি আমি বুঝি না?

—কী মানে বলো তো?

—বলব না। তুমিও জানো, আমিও জানি।

—মণিকা সিগারেট দাও।

—না।

—তাহলে আবার কাশি শুরু হবে।

—হোক, সিগারেট কিছুতেই দেব না। আগে বলো কেন বলেছিলে ওই কথা।

—এমনিই।

মণিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একটা দৃশ্য মনে পড়ে। মেলার দোকানে মণিকাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকে লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে সঞ্জয়। জীবনে মণিকা কোনোদিনই ঘটনাটা ভুলতে পারবে কি? পারবে না। মনে কেবলই সংশয় খোঁচা দেয়। যাকে ভালোবাসে মানুষ তাকে কী করে একমুহূর্তের খেয়াল-খুশিতে হারজিতের খেলায় নামিয়ে আনতে পারে? তবে কি সঞ্জয় কোনোদিনই তেমন করে ভালোবাসেনি তাকে? সেই জন্যই কি এই সাজানো সুন্দর সুখের সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার বড়ো সাধ হয়েছে তার? ও টুকুনকে কেন বলল মাঝে মাঝে মানুষের ছুটি হয় বিনা কারণে। ওই ছুটির জন্য বড়ো সাধ সঞ্জয়ের?

মণিকা বিছানার একাধারে বসল। স্বামীর মাথাটা টেনে নিল বুকের ধার ঘেঁষে। চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, অমন কথা বলতে নেই, কখন স্বস্তির মুখে কথা পড়ে যায়। আর কখনও বোলো না।

—আচ্ছা।

—আমাকে ছুঁয়ে বলো, বলবে না।

সঞ্জয় হাসল, বলল, সিগারেট দাও না মণিকা।

—না।

বাইরে বাড়িওয়ালার ছেলের ডাক শোনা যায়—বৌদি।

মণিকা বলে—বোধহয় পল্টু ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল।

মণিকা বলল—আসছি পল্টু। মণিকা গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্তারবাবু ঘরে আসেন।

—কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন।

সঞ্জয়ের কাশির দমকাটা আবার আসে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—কিছু না। স্মোকারস কাফ।

—দেখি, আপনি ভালো করে শোন তো।

ডাক্তার সঞ্জয়কে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। মণিকাকে একটা টর্চ আনতে বলেন, টর্চ দিয়ে গলাটা দেখেন ভালো করে। গলার বাইরের দিকে কয়েকটা জায়গা একটু ফুলে আছে। সেগুলো হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে জিজ্ঞেস করেন—এগুলো কতদিন হল হয়েছে?

—কী জানি! সঞ্জয় উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবুর মুখটা ক্রমে গম্ভীর হয়ে আসে। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে ওঠেন। মণিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে আসে।

—ডাক্তারবাবু!

—বলুন।

—কীরকম দেখলেন?

—তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। ওষুধগুলো দিন। দেখা যাক।

হঠাৎ এক অনিশ্চয়তা, এক ভয় চেপে ধরে মণিকার বুক। ভগবান, ডাক্তার কেন বুঝতে পারছে না?

কয়েকদিন কেটে যায়। ওষুধে তেমন কোনো কাজ হয় না। কাশিটা যেমনকে তেমন থেকে যায় সঞ্জয়ের। কিছু খেতে পারে না, ওয়াক তুলে বমি করে ফেলে। শরীরটা জীর্ণ দেখায়। মস্ত চুলভরতি মাথাটা বালিশে ফেলে রেখে পায়ের দিকের জানালাটা দিয়ে উদাসভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কেবল চেয়ে থাকে।

মণিকা ডাকে—শুনছ?

—উঁ।

—একটু হাঁটাচলা করো। শুয়ে থাকো বলেই তোমার খিদে পায় না।

—একটা সিগারেট দেবে মণিকা?

—না।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ!

মণিকার চোখে জল আসে, বলে—কোনোদিন তো বারণ করিনি জোর করে। অসুখ হল কেন বলো। ভালো হও তারপর খেয়ো।

—যদি ভালো না হই?

—ফের ওই কথা? তুমি বলেছিলে না যে আর বলবে না।

সঞ্জয় শ্বাস ফেলে, চুপ করে থাকে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। একদিন চিন্তিতমুখে ডাক্তার মণিকাকে আড়ালে ডেকে বলে—গলার ঘা-টা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। বরং ডাক্তার বসুকে একবার দেখান।

—আপনার কী মনে হয়।

—কিছু বলা মুশকিল। দীর্ঘস্থায়ী কোনো ঘা দেখলে অন্যরকম একটা সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হয়তো তেমন কিছুই নয়। তবু দেখালে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে মণিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তারের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে তার দেরি হয় না। ডাক্তাররা সহজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন না, সুতরাং—

সুতরাং মণিকা বুঝতে পারে, এতকাল ছোটো সুখ, ছোটো দুঃখের সঙ্গেই ছিল তার ভাব-ভালোবাসা। এখন হঠাৎ সদর দুয়ার গেছে যে খুলে, অচেনা, বিশাল পুরুষের মতো এক বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। লুবিয়ার মতো, মণিকার ছোটো মাথা তা বইতে পারে না। এ যে আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এ যেন সমুদ্রের মতো সীমাহীন, এ দুঃখ দাবি করে সর্বস্ব সমগ্র ভুবন কেড়ে নেয়।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে টুকুন। ভাত খেয়ে আলাদা বিছানায় ঘুমুচ্ছে। বড়ো ঘাম হয় ছেলেটার। একটা মাত্র পাতলা জামা গায়ে, তবু জলধারায় ভেসে যাচ্ছে গলা বুক। কপালে মুক্তাবিন্দু, মণিকা নীচু হয়ে টুকুনের মুখ দেখে। সবাই বলে ওর শরীরের গঠন আর চোখ দু-খানা সঞ্জয়ের মতো। নিবিড় পিপাসায় দেখে মুখখানি, মণিকা ফিসফিস করে ডাকে।

—টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওঠ টুকুন।

টুকুন উত্তর দেয় না।

—ওরে টুকুন বেলা গেল। ওঠ।

টুকুনের উত্তর নেই। নিঃসাড়ে ঘুমোয় সে। নিশ্চিন্তে।

টুকুন ওঠরে, আয় দুজনে মিলে একটু কাঁদি। ডাক্তার বাসুর চেম্বারে ফোন করল মণিকা, পোস্ট অফিসে গিয়ে।

—ডক্টর বাসুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—উনি দিল্লিতে আছেন।

—কবে ফিরবেন?

—কনফারেন্সে গেছেন। কাল কী পরশু ফেরার কথা।

—আমার যে ভীষণ দরকার।

—কী দরকার বলুন।

—দয়া করে বলবেন, ডাক্তার বাসু কীসের স্পেশালিস্ট।

ও পাশে লোকটা বোধহয় একটু হাসল, বলল : ক্যানসার।

—আমি কাল আবার ফোন করব। কোন সময়ে আসার কথা?

—সকালের ফ্লাইটে। তবে কিছু বলা যায় না, হয়তো আটকেও যেতে পারেন।

মণিকা সন্তর্পণে ফোনটি রেখে দেয়। বাসায় ফিরে দেখে সঞ্জয় শুয়ে আছে। উত্তর শিয়রে মাথা, পায়ের কাছে দক্ষিণের জানালা। শেষবেলার একটু রাঙা আলো এসে পড়ে আছে পাশে। সঞ্জয় চেয়ে আছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। অবিরল চেয়ে থাকে আজকাল। কথা বড়ো একটা বলে না। টুকুনকে আদর করে না, মণিকাকেও না।

শেষ চান্স-এ হলুদ বেলুনটা না ফাটলে কোথায় থাকত মণিকা আর কোথায়ই বা সঞ্জয়। মণিকা সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। পিপাসায় তার ঠোঁট নড়ে, তার দু-চোখ জলে ভেসে যায়। অচেনা পুরুষের মতো বড়ো দুঃখ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ার খুলে। হাতে তার হাওয়া-বন্দুক, হলুদ বেলুনের মতো ঝুলে আছে। মণিকার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবে, ভেঙে যাবে বুক।

মণিকা শব্দ করে কেঁদে ওঠে। অবাক হয়ে সঞ্জয় চোখ ঘোরায়।

—কী হয়েছে?

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

সঞ্জয় বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে, শ্বাস ফেলে বলে—কেঁদো না, আমাকে বরং এখন থেকে একটা করে সিগারেট দিয়ো রোজ।

মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—সিগারেট আর সিগারেট! সংসারে সিগারেট ছাড়া তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই?

না—মাথা নাড়ল সঞ্জয়।

—পাষাণ, তুমি পাষাণ।

মণিকা কাঁদে, সঞ্জয় চুপ করে দক্ষিণের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, টুকুন পাশের ঘরে ঘুমোয়।

অনেক কষ্টে ডাক্তার বাসুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারে মণিকা। সঞ্জয়কে নিয়ে একদিন হাজির হয় ছায়াচ্ছন্ন চেম্বারটায়। বাসু প্রবীণ ডাক্তার, বিচক্ষণ অভিজ্ঞ দুটি চোখ তুলে বললেন—কী হয়েছে? দেখি! বলে সঞ্জয়কে চেয়ারে বসালেন। আলো জ্বালালেন কয়েকটা, ঝুঁকে ওর মুখ দেখতে লাগলেন, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, হাওয়া-বন্দুক তুলেছে এক পাষাণ, দেয়াল ঘড়ি পেন্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে, বুকের ভিতরটা এক হলুদ বেলুন দাঁতে চিবিয়ে আজও রুমাল ছিঁড়ল মণিকা।

ডাক্তার বাসু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু হয়নি।

—মানে? সঞ্জয় প্রশ্ন করে।

—যা সন্দেহ করে এসেছেন আমার কাছে, তা নয়। আজকাল সকলেরই এক ক্যানসারের বাতিক, স্মোক করেন?

—করতাম।

—টনসিলটা পাকা ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে, সব মিলিয়ে একটা আলসার তৈরি হয়েছে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন।

সেরেও গেল সঞ্জয়।

একদিন বলল, শোনো মণিকা।

—কী?

—মনে আছে একবার মেলায় তোমাকে বাজি রেখে হাওয়া-বন্দুকের খেলা খেলেছিলাম?

—মনে আছে।

—সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করো।

মণিকা হাসে—তুমি কী ভাবো, শেষ চান্সে বেলুনটা না ফাটলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম?

—যেতে না?

—পাগল।

—কী করতে?

—আমি বন্দুকটা নিয়ে বেলুনটা ফাটাতাম। না পারলে সেফটিপিন ফুটিয়ে আসতাম বেলুনটায়!

—তুমি ডাকাত, বলে সঞ্জয় হাসে।

অলক্ষ্যে হাওয়া-বন্দুক নামিয়ে পরাজিত এক অচেনা পুরুষ ফিরে যায়। তার লক্ষ্যভেদ হল না। বিদীর্ণ হয়নি মণিকার হৃদয়। সব ঠিক আছে। কোনোদিন আবার সেই বন্দুকবাজ ফিরে আসবে। লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবে বার বার, একদিন লক্ষ্যভেদ করবেও সে। ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই রঙিন মেলায় আনন্দিত বাতাস বহে যাক এই কথা বলে—ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

পুরোনো চিঠি

নিশুতরাতে এসেছিল এক ডাকপিয়োন। দরজা খুলে দেখি ব্যাগ ভরতি চিঠি, হাত ভরতি চিঠির ভারে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো-সুড়ো লোকটা। জ্যোৎস্নায় ভেজা তার দাড়ি, চাঁদের গুঁড়ো লেগে আছে তার উড়োখুড়ো পিঙ্গল চুলে, জ্যোৎস্নার রস টলটল করছে তার চোখভরে। উজাড় করে সে চিঠি ঢেলে দিল আমার দুই হাতের আঁজলায়। হাত উপচে চিঠির পর চিঠি গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়, সিঁড়িতে, ছিটকে পড়ল সিঁড়ির নীচেকার ঘাসে। ব্যস্ত হয়ে চিঠিগুলো কুড়িয়ে নিতে থাকি। খুলে পড়তে গিয়ে দেখি, এসবই পুরোনো সব চিঠি, আদালতের সপিনা, জীবনবিমার প্রিমিয়ামের নোটিশ, বিয়ের আগেকার প্রেমপত্র। সুসংবাদ-দুঃসংবাদে-ভরা এসব চিঠি তো আমি কবেই পেয়েছি, তবে কোথা থেকে আবার ঘুরে এল এগুলো? শুনতে পেলাম বুড়ো পিয়নটা পাড়ার দরজায় দরজায় নিশুতরাতে কড়া নেড়ে ফিরছে, বিলি করছে পুরোনো সব চিঠি, দলিল, নোটিশ।

ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম বিছানায়। স্বপ্ন। শিয়রের জানালা দিয়ে একটু শেষরাতের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে আমার ঘুমন্ত মেয়ে আর বউয়ের মুখে। একটু চেয়ে থাকলাম মুখদুটোর দিকে।

মায়ের বুক ঘেঁষে কেমন নিবিড়ভাবে শুয়ে আছে মেয়েটা। জেগে উঠে আবার স্বপ্নে দেখা পিয়নটার কথা মনে পড়ল। চিঠির ভারে নুয়ে পড়া বুড়ো বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলছে, আর বিলি করছে তামাদি সব কাগজ, ভুলে যাওয়া সব পুরোনো চিঠি। স্বপ্নটার মানে কী?

নিঃসাড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে আসি। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখি, আকাশে স্টিমারের আলোর মতো এক গোল চাঁদ। নির্জন জ্যোৎস্নায় চোরের মতো পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে বাতাস, জানালায় উঁকি দেয় লোভী বেড়ালের চোখ। রাস্তায় চৌকিদার লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটছে।

বুকের বাঁ-ধারে একটু ব্যথা টের পাই। মনটা বিষণ্ণ। জল খেলাম, একটা আস্ত সিগারেট শেষ করলাম, তবু আর শুতে ইচ্ছে করল না। মনের মধ্যে একটু ভয় ভয় ভাব। ঘড়ি দেখলাম। তিনটে। রাত ফুরোতে ঢের দেরি। অন্ধকারে একা ভূতের মতো বসে রইলাম। রাতটা অস্বস্তির সঙ্গে কেটে গেল।

সকালে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরোই। আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মুন্নি কুকুর দেখে, বেড়াল দেখে, পাখি দেখে, থেমে থেমে হাঁটে। আমি মাঝে মাঝে এগিয়ে যাই, সে পিছনে পড়ে থাকে। তারপর দৌড়ে এসে আমাকে আবার ধরে। এত সকালে রাস্তায় লোক চলাচল থাকে না। ভারী নির্জন রাস্তা। ভোরের গন্ধটি কেমন সতেজ, আলোটি কেমন ছায়াময়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা কথা বলি।

মুন্নি বলে—আমার হাত ছেড়ে দাও বাবা, আমি তো একাই হাঁটতে পারি।

—ঠিক তো। বলে আমি হাত ছেড়ে দিই তার।

মুন্নি হাসে—তবে কেন আমার হাত ধরে থাকো রোজ? আমি কি হারিয়ে যাই?

—না না। আমি তাড়াতাড়ি বলি,—'তুমি তো হারাও না, আমিই হারিয়ে যাই মা, সেই ভয়ে হাত ধরে থাকি।'

—তুমি কি ছোট্ট?

বলি—হুঁ।

—আমার চেয়েও ছোট্ট?

—তোমার চেয়েও।

—কাল থেকে তো আমি ইস্কুলে যাব, তখন কার সঙ্গে তুমি বেড়াবে?

একটু চমকে উঠি। ঠিক। মুন্নি কাল থেকে প্রথম ইস্কুলে যাবে। কাল থেকে আমি কার সঙ্গে হাঁটব?

ম্লান হেসে বলি—একাই বেড়াব মা।

—যদি হারিয়ে যাও?

'হারিয়ে যাব?' হঠাৎ আমাকে ঘিরে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। নিজেকেই প্রশ্ন করি 'হারিয়ে যাব?'

মুন্নি পিছিয়ে পড়ে। তার জুতোয় কাঁকর ঢুকেছে। জুতো খুলে কাঁকরটা বের করছে সে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। পিছু ফিরে দেখি, শূন্য রাস্তার মাঝখানে আমার শিশু মেয়ে একা। ঝাঁকড়া চুল মুখের ওপর ফেলে উবু হয়ে জুতো পরিষ্কার করছে। দৃশ্যটা থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

নিশুতরাতে এসেছিল এক ডাকপিয়ন। আমার সারাজীবনের সব স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। বোধহয় আমার আর কোনো চিঠি আসবে না। আমি যেন ঠিক মোহনার কাছে পৌঁছানো এক নদী, যার স্রোতের আর কোনো ঢল নেই। সামনে মহাসমুদ্র।

আমি মুন্নির জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু আমার দিকে তার আর মনোযোগ নেই। সে কাককে ঢিল ছুঁড়ছে। আমি একটু হাসি, তারপর এগিয়ে যেতে থাকি। মুন্নি একা আসতে পারবে। আমি যখন থাকব না, তখনও তো মুন্নিকে একাই হাঁটতে হবে।

সূত্রসন্ধান

ছেলেবেলা থেকেই—অর্থাৎ যখন আমার বয়স ছয় কী সাত—তখন থেকেই আমার ভিতরে একরকমের অদ্ভুত অনুভূতি মাঝে মাঝে দেখা দিত। এই অনুভূতি কীরকম তা স্পষ্ট করে বোঝানো খুব শক্ত। তবে একথা বলা যায় যে, অনুভূতিটা একধরনের অবাস্তবতার। একা একা থাকলে হঠাৎ কখনও চারদিকে চেয়ে মনে হত—আমার চারদিকে যা রয়েছে—গাছপালা, কিংবা ঘরের দেয়াল, আসবাব, কিংবা মানুষ—এরা সবাই অবাস্তব, মিথ্যে। এসব জিনিসপত্র, গাছপালা এরা কোনোটাই সত্য নয়। এরকম ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মাথা গুলিয়ে উঠত। ওই চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করত, মনে হত—এই পৃথিবীতে যা আমি চোখের সামনে দেখছি তা সবই এক অদ্ভুত উদ্ভট অবাস্তব ব্যাপার, এসবের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি এই পৃথিবীর কেউ না। এই প্রত্যক্ষ বস্তুগুলি, এই আলো-অন্ধকার এই প্রিয়জন—এসবই যেন আবার চারদিকের এক মিথ্যে, অলীক আবরণ মাত্র। ভাবতে ভাবতেই আমার শরীর যেন ঊর্ধ্বদিকে উঠতে থাকত, গা শিউরোত। আমার মনে হত এক ভীষণ যন্ত্রণায় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমার মন কিছুতেই এই চিন্তা তখন আর করতে চাইত না, কিন্তু চিন্তা তখন আমাকে ছাড়তও না। বেশ কয়েকটা ঝাঁকুনি দিত আমাকে। কিছুক্ষণ আমি আমার মধ্যে থাকতাম না। এই অনুভূতি আমার শরীরে এবং মনে এত প্রকট এবং প্রবলভাবে দেখা দিত যে, আমার বিশ্বাস ছিল এটা আমার অসুখ। সাঙ্ঘাতিক ধরনের কোনো অসুখ।

অস্বীকার করা যায় না, এটা একরকমের অসুখই। অবাস্তবতার এই অনুভূতির দার্শনিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। পরবর্তীকালে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনী পড়তে গিয়ে দেখেছি, তাঁরও অনেকটা এ ধরনের অনুভূতি হত। তিনি তখন দেয়ালে বা মাটিতে হাত চেপে ধরতেন, শরীরে ব্যথা দিতেন, এবং আস্তে আস্তে সেই শারীরিক বেদনা তাঁর মানসিক ক্লেশকে উপশমিত করত। এ মুষ্টিযোগ আমার জানা ছিল না। তবে ওই অনুভূতি টের পেলেই আমি জলে-ডোবা মানুষের মতো প্রাণপণে মনের ওপর ভেসে থাকতে চাইতাম। বাস্তবিক ওই সময়ের অভিজ্ঞতা ছিল, যেন আমি এক অথৈ অনন্ত জলে ডুবে যাচ্ছি।

বছরে এরকম হত দু-বার কী তিনবার। প্রথম প্রথম অনেকদিন বাদে বাদে হত। অনেক সময়ে ছেলেমানুষি বুদ্ধিবশত আমি ইচ্ছে করেই ওই অনুভূতিটা আনতে চেষ্টা করতাম। হাতে হয়তো কোনো কাজ নেই, খেলা নেই, একা ঘরে বসে আসি, সে সময়ে হঠাৎ ভাবতাম—আচ্ছা, আমার যদি এখন ওরকম হয় তবে কী হবে। এই ভেবে আমি চারদিকে চেয়ে গাছপালা, কী দেয়াল, কী আসবাব ইত্যাদিকে অবাস্তব, অলীক ভাবতে চেষ্টা করতাম। আশ্চর্য এই যে, চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যেত, আমার শরীর হালকা হয়ে যেন ওপরে উঠে যেতে থাকত এবং মনের ভিতরে এক অথৈ কূলকিনারাহীন কালো জল আমাকে গভীরে আকর্ষণ করত। এরকমভাবে স্থায়ী হত বড়োজোর এক- আধ মিনিট। কিন্তু ওই এক-আধ মিনিট সময়েই আমার যন্ত্রণা এবং ভয় চূড়ান্ত জায়গায় উঠে যেত। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করত। আবার ঘাম দিয়ে বোধটা প্রশমিত হত। আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতা ফিরে পেতাম। শরীর এবং মন ক্লান্ত লাগত।

বয়স বাড়ে। খেলাধুলো, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সবই নিয়মানুসারে বেড়ে যায়। বাইরের ব্যস্ততা যখন নিজের মনকে অচ্ছাদন দিয়ে রাখে তখন মন দিয়ে খেলা আপনিই কমে যায়। একটু বয়স বাড়লে আমারও ওই খেলা কমে গিয়েছিল। কমলেও কিন্তু ছাড়েনি। বছরে এক-আধবার হতই। বড়ো ভয় পেতাম। মাকে গিয়ে বলতাম,—মা, আমার মাঝে মাঝে কীরকম যেন সব মনে হয়।

মা জিজ্ঞেস করত—কীরকম?

ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারতাম না। মা-ও বুঝতে পারত না, কিন্তু ভয় পেত। বলত—ওসব ভাবিস কেন! না ভাবলেই হয়।

আমি নিজের ইচ্ছায় যে সবসময়ে ভাবতাম তা নয়। আমার আজও মনে আছে যে আমি ইচ্ছে না করলেও কে যেন জোর করে আমার ভিতরে ইচ্ছেটাকে তৈরি করে দিত। ভাবতে চাইছি না, তবু আমার ভিতরকার এক অবাধ্য দুরন্ত বালক যেন জোর করে আমাকে ভাবিয়ে তুলছে।

আমার বাবার ছিল রেলের চাকরি। ফলে একজায়গায় বেশিদিন থাকা আমাদের হত না। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। সেইসব জায়গায় সর্বত্র তখন লোকালয় ছিল না। কোনো টিলার ওপরে বা নির্জন জায়গায় বাবা কোয়ার্টার বা বাংলো পেতেন। আমাদের পরিবারে লোকসংখ্যাও ছিল সামান্য। দিদি, আমি, ছোটো বোন, ভাই তখনও হয়নি। সেই সব নির্জন জায়গায় আমার বন্ধু জুটত কমই। যা-ও জুটত তারা ছিল কুলিকামিন বা বাবুর্চি বেয়ারার ছেলেরা। তারা আমার সঙ্গী হয়ে উঠত, বন্ধু হতে পারত না। ফলে মনের দিক থেকে একাকিত্ব কখনও ঘুচত না। পৃথিবীতে বন্ধুর মতো জিনিস খুব কমই আছে। যার সৎ বন্ধু থাকে তার অনেক মনের অসুখ ভালো হয়ে যায়। সেই বয়সে বন্ধুভাগ্য আমার ছিলই না। ফলে ওই মানসিক একাকিত্ব আমার ওই অসুখটাকে বাড়িয়েই তুলত। কিছু করার ছিল না। গুরুজনদের বুঝিয়ে বলতে পারতাম না বলে সেই যন্ত্রণা একা সহ্য করতে হত।

ক্রমে বড়ো হয়ে উঠতে আত্মসচেতনতা বাড়তে লাগল। খেলাধুলো করি, স্কুলে যাই, দুষ্টুমি করে বেড়াই। বাইরে থেকে দেখে স্বাভাবিক অন্য ছেলেদের মতোই লাগে আমাকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার বিশিষ্ট এক 'আমি' তৈরি হতে থাকে। সব মানুষেরই যেমন হয়। উল্লেখের বিষয় এই যে, আমার ছেলেবেলাতেই যে 'আমি' তৈরি হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল বিষণ্ণতা, অন্যমনস্কতা, চিন্তাশীলতা, একাকিত্ববোধ, নিঃসঙ্গতা। এই ধরনের ছেলেরা সাধারণত বই পড়তে ভালোবাসে। খেলাধুলো বা আমোদপ্রমোদে, লোকসঙ্গে, ভিড়ে তেমন আনন্দ পায় না। বই পড়তে পড়তে বল্গাহীন কল্পনাকে ছেড়ে দেওয়া, অবাধ চিন্তার রাজ্যে প্রিয় নির্বাসন—এর চেয়ে স্বাদু আমার কিছুই ছিল না। কাজেই অনিবার্যভাবে বাস্তবতাবোধ, কর্মপ্রিয়তা বা কোনো কাজে পটুত্ব কমে যেতে লাগল। কল্পনাবিলাসীর ভাগ্য যেরকম হয়ে থাকে। চিন্তার রাজ্যে যে রাজা-উজির, বাস্তবক্ষেত্রে সে প্রায় অপদার্থ।

খেলাধুলোয় আমার খানিকটা দখল ছিল। বলে শট মারতে ভালোই পারতাম, ক্রিকেটে ব্যাট চালানো আনাড়ির মতো ছিল না, হাইজাম্প-লংজাম্প বা দৌড়ে পটুত্ব না থাক, অভ্যাস ছিল। অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কবিতা আবৃত্তি করতাম। কিন্তু সেগুলো ছিল আমার মনের উপরিভাগের ব্যাপার। মনের গভীরতর স্তরেও বাইরের এসব দৌড়-লাফ আবৃত্তি তরঙ্গ তুলত। সেখানে ছিল এক অনপনেয় স্পর্শকাতরতা, আত্মচিন্তা, অভিমান। বাইরের জীবনের যত অকৃতিত্ব-রাগ-ক্ষোভ সব সেখানে গিয়ে বাসা বাঁধত। এবং সমস্ত আঘাতই সেখানে বারংবার কল্পনার রাজ্যের দরজার পাল্লা উন্মোচিত করে দিত। বাইরের জগতের ব্যর্থ 'আমি' সেই কল্পনার জগতে আশ্রয় পেতাম। কল্পনার জগতে বহু মানুষেরই বিচরণ—তবে তার তারতম্য আছে। নিজেকে নিয়ে যার যত চিন্তা, অস্বস্তি, আত্মমগ্নতা তার বাস্তববুদ্ধি তত কম, আঘাত সহ্য করার শক্তি সামান্যই, আত্মনির্ভরশীলতা প্রায় শূন্য। আমারও সেই বিপদ দেখা দিতে লাগল। আমি আরও বেশি করে বই আর বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলাম। হাতে যখন বই থাকত না তখন মনে কল্পনা থাকত।

যে অনুভূতির কথা বলছিলাম তার বীজ সম্ভবত নিহিত ছিল এখানেই। চারিদিকের পৃথিবী এবং ঘটনাপ্রবাহ অবগাহন না করলে মনটা কেবলই শিকড়হীন গাছের মতো নিজের চারধারে পাক খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। বাস্তবতার জ্ঞানবর্জিত মন হচ্ছে আত্মভুক। নিজের মজ্জা-মাংস-রক্ত ছাড়া সে আর খাদ্য-পানীয় পাবে কোথায়? ফলে তার দেহের পুষ্টি এবং লাবণ্য-সঞ্চার হচ্ছিল না। অল্পবয়সেই আমার মুখেচোখে বিষণ্ণতা ভর করতে লাগল।

মাঝে মাঝে কাজে অকাজে বাল্যকালের সেই অনুভূতি দেখা দেয়। সেই অনুভূতির বিস্ময়বোধ আমাকে ভীত, চঞ্চল করে তোলে। সমাধান পাই না। বাল্যকাল চলে গিয়ে কৈশোর আসছে—টের পাচ্ছি। দেহটি যষ্টির মতো সরল সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছে, রোগা হাড়সার দেহ, অন্যমনস্ক, চিন্তাশীল, রুগণ এক কিশোর। বই পড়তে ভালোবাসে, কিন্তু পড়ার বইতে তার অনীহা। অর্থাৎ যা-কিছু কাজের কাজ তার কোনোটাতেই আগ্রহ নেই।

মনে আছে আলিপুরদুয়ারে এক স্পোর্টসে নাম দিয়েছি। অঙ্ক রেস। দর্শকদের মধ্যে আমার মা-বাবা, ছোটো দুটি ভাইবোন আর দিদিও রয়েছে। তাদের জন্যই বড়ো লজ্জা করছিল আমার। দৌড় শুরু হল। কুণ্ঠাজড়ানো পায়ে দৌড়ে গিয়ে কাগজের ওপর লেখা অঙ্কে উপুড় হয়ে পড়লাম। যোগ শেষ করে সবার আগে উঠেছি, দৌড়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত ফার্স্ট, কেউ ঠেকাতে পারবে না। হঠাৎ মনে হল, কাগজে নাম লেখা হয়নি। নাম লেখা না হলে বিচারকর্তা বুঝবে কী করে যে অঙ্কটা আমিই করেছি! ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফিরে যাব? নামটা লিখে নিয়ে আসব? ভাবতে ভাবতেই আর একটা ছেলে উঠে দৌড়ে এল। দেখতে পেলাম আমার প্রথম স্থান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অথচ কাগজে নামও লেখা হয়নি। এই কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা-সংকোচের সুযোগে ছেলেটা আমাকে পিছনে ফেলে দৌড়ে গিয়ে তার কাগজ জমা দিল। তখন বোকার মতো অগত্যা আমিও গিয়ে নামহীন কাগজ জমা দিলাম। অঙ্ক রেসের নিয়ম অনুযায়ী অঙ্ক ভুল হলে ফার্স্ট হলেও ফার্স্ট হবে না। অঙ্ক ঠিক হওয়া চাই। অত প্রতিযোগীর মধ্যে আমরা যে প্রথম দুজন, তাদেরই অঙ্ক ঠিক হয়েছিল। ফার্স্ট হল সেই ছেলেটা, আমি সেকেন্ড। পরে জানতে পারলাম যে, সেই ছেলেটাও কাগজে নাম লেখেনি। কিন্তু তার বাস্তববুদ্ধি প্রখর বলে সে নাম লেখার কথা ভাবেওনি। আমি ভাবতে গিয়ে তার অনেক আগে অঙ্ক শেষ করেও পিছিয়ে পড়েছি। সেদিনই বুঝতে পারি, আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু হচ্ছে দ্বিধা। সেই অঙ্ক-রেসের শেষে মা খুব হতাশ হয়ে বলেছিলেন—সবার আগে তুই উঠেছিস দেখে ভাবলাম যাক রুনু এবার ফার্স্ট হবে। এমা মাঝরাস্তায় দেখি ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে। কী অত ভাবছিলি? বলে রাখা ভালো যে সেই রেসে সেকেন্ড প্রাইজ ছিল না।

পরবর্তীকালে বহুবার দেখেছি সবার আগে উঠেও দৌড় শেষ করতে পারছি না। পৃথিবীতে সঠিক জায়গায় নিজেকে নিয়োগ করতে হলে খানিকটা আবেগহীন দ্বিধাশূন্য নিষ্ঠুরতা দরকার। জানা দরকার বাস্তব কলাকৌশল। নিজের ভুলত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে সর্বদা নিজেকে এগিয়ে রাখার চেষ্টাই ভালো। কিন্তু তা তো হল না।

বাঙালি ছেলেদের যে ভাবপ্রবণতার কথা শোনা যায় তা মিথ্যে নয়। আমার ভিতরে এই ভাবপ্রবণতার বাড়াবাড়ি বরাবর ছিল। সহজ আবেগে উদবেলিত হই, সহজ দুঃখে কাতর হয়ে পড়ি। চোখের সামনে পুজোবাড়ির বলি দেখে ভয়ংকর মন খারাপ হয়। মনের এই ন্যাতানো স্বভাব থাকলে বড়ো হওয়ার পথে নানারকম বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয়। ভাবাবেগ জিনিসটা খারাপ নয়, অনেক আঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু ভাবাবেগের নিজস্ব কিছু আঘাত আছে তা থেকে আত্মরক্ষা করা খুব দুরূহ।

ছেলেবেলা থেকেই আমি রোগা। হিলহিলে শরীর, বারোমাস পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড—একটা-না-একটা কিছু লেগেই থাকত। বাড়িতে রেলের ডাক্তারদের আনাগোনার বিরাম ছিল না। যখন বড়ো হয়েছি তখনও সেইসব ছেলেবেলায় আমার চিকিৎসা যাঁরা করেছিলেন সেইসব ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা বলতেন—কেমন আছিস রে?

—ভালো।

—খুব ভুগিয়েছিলি ছেলেবেলায়।

মা-বাবার আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল খুব। আমার দশবছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলাম মা-বাবার একমাত্র ছেলে। আমার দু-বছরের বড়ো দিদি, আটবছরের ছোটো বোন, কাজেই দশবছর বয়স পর্যন্ত বাড়ির সবটুকু আদর আমি নিংড়ে নিতাম। বড়ো মাছ, দুধের সরটুকু, ভালো জামা-কাপড়—সবই পেতাম। সেই একমাত্র

ছেলে কীরকম হবে না হবে—বাঁচবে কী বাঁচবে না—এই নিয়ে মা-বাবার ছিল নিরন্তর ধুকপুকুনি। বাবা অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে বাসায় আনতেন, মা-ও জ্যোতিষ বা পশ্চিমা সাধু দেখলে ডেকে আনতেন। দাতাবাবা, অ্যামেরিকা-প্রবাসী রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী, ভিখিরি সাধু কত এসেছে গেছে। তাদের অনেকে আমার হাত বা কোষ্ঠী বিচার করে বলেছে—এর সন্ন্যাসের দিকে টান। একে কোনো সুন্দর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। নেপালের রাজজ্যোতিষী পরিচয় দিয়ে এক কালা জ্যোতিষি আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমাকে দেখে বলেছিলেন—এই ছেলে মাঘ মাসে মারা যাবে।

বাবা ভীষণ ঘাবড়ে বললেন—কিন্তু আমি তো কোনো পাপ করিনি।

জ্যোতিষি মাথা নেড়ে বললেন—তবু মরবেই।

—উপায়?

—উপায় আর কী? মাদুলি। বাবা আর আমি দুজনেই দুটো মাদুলি ধারণ করলাম। আমি মরলাম না।

যা বলছিলাম, আমার দশবছর বয়সের সময়ে আমার ছোটো ভাই হয়। তাতে অবশ্য আমার আদর কমেনি। রোগেভোগা ছেলে বলেই বোধহয় বরাবর সমান তালে আদর পেয়ে এসেছি। আজও পাই। আমার রোগও হত এক-একটা মারাত্মক। মাল জংশনে সেবার হল সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। ঘোর জ্বরের মধ্যে দেখছি দু-ধারে উঁচু পাহাড়। দুই পাহাড়ের গায়ে একটা দড়ি দোলনার মতো টাঙানো হয়েছে। সেই দড়িতে আমি বসে আছি। নীচে গভীর—গভীর এক খাদ। সেই খাদে পাহাড়ি নদী বয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে একইরকম আর একটা দোলনা। সেই দোলনা থেকে আমাদেরই পরিচিত এক ভদ্রলোক বন্দুক হাতে আমার দিকে গুলি ছুঁড়ছেন। গুলি গায়ে লাগছে না। দোলনাটা দুলছে। আমি দু-হাতে দোলনার দড়ি ধরে চেঁচাচ্ছি ভয়ে। এ তো স্বপ্নের দৃশ্য। ওদিকে বাস্তবে আমার জ্বর তখন একশো ছয়ের ওপর। মাথায় তীব্র রক্তস্রোত জমা হচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। মাল জংশন তখন ছোটো জঙ্গলে জায়গা। ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধ কিছু পাওয়া দুষ্কর। রেলের ডাক্তার বক্কর খান সুচিকিৎসক নন। তাঁর ওপর কারও ভরসা নেই। ভাগ্যক্রমে বাবা বাসায় ছিলেন। বক্কর খানকে সময়মতোই খবর দেওয়া হল। তিনি যখন এসে পৌঁছলেন তখন আমার খিঁচুনি উঠে গেছে। বক্কর খান অন্য রোগের চিকিৎসা জানুন বা না জানুন, ম্যালেরিয়াটা খুব ভালো চিনতেন। আমার অবস্থা দেখেই কোন ধরনের ম্যালেরিয়া তা বুঝতে পেরেই চিকিৎসা শুরু করেন। আমি মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা দূরত্ব থেকে ফিরে আসি।

এইরকম রোগে ভুগে ভুগে আমার শরীর যেমন নষ্ট হয়েছিল, তেমনই নষ্ট হয়েছিল আমার মন। মনের জোর কাকে বলে তা জানতামই না। অল্পে ভয় পাওয়া, হাল ছেড়ে দেওয়া, আত্মবিশ্বাসের অভাব—আমি এগুলোই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এসব নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। বাস্তবে অপদার্থ বলেই বোধহয় মনটা দিন দিন অবাস্তব কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। আমার বাস্তবের অপদার্থতা কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করতাম। কল্পনার রাজত্বে আমি ছিলাম বীর, সাহসী, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক মানুষ। কল্পনায় বাস করার বিপদ হচ্ছে এই, কল্পনার বাইরের এই বাস্তবজীবনে সামান্যতম দুঃখ-বেদনা-অপমান সহ্য করার মতো, ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মতো জোর অবশিষ্ট থাকে না। কল্পনাপ্রবণ মানুষ তাই দিশেহারা হয়ে যায় সামান্য বিপদ বা দুঃখে। কিছু ঘটলেই তার মনে ঝড় ওঠে এবং দীর্ঘকাল সেই ঝড়ের প্রতিক্রিয়া থেকে যায়।

স্কুলে পড়ার সময়ে আমাকে ঘর ছেড়ে অচেনা ছেলেদের মধ্যে যেতে হল। সেখানে এল মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন। হুল্লোড়বাজ ছেলেরা খ্যাপায়, পিছনে লাগে, অশ্লীল কথা বলে, ঝগড়া করে, গাল দেয়। মাস্টারমশাইরা নিষ্ঠুর। মারকুটে, স্নেহহীন এই পরিবেশে মন অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার নামে গায়ে জ্বর আসে। টিফিনে চাকর খাবার নিয়ে যায় দেখে ছেলেরা খ্যাপায়। আমার খেতে লজ্জা করে। স্কুলে যাওয়ার পথে রেলগাড়ির শান্টিং দেখে সময় নষ্ট করি। দেরি হয়ে যায়, বাড়িতে ফিরে এসে মাকে বলি—স্কুল বসে গেছে। ঢুকতে দিল না।

ঢুকতে দিচ্ছে না, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। প্রচণ্ড এক প্রতিযোগিতার জগতে আমি ঢুকতে পারছি না। ঢুকতে না পাওয়ার সেই প্রথম বোধ। ঠিকই টের পেয়েছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বীময় এক অদ্ভুত রূঢ় জীবন সামনে পড়ে রয়েছে।

আমার জীবন এইভাবে শুরু হয়েছিল, ভয়ে, বিষণ্ণতায়, অনিশ্চয়তার সঙ্গে।

ক্রমে অবশ্য পৃথিবীকে সয়ে নিচ্ছিলাম। কিন্তু জানতাম, সম্মুখস্থ যুদ্ধে আমার নিশ্চিত হার, হারতে হারতেই বেঁচে থাকতে হবে, পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের কোনো গভীরতা থাকবে না।

যখন আমরা আমিনগাঁওতে থাকি তখন আমাদের বাসাটি ছিল ঠিক ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটা টিলার ওপরে। খাড়া টিলা, তার নীচে ব্রহ্মপুত্র বাঁক নিয়েছে। ওপাশে নীলপর্বত, দুই পাহাড়ের মাঝখানে ব্রহ্মপুত্র সফেন গর্জন করে বয়ে চলে। ফেনশীর্ষ জলরাশি গম্ভীর ক্রোধের ধ্বনি বর্ষাকালে দুই পাহাড়ের মাঝখানের শূন্যতায় প্রতিধ্বনি তোলে ভয়াবহ। ফেরি যখন পেরোয় তখন তীর ঘেঁষে অনেকটা সাবধানে উজিয়ে স্রোত ধরে ভাঁটিতে গিয়ে ওপারের জেটিতে লাগে। নৌকো চলে খুব কম, বেচাল হলেই নৌকো ওলটায়। আমার বয়স সে সময়ে বছর তেরো, সেই বয়স যখন মা-বাবার ওপর বন্ধু বা প্রিয়জনের ওপর নানা তুচ্ছ কারণে রাগ বা অভিমান বুকের পাঁজরা ভেঙে উঠে আসতে চায়। মাকে খুব ভালোবাসতাম। সেই ভালোবাসার মধ্যে আবার নির্দয় প্রতিশোধের চিন্তাও থাকত। মা-র ওপর রাগ করে একদিন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে টিলা থেকে নামলাম। ইচ্ছে বাড়ি ছেড়ে পালাব, খুব দূরে কোথাও চলে যাব। অনেকবার এমন ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সাহস হয়নি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সন্ধে পেরোলেই ঠিক বাড়ি ফিরে গেছি। বরাবর, কিন্তু এবারের রাগটা একটু চড়া, কী করছি ভেবে দেখিনি।

সকালের ফেরি ছেড়ে গেছে। বর্ষার ভয়াবহ নদী মাতালের মতো টলতে টলতে যাচ্ছে। তার জলের দোলা দেখে প্রাণ গম্ভীর হয়ে যায়। তীরে কয়েকটা নৌকো বাঁধা। সকালের স্টিমার ধরতে না-পারা কিছু লোক ওপারে পাণ্ডুতে যাবে বলে জড়ো হয়েছে। আমি তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। কোথায় যেতে চাই এখনও তা স্পষ্ট নয়, যাব, চলে যাব চিরদিনের মতো এইটুকুই জানি। হয়তো সন্ন্যাসী হয়ে যাব, হয়তো হব মস্ত মানুষ। কে জানে আমার বুকে থমথমে অভিমান আছে, আছে প্রতিশোধস্পৃহা। আর কিছু নেই, তবু ওটুকুই তখনকার মতো যথেষ্ট।

আমাদের টিলাটা বেড় দিয়ে নৌকো চলল প্রথমে উজানে। অনেকটা দূর গিয়ে স্রোতে গা ছেড়ে পিছিয়ে আসবে। আসতে আসতে স্রোতকে ফাঁকি দিয়ে ওপারের ঘাটে বাঁধবে। বিপজ্জনক কৌশল। সাঁতার জানি, কিন্তু আত্মবিশ্বাস নেই, নদীর স্রোত ক্ষুরধার, একধারে বসে জল দেখছি। স্রোতের বেগ নৌকোয় ঝাঁকি দেয়, গুড়গুড় করে কাঁপায়। নৌকো ওঠে, নৌকো পড়ে। মানুষজন ছবির মতো স্থির বসে, মন চঞ্চল। মাঝিরা ঘেমে যাচ্ছে উজানে নৌকো নিতে। তাদের দাঁতে দাঁত, টান-টান দড়ির মতো হাত-পায়ে ছিঁড়ে আসা ভাব।

অনেকদূর উজানে গেলাম, টিলার ছায়ায়, তখনও আমাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। নৌকো যখন স্রোতের মুখে ছাড়ল তখন একটানে ঘুরপাক খেয়ে মাঝদরিয়ায় চলে গেছি। মাঝি হাঁকছে—সামাল! জল নৌকোর কানার সমান। অন্য ধার উঁচু হয়ে আছে। পৃথিবীটা সে-সময়ে বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। আকাশ বুকের ওপর। সেই সময়ে দিকের জ্ঞান ছিল না। বেভুল নৌকোটো যে কোনদিকে যাচ্ছে বোঝাবার চেষ্টাও করিনি। নৌকোর কানা আঁকড়ে প্রাণপণে জীবনের সঙ্গে, আয়ুর সঙ্গে লেগে আছি। সাঁতার জানি, কিন্তু আমার কোনো জ্ঞানই যে সম্পূর্ণ নয়। অভিমান ভেসে যায়, ভয়ে চেঁচিয়ে ডাকি 'মা'।

ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ অলৌকিকভাবে মাকে দেখতে পাই। নীল আকাশের গায়ে একটা টিলার কালচে সবুজ মাথা জেগে ওঠে। বাতিঘরের মতো, আমাদের বাসাটার লাল টিনের চাল দেখা যায়। বারান্দায় বাঁশের জাফরি। তার সামনে সিঁড়ির উঁচু ধাপটায় মা দাঁড়িয়ে আছে। সকালের রোদ পড়েছে চোখে। মা হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে নিবিষ্ট মনে চেয়ে আছে নদীর দিকে। বিশাল এক অথৈ পৃথিবী তার সামনে। সেই সীমাহীন পৃথিবীর কোন দিকে গেল তার অভিমানী ছেলে! মা নিবিষ্টভাবে, আকুলভাবে দেখছিল, বুক থেকে

আটকে থাকা শ্বাসের একটা পাখি বেরিয়ে গেল। নৌকো সোজা হয়ে চলতে থাকে। অভিমান ভুলে গভীর তৃষ্ণায় মা-র মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকি। দূর থেকে দূরে ক্রমে ছোটো হয়ে আসে মূর্তিটা। কিন্তু স্থির থাকে, বাতিঘরের মতো।

সেবার নিরুদ্দেশে যাওয়া হল না। ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে কামাখ্যা পাহাড়ে উঠে দুপুরের আগেই ফিরে এলাম।

বাসার বাইরে যে পার্থিব সংসার সেইটাই ছিল ভয়ের। সংসারের ভিতরে আমি মা-বাবার আদুরে ছেলে, ভাই-বোনের প্রিয় সহোদর কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে আমি কেউ না। একবার এক বুড়ো চীনে-বাদামওয়ালার কাছে একটা অচল সিকি গছানোর চেষ্টা করেছিলাম ছেলেমানুষি বুদ্ধিবশত। মনে হয়েছিল, লোকটা বোধহয় চোখে ভালো দেখে না। বাদাম নিয়ে সিকিটা দিতেই সে সেটা হাতড়ে দেখল, তারপর আমার হাত চেপে ধরে সে কী চিৎকার—এ ব্যাটা চোট্টা আমাকে সাট্টা পয়সা দিতে এসেছে। পুলিশ...পুলিশ! বাজারের এক ভিড় লোক ছুটে এল। অচেনা পৃথিবীর বিরুদ্ধতা দেখে এমন ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়েছিলাম সেদিন! আর একবার বন্ধুদের সঙ্গে হাটে গেছি। হাট থেকে চুরি করা ছিল বন্ধুদের একটা খেলা। আমি করতাম না, ভয় করত। সেবারই প্রথম সাহস করে একটা টিনের ছোট্ট বাঁশি চুরি করেছিলাম। দোকানদার লক্ষ করেনি করেছিল অন্য একটা উটকো লোক। বাঁশি নিয়ে দোকান থেকে বেশ কিছু দূর চলে গেছি, হঠাৎ সেই লোকটা এসে আমার হাত ধরল, একটিও কথা না বলে পকেট থেকে বাঁশিটা বের করে নিয়ে চলে গেল। কেউ কিছু বুঝল না, কিন্তু আমি সেই লোকটার ওই আচরণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারিনি। লজ্জায় ভিড় ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর একা একা সেই ঘটনার কথা ভেবে কতবার এবং আজও গা শিউরে ওঠে লজ্জায়, আধোঘুমে চমকে উঠি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে কাটিহারের খালাসিটোলার রাস্তায় একজন মুসলমান ছেলে আমাকে অকারণে গাল দিয়ে একটা চড় মেরেছিল। সে জানত না তার ওই চড়টা আমার আত্মার গায়ে এত দীর্ঘকাল তার হাতের ছাপ রেখে দেবে। ভুলতে পারি না, কিছুতেই সেই চূড়ান্ত গাল আর চড়টি ভুলতে পারি না। সংসারে স্নেহচ্ছায়ার বাইরে নিষ্ঠুর ও উদাসীন এই পৃথিবীটি রয়েছে। অচেনা মানুষের হৃদয়হীনতা রয়েছে, তাদের আক্রমণ আক্রোশ, নিষ্ঠুরতা আমি কী করে ঠেকাব!

এই মানসিকতা থেকেই একটা অসুস্থ বৈরাগ্য জন্ম নিয়েছিল আমার শক্তিহীনতা অনুজ্জ্বল মন, লড়াইয়ের আগেই পরাজয়ের মনোভাব আমাকে ক্রমশ সমাজ-সংসারের বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, অচেনা মানুষ নেই, অপমান নেই, যেখানে আমি তৃপ্ত-একাকী, সেই নির্জনতার দিকে টান পড়তে থাকে। এই বৈরাগ্য শক্তিমানের সন্ন্যাস নয়, দুর্বলের পলায়ন।

একবার এক সুখী বাড়িতে গেছি মা-বাবা ভাই-বোনদের সঙ্গে। বড়োলোকের বাড়ি, বিলিতি আসবাব, বৈঠকখানায় মদের বার, ছেলেমেয়েদের মুখে ইংরিজি। তারা আমাদের খুবই সমাদর করেছিল। সে বয়সে আমি ছিলাম ভীষণ রোগা। সেই রুগণতা বোধহয় সেই বাড়ির কর্তার খারাপ লেগেছিল। একটা ছেলে এত রোগা হবে কেন? তিনি তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সামনে বার বার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি খাও না? ছোটো না? খেলো না? তুমি অত রোগা কেন? সে ভারী অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। আমার রুগণতা এমনিতেই আমার মা-বাবার দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, তার ওপর ওইসব প্রশ্ন মা-বাবারও ভালো লাগছিল না। প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা ছিল অন্য ধরনের। তাতে সমবেদনা নেই, অনুকম্পাও না। বরং চাপা একটু ঘেন্না আর শ্লেষ ছিল। সে কেবল আমিই টের পাচ্ছিলাম। সূচিমুখ যন্ত্রণা। নানাকথার মাঝখানে ঘুরে-ফিরে তিনি আমাকে অপমান করতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন স্ট্রেট লাইনের ডেফিনেশন কী। পড়া ছিল, কিন্তু ঘাবড়ে যাওয়ায় সে মুহূর্তে মনে পড়েনি। বলতে পারলাম না দেখে তিনি সপরিবারে হাসলেন। আমি ঘামছি। আমার ভাইবোনেরা তখন সে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কলের গান বাজাচ্ছে, ছবির বই দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছে, কুকুরকে বল ছুঁড়ে দিয়ে খেলছে, আর আমি মায়ের কাছ ঘেঁষে কাঠ হয়ে বসে নিজের অপদার্থতার কথা ভাবছি। মনে হচ্ছিল, সমাজ-সংসার আমার জন্য নয়। পালাও পালাও! এরা সবাই তোমার শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, তোমার প্রতি এরা সবাই দয়াহীন। সংসারের বাইরে কোনো নির্জনতায় চলে যাও, সন্ন্যাসী-

বৈরাগী হয়ে যাও। বেঁচে থাকা মানেই প্রতি মুহূর্তে বৃশ্চিক দংশন, সূচিমুখ যন্ত্রণা, বেঁচে থাকা মানে আত্মায় মলিন হাতের ছাপ। সুতো ছেঁড়ো, পালাও।

অর্গান্ডির মতো পাতলা নেটের পর্দা উড়ছে বাতাসে। কলের গান বাজছে, কী সুন্দর ঠান্ডা ঘর, নরম সোফা কৌচ, মহার্ঘ আসবাব, তবু এই পরিবেশে মানুষ কত নিষ্ঠুর ও হীন হতে পারে।

মা সবচেয়ে বেশি আমার ব্যথা বোঝে। চিরকাল মায়েদের এই ক্ষমতা। মা আমাকে একটু ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলল, বাইরের বাগানটা তো সুন্দর, একটু ঘুরে-টুরে আয় না।

বেঁচে গেলাম।

সেই সুন্দর বাগানে প্রজাপতির খেলা দেখছি, আমার মনে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছে। কোথায় পালাব? কেমন করে? সংসারের বাইরে যাওয়া ছাড়া আমার যে উপায় নেই!

ভদ্রলোকের দশ বছর বয়সের মেম চেহারার মেয়েটি ছুটে আসে। ভয়ে ত্রস্ত হয়ে তার দিকে চায়। সে কাছে চলে আসে বাতাসের মতো সাবলীল, কী সুন্দর জোরালো চেহারা তার, কী সদগন্ধ তার গায়ে! চোখে বিদ্যুৎ। নতুন অপমানের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকি। অপমান বা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আমি বাইরের লোকজনের কাছ থেকে আর কিছুই আশা করতে পারি না যে!

সে বোধহয় তার ইস্কুলে নিঃসংকোচ ব্যবহার করতে শিক্ষা পেয়েছিল। এসে আমার হাতখানি ধরে বলল—চলো, ওই কোণে আমার পড়ার ঘর, সেখানে বসি। তোমার গলার স্বর খুব সুন্দর, নিশ্চয় তুমি খুব ভালো কবিতা পড়তে পারো!

সে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল আমাকে, কত বই তাদের! সে একটা ডিভানে আমার পাশে বসে রবি ঠাকুরের কবিতার বই খুলে বলল—একদম বাংলা পড়তে পারি না স্কুলে। ইংরিজি স্কুল তো, শেখায় না, অথচ কবিতা পড়তে আমি যে কী ভালোবাসি!

জড়তা কাটাতে সময় লেগেছিল, তবু ওই একটা বিষয় আমি পারতাম। ভাব ও অর্থ অনুসারী কবিতা পাঠ। পড়লাম। তার চোখে মুগ্ধতা দেখা দিল, তারপর করুণতর কবিতাগুলি পড়ার সময়ে অশ্রু। একটা বেলা কেটে গেল তার সঙ্গে।

—তুমি আমাকে শেখাবে? উঃ, কী যে পড়ো তুমি, শুনতে শুনতে যেন ভূতে পায়!

সংসারের বাইরে আর যাওয়া হয়নি। সুতো আজও ছিঁড়ি, কিন্তু কে যেন নতুন সুতোয় নতুন বঁড়শি অলক্ষে গিলিয়ে দেয়।

ঘরের পথ

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে।

কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনো কখনো রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। অশ্বত্থ চারা কাটতে কাটতে আমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভালো খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থইথই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মা-র স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মা-র আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম। আমার বাবার একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনো কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালোবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোটো ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেনি। আমি বাবার ঘোড়াকে ভালোবাসতাম। ওর গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়ত।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠপাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরিব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে চলে যেত। ফিরত সন্ধেবেলায়, কখনো কখনো রাত্রি হত। যাওয়ার সময় মা বলত, সারাদিন ঘর পাহারা দিয়ো। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিয়ো। সন্ধেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন জ্বেলে তার পাশে বসে থেকো। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝব তুমি ভালো আছো, ঘরে আছো। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারাদিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে বহু দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁ-দিকে মস্ত মাঠের ওপাশে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনও হারিয়ে যায়নি। ছবির মতো হয়ে পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসত। পাহাড়টিকে আমার বড়ো ভয়। ওই পাহাড় পেরিয়ে আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে ভাবতে আমি কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনো কখনো মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ওই পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী-নালা খাল-বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে কটা নদী কটা পাহাড় পার হতে হয় মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা-জুতো পরে একটা বাচ্চা ঘোড়ায় চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনো কখনো পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে আছে বলে। আবার কাঠ-পাতা কুড়োতে ওই পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না। অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে আগুনটা নিবল। দূরে নীল পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হল। মা আর ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মা-র খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে, শুধু আমার মা বাদে। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।'

আমার বিশ্বাস হল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, 'তার জন্য ভাবনা কী, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু-দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচলে-চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?'

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতি পাতি করে খুঁজলাম। ওরা বলল, 'খুঁজে কী করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।'

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ-পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, 'তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয়, কাঠ কুড়োবি।'

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মা-র সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মা-র সেই শক্তি আছে। অনেক বড়ো হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মা-র দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মা-ও আর ফিরল না। রইল শুধু ঘোড়াটা। সেই ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কখনও মাঠে চরতে যায়, বেশির ভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমোয়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তখন ওর ঘন, গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে নিশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে কাঁপত। ওর মুখে চোয়ালে, ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙাচোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ঠের মতো এবড়োখেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু-হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরোনো একটা বটগাছ শাখাপ্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, 'ঘোড়াতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন-আত্তি করিস!'

ঘোড়াটিকে নিয়ে ছিলাম মেতে। বাদবাকি সময়টা কাটত চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারা দিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, গুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনে পাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকত মাটিতে, কয়েকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দা-টাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠল গজিয়ে।

দিন কাটে। সন্ধে হলে পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মা-র শরীরের তাপের মতো মনে হয়। তাই কখনও ঘুম আসে শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ি কেটেছিল সে এসে একদিন বলল, 'এমনি কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। দুজনে বেশ থাকবি।'

'উঁহু। আমি রাতে স্বপ্ন দেখি বাবা ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ যেমন তোর মা মুখপুড়ি ফিরল। তা খাস কী?'

'শাকপাতা যখন যা হয়।'

বুড়ি গজগজ করে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত রোজ। ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মতো খাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, 'কী দেখছিস? কী দেখিস রোজ?'

ও বলল, 'তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন?'

'ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালোবাসি।'

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। বলল, 'ভালোবাসার আর লোক পেলি না। ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি?'

আমি ভাবলাম, যাব, একদিন যাব। পুবদিকে যাব—যে দিকে সূর্য ওঠে। একদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস। আমি বললাম, 'জানি না রে।'

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, 'ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেয়াল আর বেশিদিন থাকবে না ; ধসে পড়বে! সময় থাকতে শত্তুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'ওরা আমার মায়ের মতো। কেটে ফেললে বাসরে থেকে ডালপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শেকড় থাকে।'

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, 'তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন তুই দেয়ালচাপা হয়ে মরবি।'

আমি ভাবলাম, শেকড়গুলো গর্ত খুঁড়বে, আরও গভীর হবে। মনের দেয়ালে চিড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার বুড়ো ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির আগায় বাঁধা পুঁটলিটা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরে পাকা ধানের খেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসব একদিন। রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফাগনলালের ঘরের পাশ দিয়ে মৌরিখেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সেদিকে চেয়ে সারা দুপুর কাটল। চন্দ্রা এল না। তার পর দিনও না। চন্দ্রা এল না দেখে আমি উঠে খুঁজে-পেতে আমার পুরোনো মরচে ধরা দা-টা বের করে পাথরে শান দিতে বসলাম।

সারাটা দুপুর পাথরে মুখ ঘষে দা-টা ঝকঝক করে হেসে উঠল। ওর গায়ে আগুন ছুটল। দা-য়ে শান দিয়ে দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায় শিরায় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশি লাগল, নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলব। এমন সময় চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, 'এতদিন আসিসনি কেন?'

ও গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাকে। বলে, কোথায় যাচ্ছিস? থালা নামিয়ে রাখ আমার সামনে আর বসে বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে দে। নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাব। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত খেয়ে ফেলে।'

আমি বললাম, 'জানি। এ গল্প আমি মা-র কাছে শুনেছি। এক বুড়ি রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।'

'হ্যাঁ, শুনেছিস। তাতে কী? এমন বুঝি হয় না?'

আমি ভেবেছিলাম, বড়ো হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব। খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, তেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখে আঁচল দিয়ে। বলল, 'তুই বাঘটাকে মারবি, না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

ও বলল, 'মা দেখেছিল, তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কিনা। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল এমনি গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, 'কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।'

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা-টা হাতে নিলাম। এক এক কোপে অশ্বত্থের মোটা মোটা ডালগুলো খসে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হল, ছলাৎ-ছল করে রক্ত বসল শিরায় শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীতকালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মতো একটা ভাপ বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ গন্ধেরও তেমন ভালোমন্দ নেই। এ শুধু আমাকে মাতাল করে। আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা হল। আমার ইচ্ছে হল নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমার শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল। শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশিওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে ঝরে শেষ হয়েছে। খেতের মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থেকে বাঁশিওয়ালা এসে আমার দাওয়ায় বসল। তার গায়ে একশো রঙের একশো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনও এই বাঁশিওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, 'আমি বাঁশি বিক্রি করিনি। বাঁশির সুর বিক্রি করি।' এই বলে সে তার বাঁশিতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, 'বাঁশিতে তুমি ওটা কী সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।'

বাঁশিওয়ালা তার ঘন ভ্রূর নীচে গভীর গর্তের মতো চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখল। বলল, 'এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনো গুরু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা শুনি তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনও নোঙর-করা নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনও শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার সুর।'

সে আবার তার বাঁশিতে ফুঁ দিল। শেষে শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশির টান লাগল। কয়েকটা সুর তিরের মতো আকাশে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মতো টলতে লাগল। যেন অনেক দূর পথ! আমাদের এই মৌরি-খেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ দিয়ে পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারির আস্তানা, কত বন্দি, ঘাট মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেশ। বাঁশির সুর সেই দূর-দূরান্তের আভাস মাত্র নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মতো নরম, বিষণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সেই পথ ধরে, অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে—আসছে —আসছে।

বড়ো ক্লান্ত পথ! বড়ো দীর্ঘ পথ! আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ঘোড়াটা বুড়ো হল। বাবা আর ফিরল না।

বাঁশিওয়ালা সুর পালটে নতুন সুর ধরল। কখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে অন্ধকার করে দেয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'এর মানে কী? আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

বাঁশিওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল। আঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে কোষে জল ঢুকল। বীজধান ফুলে উঠল। বুক ফাটিয়ে শিষ বার করল আকাশে।

বাঁশিওয়ালা থামল। বলল, 'এর অর্থ যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয় আস্তে আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে আস্তে পাপড়িগুলো মেলে দেয়, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ—তেমনি করে তোমার দেহেও একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।'

এই বলে বাঁশিওয়ালা আবার তার বাঁশিতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। এক-একটি ঋতু যায়, আর একটি আসে। দুঃখকে সহ্য করো। খেতে আগুন লাগলে ফসল ভালো হয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'এর সুর তুমি কোথায় পেলে?'

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, 'আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াব।'

বাঁশিওয়ালা ফিরে বলল, 'তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়। আমি যেখানে যখন যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে ঘুড়িয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে জোব্বা বানিয়েছি। যারা সুখে আছে এ জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রং নেই, তাই বাইরে এত রঙের বাহার।'

বাঁশিওয়ালা চলতে লাগল, আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পায়ে রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না। শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশিওয়ালা আর তার সুর দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলাম, এ সুর তুমি কোথায় পেলে বাঁশিওয়ালা? আমার সারাটা দিন যেন টালমাটাল-টালমাটাল। যেন আমি বিনিমদের মাতাল। যেন আমি এক পাগল বাঁশিওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে—সে সুরে আমি সারাদিন গাই। কাঁদি। কেন বাঁশিওয়ালা আমাকে দিল সারাদিন বাজাবার এই বাঁশি? আমি যে একে ছাড়তে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝড়ে ওড়ে না। পোষা কবুতরের মতো নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু-নীচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই-উৎরাই ভেঙে বাঁশিওয়ালা চলেছে। শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার পা ফেটেছে। তবু তার চলবার শেষ নেই। সে পুব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিক থেকে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়া রেখে, যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। খেতে আগুন দিলে ফসল ভালো হয়। মাটির কোষে কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটিয়ে শিষ বের করবে আকাশে। আমি জানি বাঁশিওয়ালা আর ফিরবে না। কোনোদিন না। দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরও একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মা-র মুখ আমার মনে এল না। রোদ লেগে ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মা-র মুখটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ঢাকা দিঘির মতো সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, 'তুই যে আড়েদীঘে মতো পুরুষমানুষ হয়ে উঠলি! কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখের সামনে, টেরও পেলাম না।'

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, 'তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, চোখদুটো পেয়েছিস মা-র। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্মে লেগে যা। বসে থাকিস না। দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস, ঘর সামলে রাখিস।'

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশিওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, 'জানি রে জানি, তোর কাছে এক বাঁশিওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।' গাঁওবুড়ো তার নড়বড়ে মাথাটা দোলাল 'তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।'

চন্দ্রা এসে বলল, 'তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশির সুর কিনেছিস?''

আমি বলি, 'হুঁ।'

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বসল : 'পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর কিনেছিস, আর বাঁশি কিনিসনি? তবে তোর ঘরে রইল কী, তোর নিজের বলতে থাকল কী? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া চোখ দিয়ে দেখা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভালো না লাগলে যাকে বেচে দিয়ে আবার পয়সা পাওয়া যায়।'

এই বলে ও হাসল। বলল, 'আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব? তোরই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল। তুই কাজকর্ম করবি, না সারা দিন দাওয়ায় বসে হাঁ করে আকাশ গিলবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

'গাঁওবুড়ো বলছিল ঘরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না।'

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওর বাসন্তি রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে মৌরিখেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। খুব পাতলা বুটিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। সেই ছায়াটা একটু সময়ের জন্য ওর মুখের ওপর থাকল। বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল। ওর চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি।

আমি বাঁশির সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল। দুঃখ করে বলল, আমার ঘরে কিছুই থাকবে না। যেমন করে আমার বাবা থাকল না, মা থাকল না। গাঁয়ের জোয়ান মরদরা এসে আমায় পিঠ চাপড়ে গেল : এই তো চাই। বাঁশির সুর কিনবি, পাখির ডিম কিনবি। যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা। আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কী? দেখছিস না বুড়োগুলোর দশা, দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল। ওরা আমাদের বেহিসেবি বলে। কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব। এই শুনে আমি বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকাণ্ড মাথাটা রাখল।

কখন আমার শরীর দীঘল হয়েছে, হাত পা কোমর হয়েছে সরু, আমার চামড়ায় টান লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল। আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুশি জানাল। ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়ো-খেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, 'বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।'

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিশ্বাস ছাড়ল। ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ কোরো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড়ো হয়েছ। কবে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিয়ো না। মনে রেখো, দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না। সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

'বুড়ো, তুই আমার বাপ।' আমি বললাম, 'কোনো ভাবনা করিস না বুড়ো, আমি তোকে দেখব।'

ঘোড়াটা পুরোনো ঠান্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আমি দু-হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরোনো প্রকাণ্ড একটা বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, 'সারা দিন ঘরে বসে কী বকিস একা একা?'

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেল-তেল করছে। দু-চোখে মিটমিটে আলো। এ কেমন আলো? আমি কোনোদিন এমন আলো দেখিনি। ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম বোধহয় কোনো ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম বোধহয় কোনো ফুলের গন্ধ। এ কেমন ফুল? জানি না। কেমন তার রং? জানি না।

ও আমার হাতে টেনে বলল, 'চল, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।'

'কী জিনিস?'

ও ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল, 'সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।'

'কোথায় সেটা?'

ও হাসল, 'আছে আছে। তোর খুব কাছেই। আছে। অথচ তুই দেখিসনি।'

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ও বসল, 'এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারাদিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?'

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল, 'আমার সারাদিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়। তোর বাঁশিওয়ালা কি তোকে এ কথা বলেনি?'

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন তার গন্ধ জানি না। আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড়ো হয়ে তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু কটা বাঘকে মারব আমি? গাঁওবুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল বাঁশির সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু-হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, 'আমি তোকে কতক বুঝি কতক বুঝি না!'

ওর বুক, ছিঁড়ে-নেওয়া ফুলের বোঁটার মতো আমার কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে গেল।

ও বলল, 'একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।'

বাঁশিওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল, ঘর বলতে তোর কোনোকিছুই নেই। কোনোদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জ্বেলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না। আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে বলল, 'তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমিও যাব না। আমরা ঘর বাঁধব।'

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরও বুড়ো হয়েছে। খুটখুট করে সারাদিন ঘাস খায়, কখনও ঝিমোয়।

বাতাসে গরম হলকা ছুটল। বুড়োরা বলল, 'এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।'

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে এল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধেবেলা ও নিজেই খুটখুট করে ঘরে ফিরতে লাগল। কিন্তু একদিন ও ফিরল না। সারা সন্ধে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না। আকাশে মস্ত বড়ো চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে। কিন্তু পেটের নীচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে ঠুকঠুক করে ও ফিরল না। অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম : যখন আমি ছোটো ছিলাম তখন কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। চলতে চলতে আমি ধানখেত ছাড়িয়ে, মরা মটর শাকের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম। তারপর দিগন্ত জোড়া মাঠ। মাঠে বান-ডাকা সমুদ্রের মতো টলমল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'বুড়ো, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।'

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আমার চারধারে ঘন গাছ। আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপর আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হল কেউ যেন আছে। কাছেই—পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোনো আত্মা আমার পিছু নিয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরল, তারপর আমাকে চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম। বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধারে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম, আমি এর আগে কখনও এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনোদিন দেখিনি। জলাটা মস্ত বড়ো। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, 'বুড়ো বুড়ো।'

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, 'বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।'

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ও চিৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর টাল খেলে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ংকর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না। আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মতো ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাতধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, 'বুড়ো আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।'

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চিৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, 'বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।'

ও চিৎকার করে বারবার যেন আমাকে অভিশাপ দিল। আমি বললাম, বুড়ো, আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দেব।'

বুড়ো শুনল না। ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে এক সময় থামতে হল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'বুড়ো, তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।'

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নীচু হয়ে দেখলাম দড়ির গায়ে ছোট্ট একটা গিঁটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিনবিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলার রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।'

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার পা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ংকর জ্যোৎস্নার ভিতর ওর দুটো চোখ ঘোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বুড়ো, এই ফাঁসটা দিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।'

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। ভাবলাম—আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি তা জানি না। জানি না।

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে। কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, 'শোনো তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত বড়ো সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজি হল। লোকটি কিছু রুটি কিনে আনল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কী করে খাবে? তোমার লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশি হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে লোকটা সেই যে চলে গেল ফিরল না।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো বলল, 'তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কী কান্না! সবাইকে ডেকে ডেকে বলল, 'দেখ দেখ, চোট্টার কাণ্ড দেখ, আমাকে এক পোড়া রুটি খাইয়ে আমার রুপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো হাসল, 'যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।'

এই বলে শীত আসবার আগেই গাঁওবুড়ো মরে গেল। গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে বলল, 'জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।'

শীত আসছে শুনে বুড়োরা ভয় পেল। বলল, 'এবার ঘর ছাড়তে হবে।'

কেউ বলল, 'ঘর আর কোথায়! ওই তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে না।'

বুড়ো ঘোড়ার মতো খুট খুট করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে তাদের দেহ থেকে তাপ শুষে নিতে লাগল। বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালাল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপরে প্রাণপণে বলতে লাগল, 'কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিয়েছিল! তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারিদিকের দেয়াল নেই।'

কেউ বলল, 'অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলছিলাম কোন ভিন-গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে। তারপর অন্ধকার হল যারা ছিল সাথের সাথী তাদের মুখ দেখা যায় না, পাশে কে চলছে জানা যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সুন্দর।'

কেউ বলল, 'যাব আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে মিশব। কিন্তু দেখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে, বৃষ্টি আসবে, বাতাস ভিজবে, মাটির কোষে কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল হয়ে বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেলব, মেঘ হয়ে ভাসব।' এইসব শুনে গাঁয়ের জোয়ানগুলো হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছিল, 'বাইরে একটি আগুন জ্বেলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যেন দেখতে পাই তুমি ঘরে আছো, তুমি ভালো আছো। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যেয়ো না।'

দাইমা বলেছিল : আমার কাছে চলো। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মতো পালব।

বাঁশিওয়ালা বলেছিল : বৃষ্টির জল লেগে বীজধান ফুলবে। বুক ফাটিয়ে শিষ বের করবে আকাশে। বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল : ঘরদোর সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানা পানি দিস। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশিওয়ালা মাত্র একবার আসে।

গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল : বাঁশির সুর কিনিস না। তাহলে তোর ঘরে কিছুই থাকবে না।

আমি বলেছিলাম : বুড়ো, তুই আমার বাপ। ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।

আমি আগুন জ্বেলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম। তবু কেন যে আমার বাবা গেল বিদেশে, রোজগার করতে! আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে! আমার ঘোড়াটা গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে!

প্রিয় মধুবন

মাথা অনেক শূন্য লাগছে আজকাল। অনেক বেশি শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর। মাঝে মাঝে শুধু একটি কী দুটি শালিক কী চড়াইয়ের আনাগোনা। এরকম ভালো। এরকম থাকা ভালো। আমি জানি।

কালকেও আমার কাছে একখানা বেনামি চিঠি এসেছে। তাতে লেখা 'বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে!' লাল কালিতে লেখা চিঠি। নাম সই নেই, তবু আমি হাতের লেখা চিনি। লিখেছে কুনাল মিত্র। আমার বন্ধু। এখনও বোধহয় ফেরারি। প্রায় দশ বছর তার খোঁজ জানি না।

আমাদের ডাকঘরগুলির কাজে বড়ো হেলাফেলা। চিঠির ওপর ঠিকঠাক মোহরের ছাপ পড়েনি। আমি কাল সারাদিন আতস কাচ নিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। না, কোথা থেকে যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছে তা পড়াই গেল না। জানি যেখান থেকেই দেওয়া হোক ডাকে, কুনাল আর সেখানে নেই। সে সরে গেছে অন্য জায়গায়। রমতা যোগীর মতো ফিরছে কুনাল, কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাচ্ছে! তবু বড়ো ইচ্ছে করছিল কুনাল কোথায় আছে তা জানতে।

কাল বিকেলের দিকে আলো কমে এলে আমি আতস কাচ নামিয়ে রাখলাম। মাথা ধরে গিয়েছিল সারাদিন আতস কাচের ব্যবহারে। তাই চোখ ঢেকে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। ভুল হয়েছিল। সে তো ঠিক চোখ-ঢাকা নয়! টের পেলাম দুটি হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে নামছে চোখের জল।

বিপ্লবের পথ কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! এ আমারই কথা। কুনাল কেবল কথাটা ফিরিয়ে দিয়েছে। যেন ও কথার আড়ালে উঁকি মারছে তার সকৌতুক দয়াহীন মুখ—রাস্তা তুমিই দেখিয়েছিলে, ঘর থেকে বের করে এনেছিলে তুমিই। তারপর সরে গেছ কোথায়! এখন কার এঁটো চেটে বেড়াচ্ছ মধুবন? তোমার ঘেন্না করে না?

চমৎকার এইসব শব্দভেদী বাণ কুনালের। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই। প্রতিদিন পালটে যাচ্ছে তার ঠিকানা। আর আমি মধুবন—আমি বাঁধা পড়েছি স্থায়ী ঠিকানায়। কুনাল হয়ে গেছে ছায়া কিংবা মায়া। আমি এখন কোথায় পাব তাকে? এ চিঠির তাই জবাব দেওয়ার দায় নেই।

কাল সন্ধেবেলায় আমি ঘরের আলো জ্বালিনি। কুনালের চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে টিকটিকির বাসা। ঘর ছাড়ার কথা মনে হলেই সে ডাক দেয় টিকটিক টিকটিক। যেয়ো না। যাব না যে তা আমি জানি। তবু চোখের জলে আমার দু-হাতের আঙুল ভিজে গিয়েছিল। নিজের জন্য নয়, আমি কুনালের জন্য কেঁদেছিলাম। তারপর ফাঁকা একখানা ঘরের মতোই শূন্য হয়ে গেল মাথা। মাঝে মাঝে একটি দুটি শালিক কী চড়ুয়ের মতো ভাবনা ও স্মৃতি আনাগোনা করে গেল।

অনেকক্ষণ আমার বাইরের কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর আমার বউ সোনা আমাকে ডাকল, 'রাজা, একটু এ ঘরে এসো।'

গিয়ে দেখি সে কাপড় পালটাচ্ছে। বলল, 'দেখো, আমি তোমাকে সারাদিন একটুও জ্বালাইনি। তবু এখন জিজ্ঞাসা করছি ও চিঠিটা কার? সারাদিন তুমি ওটা নিয়ে বসে আছো।'

আমি চিঠিটা এনে তার হাতে দিলাম।

ও দেখল। তারপর অবহেলায় চিঠিটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'দেখো কী বিচ্ছিরি ব্লাউজ পরেছি। পিছন দিকে বোতাম ঘর। কিছুতেই আটকাতে পারছি না, তুমি একটু বোতাম এঁটে দাও না।'

তখন সোনার সাজ আমি লক্ষ করলাম। কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা একটা ব্লাউজ পরেছে সে, গলায় আর হাতে খুব পাতলা লেস-এর ফ্রিল দেওয়া। ব্লাউজটা আরও কয়েকদিন ওকে পরতে দেখেছি। কোনোদিনই বোতাম এঁটে দেওয়ার জন্য আমার ডাক পড়েনি। তাই মৃদু হেসে আমি ওর পিঠের দিকে বোতাম আর হুকগুলো লাগিয়ে দিলাম।

ও আস্তে করে বলল, 'ইস, কী ঠান্ডা হাত!'

'ঠান্ডা!' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কই!' বলে হাত দুটো ওর গালে রাখলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোনা বলল, 'না সে ঠান্ডা নয়! নিস্পৃহতার কথা বলছিলাম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সোনা ধীরে ধীরে আঁচল তুলে নিচ্ছিল শরীরে। হঠাৎ মুখ এগিয়ে বলল, 'আদর!'

তক্ষুনি কুনালের চিঠিটার কথা একদম ভুল হয়ে গেল।

সোনার ব্লাউজের বোতাম আর হুকগুলো আর একবার লাগিয়ে দিতে হল আমাকে।

তারপর সোনা টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে বলল, 'লাল কালিতে লেখা এই দেড় লাইনের চিঠিটা নিয়ে এখন আমরা কী করব? বাঁধিয়ে রাখব?'

হেসে বললাম, 'ঠাট্টাটা আমাকেই লাগল, সোনা। চিঠির ওকথাগুলো একদিন আমিই বলতাম। বহুদিন পর অনেক খুঁজে খুঁজে আমার কাছে ফিরে এসেছে আমারই কথা।'

ও ভ্রূ কুঁচকে চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এটা কি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য?'

'না, না!' আমি মাথা নেড়ে হেসে উঠি 'ওটা এমনিই, ঠাট্টার ছলেই আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া।'

সামান্য দ্বিধা করে সোনা বলল, 'চিঠিটার নাম-সই নেই। তবু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একে জানো। কে?'

একটু ভেবে বললাম, 'ও বোধহয় আমারই এক সত্তা। অতীত থেকে লিখে পাঠাচ্ছে।'

'কবিতা!' সোনা হেসে ফেলল, 'এ তো কবিতা হয়ে গেল, রাজা।' হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তো তোমার কাছে শুনেছিলাম যে আমি তোমার এক সত্তা। তোমার এরকম আর কটা সত্তা আছে, রাজা?'

হিংসুক। সোনা ভীষণ হিংসুক। ঘরে ওর রাজতন্ত্র। আমি ওর রাজা। ওকে এখন কিছুতেই বোঝানো যায় না যে একদিন আমি কুনালের ছিলাম প্রিয় মধুবন।

না, কুনালের প্রিয় মধুবন হওয়ার জন্য আর একবার পিছু-হাঁটার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। এখন আমি বেশ আছি। ফাঁকা, খোলামেলা শান্ত একটি ঘরের মতো শূন্য মাথা। মাঝে মাঝে এক-আধটা শালিক কী চড়ুইয়ের আনাগোনা। এক-আধটা ভাবনা, এক-আধখানা স্মৃতি। তার চেয়ে বেশি কী দরকার। এখন আমার আলো বাতাস ভালো লাগে, ছুটির দিন ভালো লাগে, অবসর আমার বড়ো প্রিয়। আমার প্রিয় সেলাই কলের আওয়াজ, আমার শিশু-ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। আর বুকের মধ্যে সেই টিকটিকির ডাক। যেয়ো না। যেয়ো না।

তবু মাঝে মাঝে যখন ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় চলি তখন হঠাৎ বড়ো দিশেহারা লাগে। কিংবা যখন মাঝরাতে হঠাৎ কখনও ঘুম ভেঙে যায় তখন লক্ষ করে দেখি পাথর হয়ে জমে আছে আমার অনেক আক্ষেপ। আয়নায় নিজের মুখ দেখে কখনও চমকে উঠি। মনে কয়েকটা কথা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কোনো অলীক শূন্য থেকে এসে পড়ে। তুমি যে এসেছিলে কেউ তা জানল না। হায়, মধুবন।

সত্য বটে এ সবই আবেগের কথা। নইলে আমার মনে স্পষ্ট কোনো আক্ষেপ নেই। না আছে পিছু হাঁটার টান খুব একটা স্মৃতিচারণও নেই আমার। মাঝে মাঝে সোনা যখন আমাদের ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়, বা বাপের বাড়িতে থেকে আসে একটি দুটি দিন, তখন কখনো-সখনো সন্ধেবেলায় বা রাত্রে আমি ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। একটি দুটি কথা অন্ধকারে মশা ওড়ার শব্দের মতো অন্ধকারে গুনগুন করে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাচ্চা ছেলেটার কান্নার শব্দ মনে মনে ডেকে আনি,

সোনার গলার স্বরের জন্য নিস্তব্ধতার কাছে কান পেতে রাখি। আস্তে আস্তে সব আবার ঠিক হয়ে যায়। যদি কখনও হঠাৎ মনে হয় যে এরকম শান্ত জীবন হওয়ার কথা ছিল না আমার, আরও দূরতর, ভিন্ন অনিশ্চয় এক জীবন আমার হতে পারত, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি হাতের কাছে যা পাই—হয়তো ওষুধের শিশি, ফাউন্টেন পেন কিংবা অন্য কিছু না পেলে হাতের আংটির পাথরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মনকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসি। অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে ফিরিয়ে নিই আমার মুখ। আস্তে আস্তে বলি, এরকমই ভালো। এরকম থাকাই আমাদের ভালো। তখন মাথা অনেক শূন্য লাগে। অনেক বেশি শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকাঘর।

অনেকদিন আগে কুনালের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হওয়ার কিছু পরে ওইরকম লাল কালিতে লেখা বেনামি আর একখানা চিঠি এসেছিল আমার সঠিক ঠিকানায়। তাতে লেখা 'জীবনে সৎ হওয়াই সব হওয়া নয়! আদর্শই সব! আদর্শ না থাকলে পুরোপুরি সৎ হওয়াও যায় না।' প্রতিটি বাক্যের পর একটি করে বিস্ময়ের চিহ্ন। আসলে ওগুলো সকথিত জিজ্ঞাসা। ছুঁচের মুখের মতো ওই চিহ্নগুলো আমাকে বিঁধেছিল। আমারই বলা কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া। সেই তার প্রথম বেনামা চিঠি। তারপর আমার বিয়ের কিছু পরে আরও একখানা। এইরকম 'বৃষ্টি হলেই মিছিল ভেঙে যাবে! দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে গাছতলায়। মাথা বাঁচাতে।' কী জানি সে গাছতলায় বলতে এক্ষেত্রে ছাদনাতলায় বুঝি য়েছিল কিনা। চিঠিটা আমি সোনাকে দেখাইনি। শুধু মনে মনে বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমার সব খবর রাখে, হদিস রাখে সঠিক ঠিকানার। সে আমাকে ভোলেনি। সামান্য ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। কী জানি, আমি তাকে আরও তো কত কী শিখিয়েছিলাম। সে যদি সব মনে রেখে থাকে। তারপর ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম যে তা নয়। এ তার আমাকে নিয়ে খেলা। আসলে পুরোনো পুতুলের মতো ভেঙে সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবন থেকে। মাঝে মাঝে সে কেবল দূর থেকে আমাকে ওইভাবে স্পর্শ করে দেখতে চায় আমি কতটা চমকে উঠি।

বলতেই হয় খেলাটা চমৎকার শিখেছে কুনাল। সে খেলতে জানে। গতকাল আমি সামান্য অন্যরকম হয়ে গেলাম। আজ সকালে তাই আমার মুখের দিকে ঘুমচোখে চেয়ে সোনা প্রথম প্রশ্ন করল, 'আজও তুমি ওই ভূতুড়ে চিঠিটার কথা ভাবছ।' চমকে উঠলাম। বস্তুত তা নয়। চিঠিটার কথা আমি ভাবছিলাম না, কুনালের কথাও না।

হেসে বললাম, 'দূর।'

সোনা হাসল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ করে ছেলের কাঁথা বিছানা গুছিয়ে রাখল, মশারি চালি করল, তারপর এক সময়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'কেন ভোরে উঠে জানলার কাছে বসে আছো। এত সকালে ওঠা বুঝি তোমার অভ্যাস।'

সে কথা ঠিক। ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস নয়। কেন যে আজ অত ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কে জানে। তারপর আর ঘুম আসছিল না। শীতকাল, তবু লেপের ওম ছেড়ে উঠে গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে এসে আমি জানালার ধারে বসলাম। খুব কুয়াশা ছিল, জানালার নীচের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল আবছায়ার নিঃশব্দে নদী বয়ে যাচ্ছে। আর দূরের কলকাতা খুব উঁচু গাছের অরণ্যের মতো জমে আছে হিমে। সিগারেট ধরাতেই একটি দুটি পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে সেগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলাম। ঠেকানো গেল না। খুব ভোরে একদিন এক আশ্রমের ঋ ত্বিককে দেখেছিলাম ডান হাতখানি ওপরে তুলে চোখ বুজে আহ্বানী উচ্চারণ করতে 'তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান পুরুষ, ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত, যদবিদা চরণে তদু পাসনাতেই ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন করো। আমরা যেন একেই অভিগমন করি...।' গান নয়, শুধু টেনে টেনে উচ্চারণ করে যাওয়া। কবেকার কথা। তবু গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা যেন একেই অভিগমন করি। ভোরের শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল—হায় মধুবন। হায়, কুনাল।

আমি আমার আংটির মদরঙের গোমেদ পাথরটার দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আবছা অন্ধকারেও পাথরটা চিকমিক করছিল। আমি আস্তে আস্তে আংটির গোমেদ পাথরটায় আমার মনকে স্থির করার চেষ্টা করছিলাম। তখন হঠাৎ—খোলা জানালা দিয়ে যেমন ঘরের মধ্যে উড়ে আসে পোকামাকড়—তেমনি হঠাৎ অনেকদিন আগে শোনা কয়েকটা শব্দ বিদ্যুৎবেগে আমার মধ্যে খেলা করে গেল। প্রথমে আমি কিছুক্ষণ ভেবেই পেলাম না এই শব্দগুলি কী, কিংবা কোথা থেকে এল চেনা শব্দ। বড়ো চেনা। কয়েকটি মুহূর্তের পর মনে পড়ে গেল, এ আমার বীজমন্ত্র নাম কৈশোরে শেখা। এতকাল বীজমন্ত্রের শব্দগুলি নিয়ে মনে মনে খেলা করতে করতে সেই কৈশোরের ধ্যান অভ্যাস করার কথা মনে পড়েছিল। একটা সাদা কালো চক্রের ছবির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতাম। তারপর চোখ বুজতেই সেই চক্রটা অমনি চলে আসত দুই ভ্রূর মাঝখানে, নাসিকার মূলে যাকে বলা হয় আজ্ঞাচক্র। অনেক শিখেছিলাম আমি। পৈতার পর আমাকে শিখতে হয়েছিল পুজো পাঠ আহ্নিক। দণ্ডীঘরে কয়েকটা কষ্টের দিন কেটেছিল, যার মধ্যে চুরি করে খেয়েছিলাম রসগোল্লা। মনে পড়ে এক শীতের খুব ভোরে দণ্ডী ভাসাতে যাচ্ছি ব্রহ্ম পুত্রে, সঙ্গে জ্ঞাতিভাই তারাপ্রসাদ। হাফপ্যান্ট পরা তারাপ্রসাদ নদীর উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। আমি তার দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ঢালু বেয়ে জলের কাছে নেমে গেলাম। আমার পায়ে লেগে একটা মাটির ঢেলা আস্তে গড়িয়ে গিয়ে টুপ করে জলে ডুবে গেল। বিবর্ণ মেটে রঙের জলে ভেসে যাচ্ছিল আমার গেরুয়া ঝোলা আর লাঠি। এককোমর জলে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম মাথার ওপর ফিকে নীল আকাশ, আর চারদিকেই মাটির নরম রং। কোথাও এতটুকু আবেগ বা অস্থিরতা নেই। সব শান্ত ও উদাসীন, আর বাতাসে মিশে থাকা সামান্য কুয়াশার মৃদু নীল আভা। জলে আমাকে ঘিরে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙার শব্দ। খুব সামান্য স্রোতে ধীরে ধীরে দুলে দুলে ভেসে যাচ্ছে গেরুয়া ঝোলা শুদ্ধআমার দণ্ডী। খুব দূরে তখনও নয়। বড়ো অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। যেন ডুবন্ত এক সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় ভেসে যাচ্ছে জলে। মনে হয়েছিল আর দু-এক পা দূরেই রয়েছে জন্ম-মৃত্যু ও জীবনরহস্যের সমাধান। আর মাত্র দু-এক পা দূরে। আমার চারিদিকে বিবর্ণ মাটিরঙের জলস্থল বৈরাগীর হাতের মতো ভিক্ষা চাইছে আমাকে। তার ইচ্ছে হয়েছিল আমার ওই দণ্ডী যতদূর ভেসে যায়, নদীর পাড় ধরে আমি ততদূর হেঁটে যাই। ফিরে গিয়ে কী লাভ? অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে জলে দাঁড়িয়েছিলাম বলে তারাপ্রসাদ আমাকে জোর করে তুলে এনেছিল। তারপরও বহুদিন আমার সেই ঘোর কাটেনি।

সেই কথা মনে পড়তেই আমি প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আজ ভোরে। বীজমন্ত্রের যে শব্দগুলি মনে এসেছিল আমি সেগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। আর আমার আংটির গোমেদ পাথরটায় স্থির করার চেষ্টা করছিলাম আমার সমস্ত অনুভূতি। বহুদিন বাদে কৈশোরের সেই ধ্যান করার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল আমাকে।

কুনাল জানে না তার চেয়ে আমি বেশি ফেরারি।

অফিসে বেরোনোর সময়ে সোনা মনে করিয়ে দিল আজ 'আমাদের বিয়ের বার্ষিকী। মনে থাকে যেন।'

মনে ছিল না। চার বছর হয়ে গেল। এখন আমার ছত্রিশ, অর সোনা বোধহয় আঠাশ পেরিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির তলা থেকে আমি সোনাকে একটু দেখলাম, আমার দিকেই চেয়ে আছে। হাসলাম। ও হাসল। পরস্পরকে বোঝার চেনা পুরোনো হাসি। রাস্তার রোদে পা দিতেই সরগরম কলকাতার উত্তপ্ত ভিড়ের মধ্যে যেন হালকা হয়ে যাচ্ছিল। একটা বেনামি চিঠির জন্য কাল আমার অফিস কামাই গেছে একথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল।

মিডলটন স্ট্রিটে আমার অফিস। দরজায় পা দিতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ো দারোয়ান, রিসেপশন কাউন্টারের চঞ্চল মেয়েটি মৃদু হেসে নড করল, 'মর্নিং স্যার', বলে জুনিয়ার একটি অফিসার হলের আর একদিকে চলে গেল। আমি লিফট নিলাম না। অনেকদিন পর একটু হালকা লাগছে আজ। আমি জুতোর শব্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এলাম আমার চারতলার অফিসে। টাইপিস্টদের ঘর থেকে অবিরাম টাইপ-মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে। আমার ছোটো অফিস ঘরটার বাইরে অপেক্ষা করছে আমার

ছোকরা চটপটে স্টোনোগ্রাফার। আমি তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ঢুকে গেলাম ঘরে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঠান্ডা নিস্তব্ধ ছোট্ট ঘরটা আমার। সবুজ কাচে ঢাকা টেবিল, গভীর গদিওয়ালা চেয়ার আর পিছনে প্রকাণ্ড কাচের জানালা। দূরে ময়দানের চেনা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কোট খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি কাচের শার্সি খুলে দিলাম। হু-হু করে ঠান্ডা বাতাস বয়ে এল। পাতা-পোড়ানো ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ। উদাস রোদ হাওয়া আর মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ আমি আমার অন্তরে গ্রহণ করে নিচ্ছিলাম। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন আমার। একটি দুটি ছোটোখাটো অভাব বোধ এবং কখনো-সখনো সামান্য একটু একঘেঁয়েমি ছাড়া কোনো গোলমাল নেই। আমি সুখী। একটি ছোটো শ্বাস ছেড়ে আমি চেয়ারে ফিরে এলাম।

দুপুরে হঠাৎ এল সোনার টেলিফোন। তার গলার স্বর শুনে চমকে উঠে বললাম, 'কী হয়েছে!'

'কই! কিছু না!' বলে ও হাসল 'তোমাকে উল আনার কথা বলেছিলাম, রাজা! মনে আছে? মনে করিয়ে দিলাম। তোমার কোটের ডানদিকের পকেটে নমুনা দিয়ে দিয়েছি। চার আউন্স এনো।'

'দূর! আমি পারব না। আবার অফিসের পর দোকানে ছোটাছুটি! তা ছাড়া উলের রং মেলানো বড়ো ঝামেলা।'

'পারবে।' বলে হাসল, 'তুমি না পারলে চলবে কী করে? তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর?'

মৃদু হাসলাম। আমাকে পটাতে সোনা ওস্তাদ।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো'। বলেই আবার হাসি 'বলো তো আজ কী?'

'আজ?' আমি একটু ভাবনার ভান করে বললাম, 'আজ তো খোকনের জন্মদিন!'

'বদমাশ!'

'তাই না!'

'ঠিক আছে। তাই। শুধু সময়ে এসো।'

তারপর একটু চুপচাপ। টের পেলাম ও ফোন তখনও ছাড়েনি। আমিও ছাড়তে দ্বিধা করছিলাম। তখন হঠাৎ ও বলল, 'রাজা, আমার ফোন পেয়ে তুমি চমকে উঠলে কেন?'

সামান্য গোলমালে পড়ে বললাম, 'কই!'

'ভয় পেয়েছিলে?'

'কীসের ভয়!'

ও হাসে 'কীসের ভয় তার আমি কি জানি! বউ ছেলে চুরি যাওয়ার ভয় হতে পারে, ঘরে আগুন লাগার ভয় হতে পারে। কত ভয় আছে মানুষের!'

'বদমাশ' বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

সত্য যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সোনা যেভাবে বলল সেভাবে নয়। তবে অনেকটা ওরকমই অস্পষ্ট একটা ভয়।

বিকেলে আমি অনেক ঘুরে ঘুরে ওর ফরমাশী উল কিনলাম, আর আজকের দিন উপলক্ষ্যে ওর জন্য কিনলাম কালো জমির ওপর হলুদ আর সুরকি রঙের এমব্রয়ডারি করা একটা কার্ডিগান, কিছু ফুল, গোটা দুই বাংলা উপন্যাস। বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পা দিয়েছি, সে সময়ে—কোথাও কিছু ছিল না—তবু হঠাৎ মনে হল যদি এই অবস্থায় কোনোদিন কুনাল আমাকে দেখে! কে জানে বাইরের এত অচেনা লোকজনের মধ্যে সে গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ করছে কিনা! সে দেখছে তার প্রিয় মধুবনকে! পরনে স্যুট মধুবনের, উলের প্যাকেট, কাগজে মোড়া বউয়ের কার্ডিগান, হাতে ফুল আর উপন্যাস! কী জানি কেমন অস্বস্তি এল মনে, রজনিগন্ধার ডাঁটিতে আমি অকারণে বোকার মতো আমার মুখ আড়াল করলাম।

পরমুহূর্তেই হেসে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে কয়েক পলকের জন্য আমার দুর্বলতা এসেছিল।

সন্ধেবেলায় আমাদের অনুষ্ঠান জমল খুব। আমার অনেক কালের বন্ধু অতীশ এসেছিল তার বউকে নিয়ে, আরও দু-একজন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন। যখন সবাই চলে যাচ্ছে তখন সিঁড়ির গোড়ায় অতীশ আমাকে আলাদা ডেকে নিল 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার রে? শুনলাম তোর কাছে বেনামা একটা চিঠি এসেছে?'

মাথা নাড়লাম—হ্যাঁ। বললাম, 'কে বলল?'

'তোর বউ।' ও হাসল 'ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছিল কাল থেকে তুই নাকি কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। কেঁদেছিস।'

হাসলাম 'দূর।'

অতীশ নীচু গলায় প্রশ্ন করল, 'কে লিখেছে?'

বললাম, 'কুনাল। কুনাল মিত্র।'

'ওঃ!' বলে একটু ভাবল অতীশ 'বছর চারেক আগে সে আর একবার তোকে চিঠি দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। আমার বিয়ের ঠিক পরেই।'

'এবার কী লিখেছে সে?'

আমি বললাম, 'অনেকদিন আগে আমি তাকে শিখিয়েছিলাম : সাবধান। বিপ্লবের পথ কিন্তু কেবলই গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসীও ফিরে আসে ঘরে। সেই কথাই সে ফেরত পাঠিয়েছে আমাকে।'

হাসল অতীশ 'তোকে টিজ করছে, না?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।

ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতীশ 'ওর বেশি আর কিছুই কুনালের করার নেই।'

আমি চেয়ে রইলাম অতীশের মুখের দিকে।

অতীশ ম্লান হাসল, 'মধুবন আমি কুনালের খবর রাখি। বছরখানেক আগে তার খবর পেয়েছিলাম। হাওড়া জেলার মফসসলে একটা কারখানায় সে চাকরি করছে। দুঃখেকষ্টে আছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে তোর কাছে আসতে বলেছিলাম। তুই বড়ো চাকরি করিস। সে মাথা নেড়ে জানাল আসবে না। বলেছিল আমার খবর মধুবনকে দেবেন না। আমি কথা দিয়েছিলাম। আজ কথা ভাঙতে হল মধুবন, নইলে হয়তো তোর শান্তি থাকত না।'

একটু চুপ করে থেকে অতীশ আবার বলল, 'ভাবিস না মধুবন। সেইসব ছোটোখাটো চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ওর জীবনে তো আর কিছু এখন করার নেই। ওরও ছেলেপুলে নিয়ে বড়ো সংসার, তোর খোঁজখবর রাখার সময় তেমন নেই। তবু মাঝে মাঝে ওইসব চিঠি পাঠায়, পাঠিয়ে মজা পায়।'

কুনালকে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে অতীশ চলে গেল। আমি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এলাম। দেখি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সোনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে ফিরে একঝলক হেসে বলল, 'কী গো কুনাল মিত্রের বন্ধু, ভূতপূর্ব বিপ্লবী এবার একটু সাহস করো।'

হাসলাম। বুঝলাম অতীশ চিঠিটা আন্দাজ করে সোনাকে সব বলে গেছে। তবু কী করে আমি সোনাকে বোঝাব যে আমি এখনও সুখী নই।

কুনাল কতদূর বিপ্লবী ছিল, সঠিক ফেরারি ছিল কিনা তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি স্বেচ্ছায় সরে এসেছি অনেক দূরে। এখন নিশ্চিন্ত জীবন আমার। তবু মাঝে মাঝে একজন ফেরারির কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে। রাজনীতির জন্য নয়, বিপ্লবের জন্যও নয়, এসব কোনোকিছুর জন্যই এখন আর আমার একটুও ব্যস্ততা নেই। এখন আমার প্রিয়—সেলাইকলের আওয়াজ, আমার শিশু ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। কেবল মাঝে মাঝে এসবের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিমনা হয়ে ভাবতে ভালো লাগে আমারই এক সত্তা পালিয়ে ফিরছে মাঠে জঙ্গলে, খেতে খামারে, পাহাড়ে

পর্বতে। কুনালের কথা শুনে তাই আমি একটুও খুশি হইনি, অবাকও নয়। আমি তো জানতাম বিপ্লবের পথ গার্হস্থ্যের দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! আমি তো তা জানতাম।

রাতে শুয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সোনা বলল, 'কষ্ট পাচ্ছ?'

চমকে উঠে বলি, 'কই। কীসের কষ্ট?'

'আমি জানি। পাচ্ছ।'

'কেন?'

'কী জানি।' বলে একটু চুপ থেকে বলল, 'বোধহয় তোমার মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা করে, না? এমন উদ্দেশ্যহীন নিস্তেজ জীবন তোমার ভালো লাগে না। আমি জানি।'

'দূর।' বলে জোরে হেসে উঠলাম। তবু সোনার মুখ সামান্য বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

'বড়ো ভয় করে গো।' ঘুমের আগে আমার আদরে তলিয়ে যেতে যেতে সোনা বলল। অমনি আমার বুকের মধ্যে টিকটিক টিকটিক। যেয়ো না। যেয়ো না।

নিঃসাড়ে ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আমি গভীর রাতে উঠে লেখার টেবিলে ছোটো বাতিটি জ্বেলে বসলাম। কুনালকে একটা চিঠি লেখা দরকার। চেনা কুনালকে নয়। এ আর এক কুনালকে, যাকে আমি চিনি না।

সারা রাত ধরে আমি লিখলাম আমার চিঠি সিগারেটের পর সিগারেট জ্বেলে। তারপর টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভোরবেলা সোনা আমাকে ডেকে তুলল। তার চোখে মুখে ভয়, ঠোঁট কাঁপছে কান্নায়, 'কী করছিলে তুমি রাজা? সারারাত.....সারারাত ধরে।'

আমি সুন্দর করে হাসলাম। তারপর ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম চিঠিটা। ও প্রথমে বুঝতেই পারল না।

বললাম, 'সারারাত ধরে আমি এ চিঠিটা লিখেছি সোনা। বেনামি একটা চিঠি।'

'ওমা।' ও অবাক হয়ে বলল, 'এ তো মাত্র একটা লাইন।'

আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ও শব্দ করে চিঠিটা পড়ল, 'ওরে কুনাল বনের সন্ন্যাসীর চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি।'

সাপ

বাপ্পা তার বাবার সঙ্গে এই বাগানে এল। সে, তার বাবা আর রেণী।

শরৎকাল এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাগানের ফুল, ঘাসের রং আর রোদের তাপ থেকে তার আন্দাজ পাওয়া যায়। যে ঘাসগুলো বর্ষার জলে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছিল তা এখন নিষ্প্রভ। এই রোদ, ঘাস আর ফুলের রং—সবকিছুই যেন স্তিমিত, নিঃশেষপ্রায়। আর এখন না-দুপুর না-বিকেলের সময়টাতে সবকিছুই খুব নিস্তব্ধ। এই শব্দহীনতা যেন সরু সুতোর ঝোলানো কোনো ভারী জিনিসের মতো দুলছিল। যেন একটু নাড়া পেলেই সুতো ছিঁড়বে, হরিণের মতো ত্রস্ত পায়ে এই নিঃশব্দ সময়টা পালাবে।

বাপ্পা জানে যে ইচ্ছে করলেই এই নিঃশব্দতাকে সে ছিঁড়ে দিতে পারে না। একেবারেই যে শব্দ নেই তা নয়। বাগানের নিষ্প্রভ চারাগাছগুলোর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে ঘাসে। সেই আলোছায়ায় কয়েকটা মৌমাছি উড়ছিল। তাদের উড়বার শব্দ ঘড়ির শব্দের মতো একটানা, একঘেয়ে। সেই শব্দটাকে শব্দ বলে মনে হচ্ছিল না বাপ্পার।

এখন এই বাগানে লাল কাঁকরের রাস্তার ওপর বাবার হাত ধরে বেড়াতে তার বিশ্রী লাগছিল। রোজই লাগে। কেমন নিস্তেজ, অবসন্ন বিকেল। যাই-যাই ভাব। এক্ষুনি আলোটুকু যাবে। অন্ধকার হয়ে আসবে একটু পরেই।

হাঁটতে হাঁটতে বাপ্পা পথের পাশে সাজানো ত্রিভুজের মতো উঁচু হয়ে থাকা ইটগুলোকে দেখছিল। এক দুই করে গুনে যাচ্ছিল ইটগুলোকে। রেণী মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিল। গেটের কাছে রেণী একবার থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল। এমনিভাবে ফিরে তাকালে রেণীর লম্বা সরু শরীরটা ধনুকের মতো সুন্দর একটা বাঁক নেয়। চাবুকের মতো সরু লেজটা আছড়ে পড়ছে পিঠের ওপর।

এবার একটা কিছু বলতে পেরে বাপ্পা বেঁচে গেল। বলল, 'বাবা ওই দ্যাখো।'

—কী! বাবার গলাটা খুব গম্ভীর।

আঙুল উঁচু করে রেণীকে দেখিয়ে বলল, বাপ্পা, 'ওই দ্যাখো রেণী পালাচ্ছে।'

বাবার ভ্রূ দুটো জোড়া লাগল। 'কোথায় পালাচ্ছে! ও তো গেটের ভিতরেই রয়েছে।'

—ও পালাবার পথ খুঁজছে। আর পালিয়ে গিয়ে ও যা-তা খেয়ে আসে। বাড়িতে এসে বমি করে।

সে ভেবেছিল এবার বাবা তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে রেণীকে গিয়ে ধরবে। বকলশটা ধরে টানতে টানতে বাবুর্চিখানার খালি ঘরটাতে নিয়ে বেঁধে রাখবে রেণীকে। সেই ফাঁকে বাপ্পা এক ছুটে গেটটা খুলে বেরিয়ে যাবে, দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে ওপাশে শেখ-এর বাড়িতে পৌঁছে যাবে। সমশের হয় এখন মাটি কোপাচ্ছে নয়তো মুরগিকে দানা দিচ্ছে। যে অবস্থাতেই থাক, তার ঘাড়টা ধরে কাছে টেনে এনে বলবে, 'রাত্রিতে আমার পড়ার ঘরে আসিস। দুজনে লুডো খেলব।'

কিন্তু বাবা কিছুই বলল না। তার বাঁ-হাতটা যেভাবে বাবার প্রকাণ্ড মুঠোটার মধ্যে ধরা ছিল সেভাবেই রইল। তেমনি ভাবেই আস্তে আস্তে সে তার বাবার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। বাবার পায়ের রবারের চটির কোনো শব্দ হচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে তারা গেটের কাছে আসে। আবার ফিরে যেতে থাকে বারান্দার সিঁড়িটার কাছে। বাপ্পার পায়ের রবারের 'সোল'ওলা সু-টার কোনো শব্দ নেই।

কেমন যেন হাঁফ ধরল বাপ্পার। বলতে ইচ্ছে করল, 'বাবা আমি আর পারছি না।' বাবার মুঠোর ধরা তার হাতটা ঘামছে। ঘামতে ঘামতে কব্জিটা যেন গলে যাচ্ছে তার।

রোজই তাকে তার বাবার সঙ্গে এই বাগানে আসতে হয়। এমন দিন খুব কমই গেছে যেদিন সে বাবার সঙ্গে এই বাগানে আসেনি। বারান্দা পেরিয়ে চারটে সিঁড়ি ভেঙে লাল কাঁকরের পথ। পুরোনো, চেনা পথ, চেনা বাগান, মরা মরা গাছ, ঘাস। জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে এই দৃশ্যকেই সে সারাদিন দেখে। বিকেলেও আবার এখানেই আসতে হয়। কখনো কখনো গেট পেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে প্রকাণ্ড উদোম মাঠটার মধ্যে বাবার সঙ্গে গিয়েছে সে। সেই মাঠটার মধ্যে অনেকটা চলে গেলে তাদের বাড়িটাকে খুব সুন্দর ছোট্ট একটা ছবির বাড়ির মতো দেখায়। ওই মাঠটার মধ্যে খুব ছুটে বেড়তে ইচ্ছে করে বাপ্পার। কিন্তু একা তার এই বাড়ির কম্পাউন্ডের বাইরে যাওয়া বারণ। সে একা একা কখনও কোথাও যেতে পারে না।

এক সময়ে তার বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল। নীচু হয়ে রাস্তার পাশে ডালিয়া গাছটাকে দেখতে লাগল।

বাবা গাছটা দেখছে। বাপ্পা দাঁড়িয়ে রইল। শুকনো ডালিয়া গাছটা কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। গাছটা মরেই গেছে। অস্ফুট স্বরে বাবা বলল, 'আহা মরেই গেল গাছটা। রাখা গেল না।'

বাবা গাছটাকে দেখতে লাগল। বাপ্পা জানে এখন অনেকক্ষণ ধরে বাবা গাছটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। আর ততক্ষণ তার কবজিটা বাবার মুঠোর মধ্যে ধরা থাকবে।

এখন, এইবার কবজিটা ব্যথা করে বাপ্পার। কেমন যেন অস্বস্তি। কতক্ষণ যে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। ওই একঘেয়ে মরা গাছটা বাবা এখন কতক্ষণ ধরে দেখবে কে জানে।

বাপ্পা সিঁড়িগুলোর দিকে তাকাল। ছোট্ট খোলা বারান্দায় এখন রোদ। ঢাকা-না-দেওয়া রং-চটে-যাওয়া কয়েকটা চেয়ার-টেবিল এলোমেলো ভাবে রেখে দেওয়া। রাত্রিবেলা অন্ধকারে বারান্দায় আসতে গেলে প্রায়ই কেউ-না-কেউ ওই চেয়ার-টেবিলগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। কেন যে ওগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয় না,—বাপ্পা ভাবে। বারান্দায় দুটো দরজা হাট করে খোলা। এখন বাগানের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরগুলো অন্ধকার মনে হচ্ছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুটো দরজা। একটা ড্রয়িংরুমের, অন্যটা শোবার ঘরের। ঘরে আলো জ্বললে এখান থেকেই স্পষ্ট মাকে দেখতে পেত বাপ্পা।

কম্পাউন্ডের ওপাশে মরা আমগাছটার ডালে বসে অনেকগুলো কাক। বিচ্ছিরি কালো অনেকগুলো কাক মরা আমগাছটার ডালে। অনেক—অনেকগুলো। কটা ? বাপ্পা গুনতে চাইল। এক, দুই, তিন, চার......

কিন্তু চেষ্টা করেও অন্যমনস্ক হতে পারল না সে। বাবার মুঠোয় ধরে থাকা বাঁ-হাতের কব্জিটা এখন প্রায় অবশ। ইচ্ছে করে খুব জোরের সঙ্গে ঝাঁকিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় কিংবা চিৎকার করে বলে, 'আমার হাতটা ছেড়ে দাও তুমি।'

কিন্তু বাপ্পা কখনও তা বলে না। লিকলিকে সরু কালো একটা চাবুক আছে বাবার। বাড়ির পেছন দিকে কম্পাউন্ডের শেষে খালি বাবুর্চিখানার দেয়ালে টাঙানো থাকে চাবুকটা। ঘরটা রেণীর, চাবুকটাও রেণীর জন্যেই। মাঝে মাঝে যখন কথা শুনতে চায় না রেণী, ডাকলেও কাছে আসে না তখন বাপ্পা দেখেছে বাবা রেণীর গলার বকলশটা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বাবুর্চিখানার দিকে। তারপর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। তারা কেউ কাছে থাকলে বাবা বলে, 'তোমরা কেউ এসো না এদিকে।' তারা কেউ কাছে যায় না কিন্তু এত দূর থেকেও চাবুকের শ্লিক শ্লিক শব্দটা সে শুনেছে। বাসনপত্র মেঝেতে ফেলে দিলে যেমন হয় তেমনি কর্কশ বিকট একটা চিৎকার করে রেণী কাঁদতে থাকে।

তখন বাপ্পাও কাঁদতে থাকে ভিতরে ভিতরে। তার সমস্ত শরীরটা কাঠ হয়ে থাকে। ইচ্ছে করে এই মরা মরা গাছওলা শুকনো ম্যাড়ম্যাড়ে বাগানটা পার হয়ে একলাফে 'গেট'টা ডিঙিয়ে অনেক দূরে চলে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে : 'আমি কক্ষনো—কক্ষনো এখানে থাকব না।'

ফিরে ফিরে বাঁ-হাতের কবজিটাকেই মনে পড়ল বাপ্পার। কবজিটা অবশ হয়ে হয়ে এখন ছিঁড়ে যেতে চাইছে। বাবা নীচু হয়ে গাছের গোড়া দেখছে। সে এক পা-ও নড়তে পারছে না। বাপ্পা জানে বাবা তাকে

যেভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সেভাবেই তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কখনও সে বাবার অবাধ্য হয় না। অবাধ্য হওয়ার কথা মনে হলেই চাবুকে বাতাস কাটাবার সেই অদ্ভুত শব্দটা তার কানের কাছে বাজতে থাকে। বুকের ভিতরটা ছলাৎ ছলাৎ করতে থাকে। আর সে তখন খুব শান্ত হয়ে যায়। খুব শান্ত হয়ে থাকে বলেই মাঝে মাঝে বাবা দুই হাতের মধ্যে তার মাথাটা চেপে ধরে বলে : 'কখনও তুমি আমার অবাধ্য হও না, তাই না! এই তো আমি চাই। খুব শান্ত, সংযত, ভদ্র হতে চেষ্টা করো।'

'কচু। কচু।' বাপ্পা মনে মনে বলল : 'মোটেই আমি শান্ত হতে চাই না, মোটেই না।' পা দুটো ঝিন ঝিন করছে বাপ্পার। ডেঁও পিঁপড়ে কামড়ানোর মতো একটা যন্ত্রণা হাঁটুর কাছে, গোড়ালিতে। বাঁ-হাতটা এখন অবশ। অবশ। কী ব্যথা হাতটায়। আঙুলগুলো আছে কী নেই বোঝা যাচ্ছে না।

বাপ্পা এখন রেণীকে দেখছিল। রেণী পথ থেকে নেমে বাগানের উত্তর কোণটার কাছে চলে গেছে। একটা গঙ্গা-ফড়িং রেণীর নাকের ডগায় উড়ছে। আর সেই ফড়িংটাকে তাড়া করে ঝোপঝাড়গুলোর ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে সরে যাচ্ছে।

ফড়িংটাকে ধরবার জন্যে রেণী লাফিয়ে ওঠে। বাপ্পা তাকিয়ে থাকে। রেণীর লম্বা শরীরটা বাতাসে ঢেউ খেয়ে নিঃশব্দে মাটির উপর পড়ে। ফড়িংটা এক ঝটকায় অনেকটা ওপরে উঠে গেছে।

রেণী লাফিয়ে ওঠে আবার। ফড়িংটা উড়তে উড়তে উত্তর কোণ থেকে বাগানের বেড়ার কাছে কেয়া ঝোপটার কাছে সরে যাচ্ছে।

রেণী লাফাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, সরে যাচ্ছে। ডিগবাজি খাওয়ার মতো ভঙ্গি করে মাটির ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ফড়িংটা লাফিয়ে উঠল। ফড়িংটা যেন রেণীর সঙ্গে খেলছে।

বাপ্পা তার পা দুটো সামান্য নাড়ল। ডান পা-টা বাড়িয়ে দিল। জুতোর 'হিলটা' পথের কর্কশ কাঁকরের ওপর ঘষতে লাগল আস্তে আস্তে। খুব মৃদু সাইকেলের 'চেন' ছাড়বার মতো কিরকির কিরকির একটা শব্দ হতে লাগল।

বাপ্পা পা-টা জোরে চেপে ধরে পথের ওপর। জুতোটা ঘষতে থাকে। জুতোর তলায় মিহি ফুরফুরে কাঁকরগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বাপ্পার ইচ্ছে করছিল কাঁকরের ওপর ঘষে ঘষে 'হিল'টা ক্ষয় করে ফেলে, তারপর জুতোজোড়া পা থেকে খুলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

রেণী এখন কেয়া ঝোপটার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ফড়িংটা ওর মাথার অনেকটা ওপরে। রেণী ফড়িংটাকে দেখছে। পাতা ঝরে যাওয়া বিশ্রী শুকনো কুচ্ছিত বাগানটার সঙ্গে রেণীর গায়ের বাদামি-রংটা মিশে আছে।

রেণী পেছনের পা-দুটো ভাঙল। ল্যাজটা নামানো। সামনের পায়ে অল্প একটু ভাঁজ। এক্ষুনি লাফ দেবে রেণী!

ফড়িংটা দূরে সরে যাচ্ছে।

রেণী লাফ দেবে।

জুতোর 'হিল'টা মাটিতে জোরে জোরে ঠোকে বাপ্পা।

'আঃ বাপ্পা', বাবা সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'এক মিনিট—এক মিনিটও তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো না!'

তার হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় বাবা। বাপ্পা টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে বাবার হাতটা চেপে ধরে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কী হয়েছে? জুতোটা ঘষছিলে কেন? বাবা খুব জোর গলায় বলে।

রেগে গেলে বাবা এভাবেই চিৎকার করে। অবাধ্য রেণীকে বাবা এভাবেই চেঁচিয়ে ডাকে। বাবার দুটো চোয়াল শক্ত হয়ে ঢিপির মতো উঁচু হয়।

অস্পষ্টভাবে চাবুকে বাতাস কাটবার একটা শব্দ বাপ্পার কানের কাছে বাজতে থাকে।

—একটা কাঁকর আমার জুতোর মধ্যে ঢুকে গেছে।

—কাঁকর! বাবার ভ্রূ দুটো জোড়া লাগে।

এবার বাবা তার হাতটা ছেড়ে দেয়।

—কাঁকরটা বের করে ফেলো।

বাপ্পা নীচু হয়ে হাঁটু ভেঙে লাল কাঁকর ছড়ানো পথের ওপর বসে জুতোটা খুলতে যাচ্ছিল।

বাবা একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'অসভ্য, নোংরা, জানোয়ার কোথাকার।' বাবা বলে। বাড়ানো হাতটা দিয়ে তার ঘাড়ের কাছে শার্টের কলারটা ধরে তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল বাবা।

—ধুলোর ওপর বসতে তোমার ঘেন্না হল না। দাঁতে দাঁত চেপে বাবা বলে, 'অসভ্য ছোটোলোকদের ছেলের সঙ্গে মিশলে এরকমই হয়।'

আপন মনে মাথা নাড়ে বাবা, 'না:, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তোমার উপর আমার কোনো আশাই নেই। তুমি নষ্ট হয়ে যাবে, একদম নষ্ট হয়ে যাবে।'

বাপ্পা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন সে বাবাকে দেখছিল না বাবার কথাও শুনছিল না। সে দেখতে পেল ফড়িংটা কেয়া ঝোপের পাশ দিয়ে উড়ে কম্পাউন্ডের বেড়ার ওপর দিয়ে বাইরে চলে গেল। রেণী দৌড়ে বেড়াটার ধারে গেল।

রেণী এখন বাইরে যাওয়ার একটা পথ খুঁজছে।

বাপ্পা তাকিয়েই রইল।

রেণী অস্পষ্ট শব্দ করল। বাবা ফিরে তাকাল।

রেণী এদিক-ওদিক ছুটে একটা পথ খুঁজছে। বাপ্পা তাকিয়েই রইল।

বাবা ডাকল, 'রেণী।'

চোখের পলক না ফেলতেই তারের আর মেহেদি পাতার বেড়ার ভিতরে ছোটো একটা গর্তের মধ্যে রেণীর বাদামি লম্বা শরীরটা ঢুকে গেল।

রেণী এখন ওপাশে।

বাবা ডাকল, 'রে-ই-ণী-ই-ই।'

ছোটো একটা নিশ্বাস ফেলল বাপ্পা। এতক্ষণ ধরে যে এইটেই চাইছিল।

বাবার আঙুলগুলো পাক খেল, জোঁকের মতো জড়িয়ে গেল। বাবার মুখটা লাল। চোয়ালের ওপর দুটো ঢিপি।

বাবা গেটটার কাছে এগিয়ে গেল।

আবার ডাকল, 'রেই—ণী—ই—ই।'

শব্দটা শিস দেওয়ার শব্দের মতো তীব্রতর হল। তারপর অনেকগুলো তিরের মতো বাতাস চিরে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু রেণী ফিরল না। রেণীর বাদামি রঙের হিলহিলে লম্বা শরীরটা দুলতে দুলতে দূরে চলে যেতে লাগল।

বাবা 'গেট'টা খুলে বাপ্পার দিকে ফিরল, 'তুমি এখানেই থেকো। বাড়ির বাইরে যাবে না।' বাপ্পা মাথা নাড়ল।

বাবা গেটটা বন্ধ করে রাস্তা পার হয়। জোরে জোরে হাঁটতে থাকে মাঠটার মধ্যে। রেণী এখন ছুটছে। সহজে ধরা দেবে না। রেণী—বাপ্পা জানে।

বাপ্পা মাঠটার দিকে একবার তাকাল, তারপর শুকনো ঘাসফুলের বেড়া ডিঙিয়ে এক দৌড়ে বাড়ির পিছন দিকটায় চলে এল। এখানে গাছগুলো বড়ো বড়ো। একবার সমশেরের বাড়ি গেলে হয়—ভাবল বাপ্পা। কিন্তু সামনের দিকে 'গেট' পেরোতে গেলে খোলা মাঠ থেকে বাবা তাকে দেখে ফেলতে পারে।

ভাবতে ভাবতে জামগাছটার তলায় চলে এল বাপ্পা। খুব নির্জন এদিকটা। কেউ নেই। কম্পাউন্ডের পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার চলে গেছে।

বাঁ-হাতটা কবজির কাছে এখন লাল। যেন কোনো সাড় নেই হাতে। হাতটা পুরোপুরি অবশ হয়ে গেছে কিনা দেখবার জন্যেই বাপ্পা বাঁ-হাত দিয়ে একটা নুড়ি কুড়িয়ে নেয়। চারিদিকে তাকায় বাপ্পা। কেউ নেই।

সবচেয়ে কাছে যে টেলিগ্রাফের পোস্টটা ছিল বাপ্পা সেটার দিকে নুড়িটা ছুঁড়ে মারে। নুড়িটা অনেক দূর দিয়ে চলে গেল।

বাঁ-হাতের কবজিটাতে তেমন জোর পাচ্ছে না সে। সে আর সমশের প্রায়ই এইখানে দাঁড়িয়ে ওই পোস্টটার গায়ে ঢিল মারে। 'সমশেরের চেয়ে আমি ভালো পারি'—এই ভেবে যেখানে জামগাছের তলায় নুড়িগুলো জড়ো করে রাখত তারা সেদিকে এগোয়।

নুড়ি তোলবার জন্যে হাত বাড়ায় বাপ্পা।

গাছের তলায় ঘাসগুলো লম্বা, ঘন সবুজ। নুড়িগুলো একপাশে জড়ো করা। বাপ্পা নীচু হতে গিয়ে ঝুঁকতেই দেখতে পেল জড়ো করা নুড়িগুলোর পাশে ঘাসগুলো সরু একটা রেখার মতো দু-পাশে সরে যাচ্ছে। 'সাপ'—বাপ্পা ফিসফিস করে বলল—'সাপ। একটা সাপ'। তার প্রসারিত হাতটা ঠান্ডা।

বাপ্পা স্থির হয়ে থাকে। খুব স্বচ্ছন্দ গতিতে কালো সাপটা এগিয়ে এসে পাথরগুলোর কাছে থামল। চওড়া মস্ত বড়ো ফণাটা ভেসে উঠল ঘাসের ওপর। আবার ডুব দিল।

বাপ্পা পিছিয়ে আসবার জন্য একটা পা আলগা করল।

সমস্ত শরীরে ঢেউ তুলে, যেন তেল মাখানো কোনো জায়গার ওপর চলছে এমনি পিচ্ছিল গতিতে সাপটা সেই পাথরের স্তূপের ওপর উঠল। চকচকে আঁশগুলোর ওপর হলদে রঙের আলপনা।

বাপ্পা পেছন দিকে একটা প্রকাণ্ড লাফ দিল। ঠিক লাফ নয়, যেন কেউ তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মাটির ওপর পড়ে গেল বাপ্পা। সাপটা এখনও পাথরগুলোর ওপর মুখ তুলে। সেই মুখ থেকে পেট পর্যন্ত ছাই-রঙা।

হামাগুড়ি দিয়ে বাপ্পা সরে যেতে থাকে। খুব তাড়াতাড়ি সরে আসবার জন্যেই মাটিতে ছোট্ট পাথরের টুকরো আর বালিতে তার হাঁটু আর হাতের তেলো ছড়ে যেতে থাকে।

অনেকটা দূর চলে এসে বাপ্পা সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আবার দৌড় দিয়ে আরও খানিকটা পিছিয়ে এল বাপ্পা। খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে বাপ্পার। দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বুকের ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ রক্তের শব্দ শোনে।

সাপটা ফণা তুলেছিল। ফণা-টা তুলে যেন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই অল্প অল্প পিছিয়ে যেতে থাকে সাপটা। ফণাটাকে দুলিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে সাপটা পিছিয়ে যেতে থাকে।

এবার বাপ্পা হাসে। সাপটা ভয় পেয়েছে।

একটা ঢিল তুলে নিয়ে বাপ্পা হাতটা দোলাতে থাকে। সাপটাকে আর ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য বলে—'এই হ্যাট হ্যাট। যাঃ'—

সাপটা একটু করে পেছোয়।

বাপ্পা একটু করে এগোয়।

সাপটা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে থাকে। ঘাসের ওপর তেমনি আঁকা বাঁকা সরু রেখা উঠল।

বাপ্পা এগোতে থাকে।

বাবুর্চিখানার সামনে ছোট্ট বাঁধানো চত্বরটায় আবার মুখ তোলে সাপটা।

—হ্যাট, হ্যাট। যাঃ—

ধীরে ধীরে চত্বরটা পেরিয়ে যায় সাপটা। মজা লাগে বাপ্পার। কেন যেন হাসি পায়।

সাপটা এগোচ্ছে।

বাবুর্চিখানার দরজাটা খোলা। সাপটা একবার মাথা তোলে।

—হ্যাট হ্যাট—বাপ্পা বলে। এখন বুকের ভিতর সেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা নেই। কেমন যেন উত্তেজনা বোধ করে বাপ্পা। তার কানদুটো গরম এখন।

পকেটে হাত গুঁজে বাপ্পা দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দেখতে পায় সাপটা আস্তে আস্তে বাবুর্চিখানার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতের ঢুকে যাচ্ছে।

এবার ফিরে আসে বাপ্পা। ফিরে সামনের বাগানের দিকে চলতে থাকে। পা-দুটো ঝিনঝিন করছে। হাঁটুর কাছে ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় লাল পুঁতির দানার মতো রক্ত জমে আছে। হাতের তেলোদুটো জ্বলছে। এতক্ষণ এই ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো টের পাচ্ছিল না বাপ্পা। এখন তার চলতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁটুদুটোয় ব্যথা, হাতের তেলোয় জ্বলুনি।

সামনের বাগানের গেটটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। অনেক দূরে মস্তো উদোম খোলা মাঠটার ওপর বাবাকে দেখতে পায় বাপ্পা। মস্ত বড়ো আকাশ আর খোলা উদোম মাঠটার মাঝখানে বাবাকে ছোট্ট মতো দেখায়। বাবা রেণীর গলার বকলশটা ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসছে।

বাবা খুব কাছে এসে পড়ার আগেই বাপ্পা গাঁদা গাছগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায়। গাঁদা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাঁটুর ওপর ঘষতে থাকে।

'গেট'-এর কাছে বাবার গলা শোনা যায় : 'অবাধ্য—অবাধ্য কুকুর! চাবুক দিয়ে শায়েস্তা করতে হয় তোমাকে।' বাবা বাগানের মধ্যে দিয়ে রেণীকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

—বাপ্পা, বাপ্পা—আ। বাবা ডাকে।

বাপ্পা দৌড়ে বাবার কাছে চলে আসে।

বাবা তার দিকে তাকায়। বাবার চোয়ালের ঢিপি দুটো এখন উঁচু। মুখটা লাল টকটক করছে।

—কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? বাবা বলে।

—এখানেই।

তার হাঁটুর দিকে তাকায় বাবা। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'ওগুলো কী? অ্যাঁ। কেটে গেল কেমন করে?'

—আমি পড়ে গিয়েছিলাম।

বাবা আর কিছু বলে না। শুধু কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার রেণীকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বাবা এখন পেছন দিকের বাগানে যাবে।

বাবা, আমি কি আসব ? বাপ্পা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

বাবা তার কথা শুনতে পায় না। রেণীকে বকতে বকতে বাবা এগিয়ে যাচ্ছে। এবং তারপর বাবা আর রেণী বাড়ির পিছন দিকটায় চলে যায়।

নির্জন শুকনো ম্যাড়ম্যাড়ে বাগানটায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বাপ্পা। সাপটা—সাপটা—ও-ঘরেই আছে—ভাবে বাপ্পা। তার বাবা এখন ও ঘরেই যাবে।

—বাবা—প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকে বাপ্পা, তারপর ছুটতে শুরু করে। বুকের ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা শুনতে পায় সে।—'বাবা'—প্রাণপণে ছুটতে থাকে বাপ্পা। ছুটে এসে জামগাছটার তলায় দাঁড়ায়। বাবুর্চিখানার চত্বরে বাবা আর রেণী। বাবা রেণীকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। রেণী যাবে না। রেণী চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে জেদি ছেলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবার মুখটা ভয়ংকর লাল। চোয়ালের ঢিপি দুটো খুব উঁচু।

—বাবা—প্রায় ফিস ফিস করে বলে বাপ্পা। বাবা রেণীকে দরজার কাছে নিয়ে গেল। বাবা তাকে দেখতে পেল, চেঁচিয়ে বলল—'বাপ্পা, এখন এখানে এসো না, চলে যাও।'

তবু বাপ্পা দাঁড়িয়ে থাকে। তার পা-দুটো থর থর করে কাঁপে। ঠোঁটদুটো শুকনো, গলাটা শুকনো। প্রাণপণে চেঁচাতে ইচ্ছে করল বাপ্পার। সে বলতে চাইল—'বাবা, বাবা গো, ও-ঘরে একটা সাপ। মস্ত বড়ো ভয়ংকর

একটা সাপ; এখন ও-ঘরে তুমি যেয়ো না, যেয়ো না।' কিন্তু সে বলল না। ভাবল—'থাক। দেখাই যাক কী হয়।'

'একটা ভীষণ মজা হবে এক্ষুনি। কী মজা—সাপটা ও-ঘরে আর বাবাও এখন ও-ঘরে।' ভাবে বাপ্পা। তার সমস্ত শরীরটা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

বাবা ভিতর থেকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সেই 'দড়াম' শব্দটা বাপ্পাকে যেন ধাক্কা দিল। তার প্রায় অবশ হাঁটু-দুটো ভেঙে সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। জামগাছটার গুঁড়িতে নিজের হাতটাকে চেপে ধরে সে। 'আমি বলে দিইনি, বলে দিইনি ও-ঘরে কী আছে। আমি বলে দিইনি, বলে দিইনি—বলিনি'—যন্ত্রের মতো বাপ্পা এই কথাটাই বারবার বলতে লাগল। চাবুকের শ্লিক শ্লিক শব্দটা শুনতে পেল সে। বাসনপত্রের কর্কশ শব্দের মতো শব্দ করে রেণী কান্না শুরু করল।

বাপ্পা কাঠ।

চাবুকের শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। রেণীর কান্নাও।

'বাবা' চিৎকার করল, বাপ্পা, 'বাবা, বাবা গো। বাবা, বাবা'—প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল বাপ্পা। লম্বা ঘাসগুলোয় তার পা আটকে যাচ্ছিল। পড়তে পড়তেও ছুটতে লাগল বাপ্পা। বাঁধানো চত্বরটা পার হয়ে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, 'বাবা, বাবা। আমি বাপ্পা।'

'বাপ্পা', বাবার গলা শোনা গেল। স্থির গম্ভীর গলা, 'বাপ্পা, এ ঘরে একটা মস্ত বড়ো বিষাক্ত সাপ।'

—তুমি দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসো বাবা। বেরিয়ে এসো।

—আমি বেরিয়ে যেতে পারছি না বাপ্পা। সাপটা দরজার কাছেই। আমি দরজাটা খুলতে পারছি না। নিস্তেজ গলায় বাবা বলে।

—তুমি বেরিয়ে এসো বাবা। বেরিয়ে এসো। শুধু একথাটুকুই বলতে পারল বাপ্পা, 'তুমি বেরিয়ে এসো।'

—'আঃ বাপ্পা, আমি কেমন করে বেরোব'—! দরজার ওপাশে যেন অনেক দূর থেকে বাবার গলা শোনা গেল, 'এ ঘরে কিছুই নেই। তুমি আমাকে একটা কিছু দাও। একটা লাঠি কিংবা ওই ধরনের কিছু।'

—বাপ্পা ছুটে জানালাটার কাছে এল। কাচভাঙা ছোট্ট জানালাটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল প্রায়। 'বাবা মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে'—বাপ্পা বলে।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। বাপ্পা বড়ো বড়ো করে তাকাল।

—কোথায় তুমি বাবা? কাঁদতে থাকে বাপ্পা।

—এই যে বাপ্পা। বাবা সিমেন্টের তৈরি বেদির মতো উনুনটার কাছ থেকে জানালার দিকে তাকাল। বাবার চোখদুটো বড়ো বড়ো। বাবা ভয় পেয়েছে।

বাপ্পা দেখতে পায় উনুনটার ওপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রেণী। বাবার হাতের চাবুকটা স্থির। বাবা এতটুকু নড়ছে না।

—বাপ্পা, আমি নড়তে পারছি না। তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না। একটা কিছু এনে আমার হাতে দাও। বাবার গলাটা কাঁপছে।

সাপটা দরজার কাছে। সমস্ত শরীরটা দুটো বাঁক খেয়ে গোল হয়ে রয়েছে। ফণাটা উঁচু করে আস্তে আস্তে দুলছে সাপটা। ফণাটা এত উঁচুতে যে সেটা অনায়াসে তার বাবার বুকের কাছে বোধহয় ছোবল দিতে পারে। বাবা পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজছে। সেই হাতদুটো থর থর করে কাঁপে। বাপ্পা দেখে।

সাপটা একটু ঝাঁকানি দিয়ে পিছু হটে গেল। মাথাটা পিছন দিকে হেলালো।

'বাপ্পা দাঁড়িয়ে থেকো না,' বাবা চাপায় গলায় বলে।

সাপটা চাবুকের মতো ছিটকে লাফিয়ে পড়ল সামনের দিকে। বাবা ডানদিকে সরে গেল। সরতে গিয়ে উনুনটার ওপর টাল খেয়ে পড়ে গেল বাবা। সাপটা সরে যাওয়ার আগেই বাবা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রেণীর দাঁতগুলো বিশ্রীভাবে বেরিয়ে এল। 'ঘ্যাক' করে একটা অদ্ভুত শব্দ করে রেণী। দেয়ালের দিকে সরে যায়। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে গোঁ গোঁ করতে থাকে। সাপটা একটা দোল খেয়ে সোজা হয়। আবার দরজার দিকে সরে যেতে থাকে। বাবার কপালের কাছে দুটো শিরা জোঁকের মতো ফুলে আছে। চোখ দুটো বড়ো বড়ো। 'বাপ্পা, দাঁড়িয়ে থেকো না' বাবা বলে। চকচকে আঁশ আর হলদে ডোরা কাটা সাপটা তার বাবার দিকে ফেরে। উঁচু ফণাটা দুলতে থাকে।

বাপ্পা চোখ বোজে, 'আমি নড়তে পারছি না বাবা, নড়তে পারছি না। আমার হাত-পাগুলো অবশ।' বাপ্পা ফিস ফিস করে বলে। জানালার কাছ থেকে সরে আসে বাপ্পা। দাঁতে দাঁত চাপে। কোমরটা অবশ। দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে ছুটতে শুরু করে বাপ্পা। 'একটা লাঠি—একটা লাঠি—একটা লাঠি' বাপ্পা যন্ত্রের মতো বলতে থাকে। আর ছুটতে থাকে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার।

বাপ্পা দেখে ছুটে বাগানটা পার হতে অনেক সময় লেগে যাবে। বাড়ির ভিতর থেকে লাঠি আনতে আনতে —। বাপ্পা থেমে বাঁ-দিকে ছোটে। কিন্তু কোথাও একটা লাঠি নেই। কিছু খুঁজে পায় না বাপ্পা। জিওল গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায় বাপ্পা। এখন হাঁফাতে হাঁফাতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিমগাছটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে একটা মস্ত বড়ো ঘুণে ধরা বাঁশ দাঁড় করানো। বাপ্পা একলাফে নিম গাছটার কাছে চলে আসে।

বাঁশটা নিয়ে আবার জানালার কাছে আসে বাপ্পা। বাবা এখন উনুনটার ওপর দাঁড়িয়ে। রেণী গোঁ গোঁ করে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। 'উঃ বাপ্পা'—বাবা চিৎকার করে বলে—'বাঁশ দিয়ে কী হবে? বাঁশ নয়। একটা লাঠি এনে দাও। তাড়াতাড়ি বাপ্পা। তাড়াতাড়ি।' বাঁশটা ফেলে দিয়ে বাপ্পা পা বাড়ায়। কিন্তু পা অবশ। একদম নড়তে পারছে না সে। তার বুক মাথা গলা জুড়ে একটা কল চলবার মতো শব্দ। সাপটা পিছলে পিছলে এগিয়ে আসে। ফণাটা বাতাসে দুলে চাবুকের শব্দ করে।

'বাপ্পা, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না।' বাবা বলে। অস্পষ্ট ভাবে বাপ্পা দেখতে পায় বাবা রেণীর বকলশটা চেপে ধরে ঠেলে রেণীকে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে।

অন্ধের মতো বাপ্পা পা বাড়ায়। তার গাল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। চোখে কিছু দেখছে না সে। চোখদুটো জলে ভরা। পা বাড়াতে গিয়ে বাপ্পা পড়ে যেতে থাকে। 'সাপ, সাপ, সা-আ-প' চিৎকার করতে করতে বাপ্পা ছোটে। কোথায় ছুটে যাচ্ছে বুঝতে পারবার আগেই চত্বরটার ওপর তার ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা টলে পড়ে যেতে থাকে।

* * * *

যখন অনেক বড়ো হয়েছিল বাপ্পা তখন সে তার ছেলেমেয়েদের কাছে কিংবা নাতি-নাতনিদের কাছে ফিরে ফিরে এই গল্পটাই বলত। কিন্তু যখন বলত বাপ্পা, তখন গল্পটার কোনো কোনো অংশকে সে ঢাকা দিত। ঢাকা দিত তার কারণ, এই স্মৃতির কোনো কোনো অংশকে সে বুঝতে পারত না। এই বুঝতে না-পারা অংশগুলো ছিল ছোট্ট ছোট্ট, অস্পষ্ট, অন্ধকার গর্তের মতো। এই গর্তে কী আছে, কোন অদ্ভুত রহস্য তা বাপ্পা বুঝতে পারত না। তাই গল্পটা বলতে বলতে মাঝে মাঝে থামত সে। অনেক কিছুই তো আমরা ঢাকা দিই, ঢাকতে চাই,—ভাবত বাপ্পা। ভাবতে ভাবতে অদ্ভুতভাবে একটু হাসত সে। বুকের ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ রক্তের শব্দ শুনত। তীব্র একটা উত্তেজনাকে অনুভব করত দেহের ভিতরে। তারপর থেমে-থাকা গল্পটাকে শুরু করবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হত।

মনে মনেই সেই অদ্ভুত রহস্যময় অন্ধকার গর্তগুলোকে লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসত বাপ্পা।

স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু

"This is the way the world ends
Not with a bang, but a whimper."

একদিন, জুন মাসের এক বিকেলে মাখনলালের মন ভালো ছিল না।

সেদিন অফিসে অনেকক্ষণ ধরে একটানা একটা জরুরি কাজ করতে হয়েছে। যখন অবশেষে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে সে ঘড়ি দেখল তখন ছটা বেজে সতেরো মিনিট। তার মেরুদণ্ড ব্যথা করছিল, মাথার ভিতরে কোথায় একটা রগ বিদ্যুতের মতো চমকে চমকে উঠছে। পাখার হাওয়ায় কোথায় একটা কাগজ উড়ছে—মাখনলাল দেখতে পেল না—কিন্তু সেই শব্দে তার শিরা উপশিরা শিউরে উঠেছিল। তার চারদিকে জনশূন্য নিঃশব্দ ঘরটা প্রকাণ্ড হয়ে আছে। মনে হল তাকে অন্যমনস্ক রেখে সারা বিকেল ধরে তার জ্বর এসেছে।

করিডোরে বেরিয়ে এসে সে দারোয়ান রামজীবনের পায়ের শব্দ পায়। নাগরা জুতো অন্ধকারে হাতুড়ির মতো ঠুকতে ঠুকতে সে অনেকক্ষণ ধরে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছিল। চাবির গোছার শব্দ, কাশির শব্দ, দেহাতি গানের কলি পরস্পর মিশে যায়। সে এই বুড়ো অফিস বাড়িটার সিল করবার গালার অদ্ভুত গন্ধ, পুরোনো গঁদ, কাঠ আর বার্নিশের গন্ধ পায়। অল্প অন্ধকার, দীর্ঘ করিডোরটা পায়ে পায়ে পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হয় বয়স ঢের বেড়ে গেছে। আর মনে হয় বাইরে কোথায় তাকে বাদ দিয়ে একটা উৎসব চলতে চলতে শেষ হয়ে এল। সিঁড়ি ভেঙে সে বাইরের আলো আর শব্দের মাঝখানে নেমে আসতে আসতে স্পষ্ট টের পেল রামজীবনের গানের কলি হঠাৎ লক্ষ্যহীন অন্ধের মতো টাল খেতে খেতে পুরোনো অফিস বাড়িটার কড়ি বরগা আর দেয়ালের পলেস্তারার ভিতরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাইরে হাওয়ায় দোকানের উজ্জ্বল আলো আর লোকজনের ভিড়ের ভিতরে নেমে এসে হঠাৎ ঘুম এবং স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন হয়, তার তেমনি সবকিছু খুব অচেনা লাগছিল। মনে পড়ল সে অনেকক্ষণ সিগারেট খায়নি, জল খায়নি, কোনো খাবার খায়নি। অন্যদিন এই সময়ে তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। মনে হয় ললিতা তার অপেক্ষায় আছে কিন্তু আজ এক্ষুনি তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। মনে পড়ে কতকাল সে কলকাতার রাস্তায়, ময়দানে, এসপ্ল্যানেডে ঘুরে বেড়ায়নি, দোকানের শো-কেসে সাজানো জিনিস, আলো, লোকজন দেখতে দেখতে দু-পয়সার বাদাম শেষ করে খামোকা কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েনি। এইসব—খানিকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল সে। তারপর আস্তে আস্তে ট্রাম রাস্তা পেরোল মাখনলাল।

জুন মাসে পরপর কয়েকদিন অনাবৃষ্টি গেছে। জ্বরগ্রস্ত ফুটপাথ থেকে, দেয়ালের গা থেকে ভাপ উঠে আসছে। ধুলোয় ঘুলিয়ে উঠছে এসপ্ল্যানেডের আলো, গা ঘেঁষে বেন্টিক স্ট্রিটের মন্থর ট্রাম চলে যায়। নীচু বুকচাপা দোকানঘর থেকে চামড়ার কটুগন্ধ। বুক গুলিয়ে ওঠে। বৃষ্টি হবে কি? মাখনলাল চোখ তুলে লাল আকাশ দেখল। মেঘ না, তারা না,—কিছুই দেখা যায় না।

আলো অন্ধকার, অবয়ব চোরাগলির, নৃমুণ্ডের সারি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। শো-কেসে সাজানো রেডিয়ো, গলফ স্টিক, হাওয়াই শার্ট। স্যুটপরা 'ডামি' আলোর নীচে চকিতে হেসে উঠল। একটা সিনেমা হল। লবিতে নিঃসঙ্গ সাদা একটা ওজন নেওয়ার যন্ত্র। মাখনলাল পেরিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে কী ভেবে দাঁড়িয়ে ফিরে এল। এখন বিকেলের শো চলছে। লবিটা নির্জন। মাখনলাল ওজন নেওয়ার যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল।

ওজন নেওয়ার যন্ত্রের ভিতর পয়সাটা ফেলে দেওয়ার পর ... যখন ঠিনঠিন করে একটা জটিল গলিঘুঁজির পথ দিয়ে সেটা নেমে যাচ্ছিল তখন মাখনলাল যন্ত্রটাকে লক্ষ করল। পয়সাটা কোথায় ধাক্কা দিল কে জানে—হঠাৎ ভিতরে কোথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিউরে লাফিয়ে উঠল যন্ত্রটার হৃৎপিণ্ড। কোথায় একটা স্প্রিং শিরার মতো টিকটিক করে কাঁপতে থাকে। লিভারের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রটার জেগে ওঠা টের পেল। মনে হয় এতক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর যন্ত্রটার শিরা ধমনির ভিতর দিয়ে রক্তস্রোত প্রবলভাবে বয়ে যাচ্ছে।

টিক করে টিকিট পড়ল ছোট্ট খোপের মধ্যে।

কয়েক পলক মাখনলাল সাদা মসৃণ সুন্দর যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠান্ডা ঘুমন্তের মতো। মনে হয়, একটুক্ষণের জন্য জেগে ওঠে, তারপর জাগরণ ক্লান্তিকর দেখে যন্ত্রটা আস্তে আস্তে আবার তার শীতল চিন্তাহীন ঘুম এবং স্বপ্নের ভিতরে চলে গেছে।

মাখনলাল ওজনের টিকিট তুলে একটা মেয়ের ছবি দেখতে পেল। ছবির নীচে তার ভাগ্য দেওয়া আছে। ওজন ছাপানো টিকিট হাতে মাখনলাল সিনেমা হলের লবি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।

টিকিটের ওজন ছাপানো দিকটায় ভালো খবর প্রায়ই থাকে। সে দেখল, এবার পাঁচ পাউন্ড কম! লম্বার অনুপাতে তার ওজন বরাবরই চার-পাঁচ পাউন্ড কম ছিল। তাহলে সবশুদ্ধ—মাখনলাল হিসেব করে দেখল, তার যতটা ওজন হওয়া উচিত তার চেয়ে এখন তার ওজন আট-নয় পাউন্ড কম!

তার মন আস্তে আস্তে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ওজন নিয়ে সে কখনও বড়ো একটা ভাবেনি। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে টের পেল চারদিকে ভ্রাম্যমাণ লোকজনদের যাতায়াত, স্টেটবাসের শব্দ—এইসব আলোকিত দৃশ্যের ভিতরে থেকেও সে আজ কেবলই নিজের ওজনের কথা ভাবছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ হাঁটল মাখনলাল। তারপর রাস্তার ওপাশে একটা খুব ঝলমলে সিগারেটের দোকান দেখতে পেয়ে ট্রামরাস্তা পেরোল।

ব্যস্ত দোকানির দিকে পয়সা বাড়িয়ে 'এক প্যাকেট চারমিনার' বলে সে দোকানের অসম্ভব সরু লম্বা আয়নায় হঠাৎ নিজের মুখ এবং কোমর পর্যন্ত দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। নিজের লাবণ্যহীন দুর্বল মুখের দৈনন্দিন বিষণ্ণতা আর অবসাদ সে দেখে নিল। সে জানে তার শরীরও ছোটোখাটো—কোনোখানেই তা শক্ত কিংবা পুরুষালি নয়। অনেক দিন ধরে সে রক্তহীনতা রোগে ভুগছে কি ? কিংবা বহুদিন ধরে অন্যমনস্কতার সুযোগে তার কোনো গোপন অসুখ তৈরি হয়ে গেছে! সে বুঝল না।

সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে দোকানি তাকে লক্ষ করছে টের পেয়ে মাখনলাল চোখ সরিয়ে নিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়! ওজন নেওয়ার টিকিটটা তখনও হাতে ধরা ছিল। সেটা ছুঁড়ে দেওয়ার আগে মাখনলাল তার ভাগ্যটা পড়ল, যার অর্থ দাঁড়ায় "শিগগিরই আপনি খুব বিপদে পড়বেন, তবে সেটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না।" বিপদ! মাখনলাল ভ্রূ কোঁচকাল। আবছা রহস্যময় একটা কার্যকারণসূত্রকে সে টের পাচ্ছিল। যে জানে কোনো যুক্তির সূত্রে লেখাটা তার হাতে আসেনি—এর কোনো মানে নেই। তবু কোথায় সূক্ষ্মভাবে সে সচেতন হয়ে উঠছিল। সিগারেটের তীব্র ধোঁয়া তার স্নায়ুপুঞ্জে, গলার স্বরনালিতে, বুকে দয়াহীন ছড়িয়ে পড়ছিল। সে টিকিটটা দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তারপর রাস্তায় দোকানের উজ্জ্বল আলো, কাটা কাটা নাকমুখ চোখ গলির মুখে চোরা অন্ধকার দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ বোধহীনের মতো হাঁটল মাখনলাল। সে এসপ্ল্যানেডের বড়ো রাস্তা, চেনা পথ ছেড়ে আধো-অন্ধকার অচেনা রাস্তার ধাঁধার ভিতরে উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরছিল। কখনও মন খারাপ হয়ে যেতে থাকলে—সে দেখেছে কিছুই করার থাকে না। সে নিজের ভীষণ অন্যমনস্কতা টের পেল। টের পেল তার ভয়ংকর খিদে পেয়েছে, তেষ্টায় বুক জ্বলছে। অচেনা গলির মুখে ছিমছাম একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেয়ে তার দরজায় উঠে দাঁড়াল মাখনলাল। কাচের পাল্লা ঠেলে ভিতরে একটা পা বাড়াল।

ভিতরে কোথাও রেডিয়ো কিংবা গ্রামোফোনে কোনো অদ্ভুত ড্রামের বাজনা দমকে দমকে বাজছে। পলকের জন্য তার মনে হল শব্দটা নেড়ি কুকুরের মতো গায়ে গা ঘষটাতে ঘষটাতে আর্ত চিৎকার করে তাকে এই ঘরে ঢুকতে বারণ করছে। ভিতরে ধু ধু আলো জ্বলছে—সেই আলো কাচ বসানো টেবিল, ছাইদানি, পিরিচ, চেয়ার টেবিলের চকচকে বার্নিশের ওপর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আলপিনের মতো তার চোখ বেঁধে। মনে হয় এর লম্বাটে হলঘরের মতো ঘরটার সবকিছুই আলো বিকিরণ করছে। ভিতরে খুব বেশি ভিড় নেই। যারা আছে তাদের প্রায় সকলকেই বিদেশি কিংবা জাহাজের লোক বলে মনে হয়। বাঁ-দিকে দেয়ালের কাছে কাউন্ট✕□রে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—তার কালো মুখে বেশি পাউডার কিংবা রং-মাখা বলে মুখটা ছাইরঙা—রক্তশূন্য। রুক্ষ চুল, উঁচু চোয়াল আর মভ রঙের শাড়িতে তাকে সাজানো ডামি মনে হয়। শিরাবহুল কালো একটা হাত কাউন্টারের ওপর প্রাণহীন—কেউ এসে তুলে নেবে বলে অপেক্ষা করছে।

দু-একজন ফিরে তাকিয়ে মাখনলালকে দেখল। যারা বসে আছে তারা সবাই খুব লম্বা চওড়া আর জোয়ান বলে তার বোধ হল। সে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা কতকগুলো মজবুত কবজি দেখছিল। দমকে দমকে ছড়িয়ে যাওয়া গান, তালে তালে মৃদু মাথা নাড়া—সবকিছুই অতিরিক্ত এখানে। তাকে কেউ গ্রাহ্য করল না। যেন সে তার তুচ্ছ শরীর, রক্তশূন্য মেয়েলি মুখ, দুর্বল হৃৎপিণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এখানকার ভীষণ পুরুষালি একটা আবহাওয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এইসব আলো, গান, মেয়ে, তার জন্যে নয়। মনে হল—সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভাবল—ফিরে যাই।

কাউন্ট✕□রে বসা প্রকাণ্ড একটা লোক—হাতছানি দিয়ে সে মাখনলালকে একটা খালি টেবিল দেখিয়ে দেয়। অকারণে খুনখারাপি রঙের ঠোঁট ফাঁক করে মেয়েটা হাসে। চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল মাখনলাল। বমি হওয়ার আগের মুহূর্তের দমকা ঘূর্ণি শরীরের ভিতর থেকে উঠে আসছে টের পেয়ে মাখনলাল হাত নেড়ে লোকটাকে জানাতে চাইল—বসবে না। লোকটা একটা মোটা আঙুল মুখে পুরে মাড়ি পরিষ্কার করতে করতে তার দিকে নিস্পৃহ তাকিয়ে দেখে।

মাখনলাল নিজে কী করছে বুঝতে পারছিল না। বেরিয়ে আসবার জন্য সে অন্ধের মতো কাচের পাল্লাটার দিকে হাত বাড়াল। সেই মুহূর্তেই সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো এক বেয়ারা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সে বোঝে—তার জন্যেই। ফিরে তাকাতেই হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে তার মনে হল ভিতর থেকে কেউ আগুনের মতো একজোড়া চোখ তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই নামিয়ে নিল। পয়সার মতো কী একটা বস্তু তার শরীরের জটিল ফুসফুস মেরুদণ্ডের পথ বেয়ে ঠিনঠিন করে হঠাৎ গড়িয়ে গেল। উন্মাদ ড্রামের শব্দ সেই মুহূর্তেই খুব উঁচু গ্রাম থেকে হঠাৎ চূর্ণিকৃত ভগ্নাংশে লয় পেয়ে যাচ্ছিল। পলকের জন্য মাখনলাল নিজের জেগে-ওঠা টের পাচ্ছিল। কার চোখ সে দেখতে পেয়েছে—বুঝল না।

বিনীতভাবে পাগড়ির ছায়ায় মুখ ঢেকে বুড়ো বেয়ারাটা মাখনলালকে কিছু বলছিল। মাখনলাল শুনল না, কিংবা শুনেও কিছু বুঝল না। সে জানত না—যেন তার অজান্তেই কোনো ঘটনা এখানে ঘটে আছে। যেন এরা এতক্ষণ দোকান সাজিয়ে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে দ্রুতচোখে শেষবারের মতো রেস্টু রেন্টের ভিতরটা দেখে নিচ্ছিল। মনে হল, এখানে কোথাও কোনো জরুরি জিনিস সে ফেলে যাচ্ছে। ভিতরের আলো, সহস্র তল থেকে প্রতিধ্বনিত বাজনার শব্দ, তালে তালে মৃদু মাথা নাড়ার ভিতরে কোথায় যেন যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সৈনিকদের মতো বেপরোয়া ভাব ছিল—মেয়েটার স্থির অবয়ব কাউন্টারে হেলানো, প্রকাণ্ড লোকটা হঠাৎ ঘাড় হেলিয়ে সিলিঙ, দেখছে, বুড়ো বেয়ারাটা দাদুর মতো স্নেহময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু এদের ভিতর কার চোখ সে দেখতে পেয়েছে বুঝল না। চোরা মারের মতো তাকে আঘাত করেই চোখটা বিবরে সরে গেছে। যেন কেউ আংটিপরা হাত আলোর সামনে এনেই সরিয়ে নিল—বিচ্ছুরিত আলো পলকের জন্য তার চোখে বিঁধেছিল।

কেন তার এমন মনে হল! কাচের পাল্লাটা ঠেলে, সিঁড়ি ভেঙে ফুটপাথে নেমে যেতে যেতে সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তিকে টের পায় মাখনলাল। যেন হঠাৎ জেগে উঠে সে ঠিক কোথায় এসেছে—চারপাশে তাকিয়ে সে বুঝবার চেষ্টা করল। শ্বাস নিতে তার সামান্য কষ্ট হচ্ছিল—খুব উত্তেজনার পর যেমন হয়। সে স্থিরভাবে কোনোকিছুর দিকে তাকাতে পারছিল না, বুঝতে পারল না কোথায় এসেছে। যেন তার হাত-পা কোনোকিছুই তার বশে নেই। কেন সে এখানে এসেছিল! চকিতে তার মনে পড়ে যায়, অন্যদিন এতক্ষণে সে তার শহরতলির ছোট্ট বাসায় ফিরে গেছে। তার দেরি দেখে নিশ্চিত ললিতা এখন ছয় বছরের বুকুকে পাশে নিয়ে মেঝের ওপর গড়াচ্ছে। সে ফিরলে উঠে দরজা খুলে দিলে ললিতার ঘুমন্ত মুখ বেয়ে পড়া চুল, স্খলিত আঁচল দেখা যাবে।

খানিকক্ষণ—যেন ঘুরে ভিতরে—হেঁটে গেল মাখনলাল। কিছুক্ষণ আগেকার গুমোট ভাবটা আর নেই। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে—মনে হয়। অবাস্তব এসপ্ল্যানেড দুলে দুলে সরে যায়। ভেঙে-পড়া দুর্গের অবশিষ্ট একটিমাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেন্ট। কারা তার সঙ্গে হাঁটছে, উলটোমুখো হাঁটছে, সামনে পিছনে এলোপাথাড়ি তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের অবয়ব, মুখ এবং শো-কেসে, আয়নায় প্রতিবিম্বিত তাদের গোলাকার, কখনও লম্বাটে অ্যাবস্ট্রাক্ট চলন্ত ভগ্ন অবশেষ। কেন এমন হয়—সে ভাবছিল। কার চোখ সে দেখেছিল! কার চোখ! খুব নিষ্ঠুর কেউ কি! অমন নিষ্ঠুর চোখের লোক পৃথিবী থেকে যত কমে যায় তত ভালো। কেমন নিঃসঙ্গ লাগছিল মাখনলালের। বুকে লুকোনো কোনো মাইক্রোফোন থেকে কে যেন কেবলই কথা বলছে। তার ঠোঁট নড়ছিল। সে কিছুই শুনতে পেল না। বুঝল না। হাজার কোণ থেকে, স্মৃতি থেকে, স্বপ্ন থেকে তির্যক, ভাঙা যৌগিক দৃশ্য ও শব্দ তার ওপর ঝরে পড়ছিল।

নাকি—বৃষ্টি! সুরেন ব্যানার্জি রোড পার হতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাতে বাধা পেয়ে সে জুন মাসের প্রথম বৃষ্টিপাত দেখল। হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাথে আছড়ে পড়ে ভাঙছে।

সংবিৎ পেয়ে দৌড়ে শিয়ালদার বাসে উঠতে গিয়ে সে দেখল ডবলডেকারে বেজায় ভিড়। বাস-স্টপেজের শেড-এর নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়াল মাখনলাল। শেড-এর তলায় ভিড় ক্রমশ বাড়ছিল। ভিড়ে দাঁড়িয়ে সকলের গায়ের গরম অসুস্থ ভাপ, নিশ্বাস, সিগারেট ধোয়ার শ্বাস নিতে নিতে সে দূরগামী হরিণের লঘু পদশব্দের মতো বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। মনে হয় চারপাশের সবকিছু হঠাৎ কোথায় যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সিঁড়িতে, ফুটপাথে, রাস্তায়, ডবলডেকারে—সবকিছুর ওপর চরাচর জুড়ে প্রবল হরিণের মতো লাফিয়ে ছুটছে বৃষ্টি। রাস্তার চৌ-মাথা, পুলিশ, লম্বা অফিস-বাড়ি, উজ্জ্বল দোকান—সব কেমন আড়ালের মতো স্থির থেকে ভিজে যাচ্ছে।

বৃষ্টির প্রথম দমকটা কেটে গেলে মাখনলাল ঘড়ি ঢেলে কব্জিতে রুমাল বেঁধে রাস্তায় নামল। কিছুটা হেঁটে গেলে আবার বৃষ্টির জোর বাড়তে থাকে। জলের ফোঁটার প্রবল আঘাতে তার মুখের চামড়া ফেটে যাচ্ছিল। মাথাটা ভিজে যাচ্ছে—চুল বেয়ে জল-ভেজা ঘাড়ের কাছ দিয়ে অজস্র আঁকাবাঁকা কেঁচোর মতো পিঠ বেয়ে নামছিল। হাঁটার তালে কিংবা বাতাসে হঠাৎ জামাটা পিঠের চামড়ার ওপর থেকে সরে যাচ্ছিল বলে তার বোধ হচ্ছিল কেউ তার চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

রাস্তাটা ধু ধু করা বাষ্পাকার জলকণায় আদি অন্তহীন। একটা স্কুটার তীব্রভাবে জল কেটে লঞ্চের মতো চলে যায়। সামনে পা ফাঁক করে বলিষ্ঠ একটি ছেলে লোহার হাতে হ্যান্ডেল ধরে আছে। পিছনের সিট-এ জড়োসড়ো রুমালে ঢাকা মুখ মেয়েটি ছেলেটির পিঠে এলিয়ে আছে। সামনে পিছনে ছায়ার মতো কয়েকজন কোলকুঁজো হয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। স্কুটারটা বৃষ্টির ভিতরে দূরে চলে যেতে যেতে হঠাৎ বাঁক নিল, লাফিয়ে উঠে টাল খেয়ে তিরের মতন মিলিয়ে গেল। উলটে পড়ল না—আশ্চর্য! মাখনলাল দেখল।

চারিদিকে এখন এই বৃষ্টি ছাড়া কিছু নেই। রাস্তার দু-ধারে যে প্রকাণ্ড উঁচু বাড়িগুলোর তলায় দাঁড়ালে নিজেকে ভীষণ হীন বলে মনে হয়, সে-বাড়িগুলো এখন ঝাপসা—পটে-আঁকা—নিসর্গের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া ঝুপসি গাছের মতো দাঁড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে ভিজছে। নিঃসঙ্গ একা মাখনলাল বৃষ্টির ভিতরে হেঁটে

যেতে যেতে টের পেল চারধারে এই বৃষ্টি এক প্রবল ঘেরাটোপের মতো ঘিরে আসছে—ঝাপসা ধোঁয়াটে পুরোনো ছবির মতো ঘরবাড়ি দোকান, দু-একটা মানুষ—এরা সব অ-সত্য।

কোথায় যেন এই বৃষ্টির সঙ্গে সে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। চেনা রাস্তা, তবু তার মনে হল কোনোদিন কখনও সে এই রাস্তায় আসেনি। এই বৃষ্টি যেন তার চেনা-পরিচয়কে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যেন সে এক অদ্ভুত পর্দার আড়ালে আছে, পর্দা সরালেই দেখতে পাবে—বিদেশ। স্রোতের মতো জল ফুটপাথ থেকে তার জুতোয় চলকে উঠে বয়ে যাচ্ছে। সে খেয়াল করল না।

এমন বৃষ্টির মতো স্বাস্থ্যকর আর কী আছে! মনে পড়ে কতদিন সে বৃষ্টিতে ভেজেনি, রোদে আপাদমস্তক পোড়েনি। মনে হয় প্রেমহীন প্রকৃতিহীন কতগুলি দিন সে স্বপ্নের ভিতর কাটিয়ে দিয়েছে। কখনও ফিরেও দেখেনি দিনগুলি। কোনো স্মৃতি থাক তাও চায়নি। মনে হয় বহু দৃশ্য, শব্দ, চলার ভঙ্গি, অনেক নিস্তব্ধতা, মৃত্যুশোক এইভাবে তাকেই উদ্দেশ্য করে ঝরে গেছে।

দূরের চিৎকার, অস্পষ্ট মন্থর ট্রামের শব্দ, পাখির ডানার শব্দ, পাতা ঝরে পড়বার শব্দ তার উদ্দেশ্যে কেউ নিক্ষেপ করছিল। এমন স্বজনহীন, বান্ধবহীন সন্ধেবেলা সে আর দেখেনি। কেন সে বৃষ্টিতে এল? কেন? মনে হয় এমনতরো সাধ তার কিছু কিছু রয়ে গেছে। মনে পড়ে কোনো শীতের দুপুরে কার্জন পার্কে গাছের ছায়ায় সারাদিন শুয়ে থাকবার সাধ তার কখনও মেটেনি। মানুষের কাছে নয়—কিন্তু অন্য কোথায় যেন সে ফিরে যেতে চেয়েছিল। পুব বাংলায়—তাদের পুরোনো বাড়ির জানালার ধারে এতদিনে শেফালি ফুলগুলি ম্লান হয়ে এল। পানা পুকুরের কালো পাড়ে শ্যাওলা—কচুপাতায় বাতাস লাগবার শব্দ—কামরাঙা গাছ থেকে একটিমাত্র ঘুঘুর ডাকে কত গভীর দুপুর হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে গেল।

কার চোখ সে দেখেছিল! সে কি খুব অচেনা কেউ ? নিজেকে এমনতরো উদবাস্তু তার আগে কখনও মনে হয়নি। ছেলেবেলায় ঘরের দেয়াল-ঘড়িটার শব্দ সে যেমন সবসময়ে খেয়াল করে শুনত না—কিন্তু ঘর নির্জন হয়ে এলে কিংবা মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে তার দম শেষ করে দেওয়ার অদ্ভুত একরোখা শব্দ শুনে চমকে উঠে ভেবেছে 'আরে—ঘড়িটা! তাই না!' তেমনি হঠাৎ নির্জন নিঃশব্দ হয়ে গিয়ে সে তার যন্ত্রণাকে টের পেল। বিষণ্ণতার ভিতর দিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে আটটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরল মাখনলাল।

বৃষ্টি পড়ছে না। বাইরে জুন মাসের আকাশ ঘোলা হয়ে আছে। মেঘ না, তারা না—কিছুই দেখা যায় না। ট্রেনের জানালার হাওয়ায় মাথা রেখে চোখ চেয়ে ছিল মাখনলাল। ভেজা মাথা বুক ঠান্ডা বাতাসে চিড় খেয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের চাকা দ্রুত লাইন বদল করছিল। জং-ধরা লোহালক্কড়ের শব্দ, কাপলিঙের শব্দ, স্প্রিং আর ঢিলেঢালা নাটবল্টুর শব্দ, অবিরাম তার শরীরের ভিতর থেকে উঠে আসতে থাকে। উলটো-মুখো ট্রেনের ভৌতিক জানালায় কার হাত সাপের মতন নড়ে যায়। কার চশমার কাচে বাইরের অন্ধকার নিসর্গের বিকৃত দোমড়ানো প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

একটু রাতে তার শহরতলির ছোট্ট বাসায় ফিরল সে। দরজা খুলে দিতে দিতে ললিতার অস্পষ্ট—যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে কথা বলছিল। চকিতে মাখনলাল তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ওপাশের দেয়ালের ক্যালেন্ডারের দূর সূর্যাস্তের দিকে বহমান তিনটে নৌকোর ছবি দেখতে পায়। মেঝের ওপর বুকু ঘুমোচ্ছে। অচেনা মিশ্র এক জনতার ভিতর থেকে এসে ঘরের দরজায় পা দিয়ে সে নিজেকে আলাদা অনুভব করছিল।

হাতমুখ ধুয়ে ঢাকা ভাত খেয়ে নিতে নিতে আস্তে আস্তে সে স্বাভাবিক বোধ করছিল। ললিতা খেতে বসলে দু-একটা কথা বলছিল মাখনলাল। তারপর কী বলছিল—ভুলে গেল।

খাটের ওপর আলাদা বিছানায় শুয়ে মাখনলাল দেখছিল মেঝেতে ছোট্ট বিছানায় বুকুর পাশে শুয়ে পড়বার আগে ললিতা টর্চ জ্বেলে মশারির ভিতরে মশা খুঁজছে। মনে পড়ে কবে কোনো ভিড়ের ট্রামে কিংবা বাস-এ কার হাতের চামড়ায় সবুজ উল্কিতে আঁকা একটা ন্যাংটো পরির ছবি দেখেছিল। পিঠে কাকের পাখার মতো দুটো পাখা লাগানো। বয়সে হাতটার চামড়া কুঁচকে এসেছিল—পরিটার শরীর হয়েছিল বেঢপ—এবড়ো-

খেবড়ো—নাক-মুখ-চোখ কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয়েছিল—হাতের ওপর পরিটার বয়স অনেক হয়ে গেল—তবু হাত ছেড়ে উড়ে যাওয়ার সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা!

ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে মাখনলাল চোখ বুজবার আগে ললিতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "বুঝলে, ছুটি পেলে খুব দূরে কোথাও বেড়াতে যাব।"

অনেক রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল মাখনলালের। কিছুক্ষণ সে কোথায় কীভাবে আছে না বুঝে চেয়ে রইল। মাথার ভিতের একটা স্কুটারের শব্দ ঘুরে ঘুরে যায়। সে টের পেল তার হাত, পা, মাথা—সব অদ্ভুত ভঙ্গিতে ছড়ানো—চিৎ হয়ে শোয়া, দুটো হাত বুকের ওপর। কারা যেন চোরাগলিতে পরিত্যক্ত নির্জনে একটা ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে রেখে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে গলিজোড়া সেই হাঁ-করা ম্যানহোলের দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ মাধ্যাকর্ষণের কোনো এক মুখ দিয়ে শূন্যতা এবং সময়হীনতার মধ্যে গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু খুব বেঁচে গেছে মাখনলাল। ঠিক সময়ে ঘুম না ভাঙলে সেই গর্তে—অন্ধকারে—পুতিগন্ধে নগণ্য ইঁদুরের মতো মৃত্যু হত।

অস্থিরতা টের পেয়ে মাখনলাল উঠে বসল। স্খলিত অচেনা গলায় ডাকল—"ললিতা!" কেউ উত্তর দিল না। কারও জেগে থাকবার শব্দ তার শুনতে ইচ্ছে করছিল। বাইরে বৃষ্টিপাত থেমে গেছে। কিন্তু কোথায় যেন বৃষ্টির সঞ্চিত জল চুইয়ে কোনো শূন্য টিনের কোটোর ওপর পড়ছিল। প্রতিটি ফোঁটার সেই ভারযুক্ত শব্দকে কে যেন তার উদ্দেশ্যে শব্দভেদী বানের মতো নিক্ষেপ করছিল।

অনেকক্ষণ ঘুম এবং জাগরণের মাঝখানে এক অদ্ভুত নিশ্চেষ্টতার ভিতরে সে বসে রইল। বুকের বাঁ-পাশে একটা অস্পষ্ট বাথা ডাক-টিকিটের মতো লেগে আছে। মনে হল স্বপ্নগুলো এখনও তার মাথা থেকে সম্পূর্ণ সরে যায়নি। কোথাও খুব কাছাকাছি তারা অপেক্ষা করে আছে। সুযোগ পেলেই স্বপ্নের ভিতরে—ঢাকনা খুলে রাখা ম্যানহোলে টেনে নিয়ে যাবে। একঝলক নীল বিদ্যুতের আলোয় ঘরটা অস্পষ্টভাবে তার চোখের সামনে লাফিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। যদি আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে? সঞ্চিত জলের সেই প্রতিটি ফোঁটার জ্যা-মুক্ত শব্দশূন্য-টিনের ক্যান—নির্জনতা তাকে অন্ধকারে স্বপ্নের ভিতরে ঠেলে দিচ্ছিল। সে টের পেল তার সারা শরীরে শাঁসওয়ালা ব্রণের মতো শিউরানো রোমকূপ খাড়া হয়ে আছে।

চৌকির পাশেই রাখা টুলের ওপর থেকে গেলাস তুলে নিয়ে অনেকটা জল খেল মাখনলাল। তারপর সিগারেট ধরাল। বৃষ্টির পর গুমোট গরমে ঘরটা ফেঁপে আছে। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বুক এখনও ভার। অস্পষ্টভাবে তার মনে হচ্ছিল, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই ললিতাকে ডাকা উচিত। কিন্তু অতটা সময় পেল না মাখনলাল। ঘুম তটভূমি অতিক্রম করে তার জাগরণের ভিতরে আছড়ে পড়ছিল। কে যেন তাকে ধীরে টেনে নিচ্ছিল ঘুমে স্বপ্নের ভিতরে! স্কুটারের শব্দটা প্রচণ্ড বেগে তার মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে। চকিতে মাখনলালের মনে হয় কে যেন বরাবর তার আগে আগে হেঁটে এসেছে। ওজন যন্ত্রের ভিতর ঠিক টিকিটটা তার জন্যে সাজিয়ে রেখেছিল কে? অচেনা রেস্টুরেন্টে একমুহূর্তের জন্য মুখোস খুলে তার ভিতরের আগুন মাখনলালকে দেখতে দিয়েছিল কে? উত্তল কাচের তির্যক বিম্বের মতো চকিতে বিদ্যুতের আলোয় ঘরটা আবার লাফিয়ে উঠলে মাখনলাল দেখতে পায়—সে। সাদা দেয়ালের মতো বুক—সাদা দেয়ালটাই। ঈশ্বরের বুকের মতো সাদা দেয়ালটায় চকিতে আবার বিদ্যুৎ বিস্ফোরিত হলে সে—মাখনলাল—সেখানে নিখুঁত সুন্দর একটা বুলেটের ছ্যাঁদা দেখতে পায়। মুহূর্তেই যন্ত্রণায় কুকড়ে গিয়ে সাদা দেয়াল অন্ধকার দিয়ে ক্ষতস্থান কামড়ে ধরল।

সিগারেটটা কোথায় ফেলল মাখনলাল! কোথায়...? সে প্রাণপণে উঠে বসবার জন্য চেষ্টা করতে করতে ললিতাকে ডাকতে চাইল। চেষ্টা করে দেখল মাখনলাল—ওঠা যায় না। পিয়ানোর রিড টিপে কে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আলো ফেলছে। সে হাত বাড়িয়ে খুঁজছিল—সিগারেটটা। এই ঘরেই কোথাও কোনো অন্ধকার কোণে সেটা পড়ে আছে...জ্বলছেও, তার পোড়া গন্ধ আগুনের তাপ সে অনুভব করল। সে নিশ্চিত বুঝল—

কোথাও জড়ো করে রাখা কাপড়-চোপড়ে, কাঠের টেবিলের পায়ার সঙ্গে লেগে, কিংবা বিছানায় কারও অসতর্ক চুলের ভিতরে সিগারেটটা নির্দয় জ্বলছে।

"কেন এভাবে! কেন!" মাখনলাল প্রশ্ন করে। মনে হয় বহুকাল ধরে একটা অন্ধকার ঘরের ভিতরে কোথায় একটা সিগারেট জ্বলছে—সে খুঁজছে। খুঁজছে। সিগারেটটা আছে কোথাও—তার জ্বলা সে টের পাচ্ছিল। প্রাণপণে উঠবার, কাউকে ডাকবার জন্য সে ছটফট করছিল।

রাতের প্রথম কুকুরটা ডেকে উঠতেই আস্তে আস্তে হাল ছেড়ে দিল মাখনলাল। বুঝতে পারল—সে মারা যাচ্ছে। ইঁদুর আরশোলার মতো তুচ্ছভাবে। কার ক্ষতস্থান থেকে দু-ফোঁটা রক্ত দু-চোখে গড়িয়ে পড়লে ওজন যন্ত্রটা ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত বাড়িয়ে তার হাতে একটা টিকিট তুলে দেয়। মাখনলাল কিছুই দেখতে পায় না। নিশ্চিত শেষ স্বপ্নের ঢেউটা এসে পড়লে সে চকিতে শুনতে পায় ললিতা তাকে ডাকছে।

কিন্তু তখন তটভূমি ছেড়ে দিয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে যাওয়ার মতো মাঝ সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছিল মাখনলাল।

মৃণালকান্তির আত্মচরিত

ভূমিকা

মৃণালকান্তি আমাকে অনেক গলিঘুঁজি, চোরাপথ, ভাটিখানা, বেশ্যাদের আস্তানা, হিজড়েদের আড্ডা চিনিয়েছিল। এইভাবে চেনা রাস্তা ভুলিয়ে অচেনা রাস্তায় সে বহুবার আমাকে নিয়ে গেছে। মনে আছে অনেকদিন মৃণালকান্তির সঙ্গে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রিফিউজিদের বিবাহ, সঙ্গম, জন্ম এবং মৃত্যু দেখব বলে দাঁড়িয়ে থেকেছি। উপকরণের খোঁজে এইভাবে সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। যতদূর জানা যায় মৃণালকান্তি তখন তার আত্মজীবনী রচনায় ব্যস্ত ছিল। তার সেই আত্মজীবনীর কিছু কিছু পৃষ্ঠা আমি পড়ে দেখেছি। সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও স্বপ্ন—এই ছিল তার আত্মজীবনীর উপকরণ এবং এইসব নিয়ে সে এত বেশি উত্তেজিত থাকত যে, কখনও রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সে তার মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কপাল টিপে রেখে এমনভাবে তাকাত যেন চিনতে পারছে না। তার রুক্ষ চোয়াল, গাল-ভাঙা মুখের ওপর নীল শিরাগুলি দেখা যেত। কখনও আমি তাকে বলতাম, "তোমাকে মাঝে মাঝে ভীষণ অচেনা মনে হয় হে মৃণালকান্তি, বাস্তবিক!" পকেট থেকে জাদুকরের মতো নিমেষে একটা রুমাল বের করে মৃণালকান্তি তার মুখের বিষণ্নতা ও ক্লান্তি চাপা দিয়ে বলত, "কোথাও যাচ্ছ!" কিংবা "খুব ব্যস্ত কি ?" আমি "না" জানালে সে বলত "তবে এসো, একটু চা খাওয়া যাক।" নির্জন অচেনা নিঃশব্দ কোনো রেস্তোরাঁয় আমরা মুখোমুখি বসতাম আর তখন মৃণালকান্তি কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে সদ্যলেখা তার আত্মজীবনীর পৃষ্ঠাগুলি বের করে আমাকে পড়তে দিত।

আমার মনে হয় আত্মজীবনী বলতে যা বোঝায় মৃণালকান্তি ঠিক তা লেখেনি। এইরকম জনশ্রুতি আছে যে, মৃণালকান্তি প্রায়ই স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা আক্রান্ত হত। এই সম্বন্ধে সে নিজে লিখে গেছে, "আমার মনে হয় স্মৃতি এবং স্বপ্ন—এই দুইটি শব্দ আমাদের সচেতন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পাপপুণ্যময় এ জগতে স্মৃতি এবং স্বপ্ন সকলেরই স্বাভাবিক অবলম্বন। বাস্তবিক ঠিকমতো অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, আমাদের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা, দার্শনিক প্রবন্ধ, ইস্পাতের কারখানা এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বারা রচিত।" মনে হয় এইখানে মৃণালকান্তি স্মৃতি অর্থে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এবং স্বপ্ন অর্থে কল্পনা বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আমার অনুমান এইমাত্র যে, মৃণালকান্তির স্মৃতি ও স্বপ্ন খুব স্বাভাবিক স্তরে ছিল না, কেননা সে নিজেই অন্যত্র লিখেছে : "...কিন্তু আমার আত্মজীবনী বাস্তবিক ইস্পাতের কারখানা, প্রেমের কবিতা কিংবা দার্শনিক প্রবন্ধ নয়। ইহার ভিতরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দু-একটা লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও বাস্তবিক ইহাকে ষোলো আনা দূরবীক্ষণ যন্ত্রও বলিতে পারা যায় না। যাহাদের স্মৃতি এবং স্বপ্ন স্বাভাবিক স্তরে আছে তাহারা প্রেমের কবিতা এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু আত্মজীবনী রচনার চেষ্টা কদাচ করে না। আমার মতো মানুষের আত্মজীবনীর মূল্য কী তা—যাহাদের স্মৃতি এবং স্বপ্ন স্বাভাবিক স্তরে আছে—তাহাদের কাছে বোধগম্য নয়। কেননা যে স্মৃতি এবং স্বপ্ন অতীতে একদা আমাদের ইস্পাতের কারখানা ও দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহা আমার ভিতরে উপস্থিত থাকিলে আমার যাবতীয় পণ্ডশ্রম একটিমাত্র আত্মজীবনী রচনাতেই কেন্দ্রীভূত হইল কেন! তাও স্থির প্রত্যয়জাত কিংবা অঙ্কের মতো নির্ভুল কোনোকিছু এই রচনাতে নাই—বরং এর সর্বত্র রচয়িতার তীব্র সন্দেহমাত্র উপস্থিত আছে। কোনো ঘটনায় মাথার ভিতরে চকিতে বিস্ফোরণ ঘটিলে তাহার আলোতে যতদূর দেখা যায় ততদূর হইতে আমার

স্মৃতি ও স্বপ্নগুলি আহরণ করিতেছি। মাঝে মাঝে ভ্রম হয় আমি কতদূর অর্থহীন তাহা জানিবার আগ্রহেই আমি এই আত্মজীবনী রচনা করিতেছি।"

আখ্যান

ছায়া ছিল খুব হিসেবি মেয়ে। যাদবপুরের কোনো রিফিউজি কলোনি থেকে ছায়া কলকাতায় মাস্টারি করতে আসত। মৃণালকান্তি পরিচয় করিয়ে দিলে আমি ছায়াকে প্রথম দেখে বড়ো হতাশ হই। টলটলে চোখ ছিল না ছায়ার—শীতকালে শুকনো ঠোঁটের ওপর মামড়ি দেখা যেত। শরীরে মেয়েদের যেসব আকর্ষণ থাকে তার কোনোটাই ছিল না। খুব ঘন ঘন সিনেমা দেখত ছায়া—সব বাংলা ছবিই তার মোটামুটি ভালো লাগত। কখনও কোনো কবিতার লাইন ছায়া বলেছিল কি! আমার মনে পড়ে না। প্রথমবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় মৃণালকান্তি, "এই ছায়া। আমার—" বলে কথা শেষ করবার আগেই মনে পড়ে ছায়া বলল, "থাক আর বলতে হবে না, উনি বুঝতে পারছেন।" মৃণালকান্তির সামনে প্রথমদিনই ছায়া আমার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, "আমি খুব বেশি খাই না," বলেছিল, "আমার ছোটো বোন গান জানে, আপনার সঙ্গে বেশ মানায়।" প্রতি বৃহস্পতিবার আর শনিবার সন্ধে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সে মৃণালকান্তির সঙ্গে থাকত। ওই দুদিন তার টিউশনি ছিল না। সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরে ছায়া বাড়ি ফিরত—যদিও ছায়ার হাতে কখনও ঘড়ি দেখিনি। যেমন টনটনে ছিল তার সময়জ্ঞান তেমনি বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল ছায়ার। মৃণালকান্তি ডায়েরি লিখছে জেনে সে মধ্যে মধ্যে তার ডায়েরি পড়তে চাইত। মৃণালকান্তির আত্মজীবনীর সবটুকু আমি পড়িনি। ছায়াকে কোথা থেকে কেন জোগাড় করেছিল—সে আমি জানি না। মনে পড়ে তার আত্মজীবনীর কোথাও ছায়ার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার আগে সে লিখেছিল, "... কোনোদিন কোনো যুবতি মহিলার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিয়া যাই নাই—যাহাতে মনে হয় চতুষ্পার্শ্বস্থ সবকিছু আমাদের কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে। আমি কখনও মায়ের সঙ্গে, আত্মীয় মহিলার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিয়াছিলাম। সমান বুদ্ধিমতী সমান বয়স্কা কোনো মহিলার সঙ্গে হাঁটিয়া গেলে এমন মনে হইবে কি যে, এই মুহূর্তগুলি আমার সবচেয়ে প্রিয়; যেন আমরা সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে আছি! মনে হইবে কি যে, আমি কখনও মৃত্যুশোক অনুভব করি নাই! নিজেকে ক্ষুদ্রজীবী শিশুর মতো মনে হইবে কি যে, তাহার প্রিয়জনদের দেহে ক্ষুদ্র হস্ত পদের দ্বারা প্রবল আঘাত করিয়া জানাইতে চাহে—আমি আছি! ...."

মনে হয় ছায়া ক্রমশ মৃণালকান্তি সম্পর্কে হতাশ হচ্ছিল। মৃণালকান্তি ছিল প্রায় বেকার। কোনো এক ছোট্ট প্রকাশকের দোকানে সে কিছুদিন কাজ করেছিল। মাঝে মাঝে বইয়ের প্যাকেট বয়ে নিয়ে তাকে এখানে ওখানে পৌঁছে দিতে হত। কিন্তু খুব গরিব সে ছিল না। তার বাবার জমানো কিছু টাকা সে পেয়েছিল, ভাইবোন না থাকাতে পাকিস্তানের জমিজমা বিক্রি করে কিছু টাকার নিরঙ্কুশ মালিকানা সে পেয়েছিল। এইসব বন্দোবস্ত তার মা মৃত্যুর আগেই তার জন্য করে যান। নইলে ষাট টাকা মাইনে পেয়ে বেনেটোলা লেন-এর যে ঘরটা ভাড়া করে সে থাকত তার ত্রিশ টাকা ভাড়া দিয়ে দিলে পাইস হোটেল, সিগারেট এবং প্রতিদিনের পয়সা তার থাকত না। মৃণালকান্তি বেহিসেবি ছিল না, কিন্তু সম্ভবত ছায়া চাইত—বিয়ের পর মৃণালকান্তি তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলুক, এবং দোকানের শোকেসে সাজানো কিছু কিছু জিনিসপত্র মৃণালকান্তির ঘরে থাক। বিয়ে করার কথা ছায়া এত বেশি ভেবেছিল যে, একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অন্ধকারে মুখ রেখে বলে, "আমি চাই তুমি এমন কোনো কাজ করো যাতে আমাকে ছেড়ে তোমাকে অনেকদিনের জন্যে দূরে চলে যেতে হয়। আমি বেশ তোমার অপেক্ষায় থাকব।" অন্যদিন শিয়ালদায় ট্রেন লেট আছে জেনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে বলেছিল, "অফিস থেকে ফিরে এলে পিছু পিছু অফিসের পিয়ন ফাইল নিয়ে আসে —দেখতে আমার বেশ লাগে।"

মৃণালকান্তি ছায়াকে কখনও খুব দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, ছায়া রাজি হয়নি। মনে হয় নানা পরিবেশে সে ছায়াকে দেখতে চাইত। কী দেখতে চাইত মৃণালকান্তি! ঠিক কী চাইত তা আমি জানি না, তবে তার আত্মজীবনীর কোনো এক জায়গায় আমি পড়েছিলাম, একদিন লিন্ডসে স্ট্রিটের এক দোকানের পাশ দিয়ে

যেতে যেতে কাচের শো-কেসে একটা মেয়ের 'ডামি' দেখে মুখটা খুব পরিচিত মনে হওয়ায় সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে লিখেছে "ইহাকে আমি কোথায় দেখিয়াছি! এইরূপ প্রাণহীন প্রস্তরবৎ মূর্তি নয়, আমি অবশ্যই ইহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি, ইহাকে হাসিতে ও কথা বলিতে দেখিয়াছি। ইহাকে আমি বিষাদগ্রস্ত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না। এমন মাঝে মাঝে হয়। গতকালের কথা কতবার ভুলিয়া গিয়াছি। স্টেটবাসে কে আমার পাশে বসিয়াছিল—তাহার মুখ দেখি নাই, কন্ডাকটরের হাতে পয়সা গুনিয়া দিয়া টিকিট লইয়াছি—কই কোনো কন্ডাকটরের মুখ তো মনে পড়ে না! মনে হয় কতকাল মানুষের সহিত আমি কিছুই বিনিময় করি নাই।" তারপর মৃণালকান্তি লিখছে, "মনে হয় এই মুখে কোথাও বিষণ্ণতা ছিল। দীর্ঘকাল কাচের আবরণে ঢাকা থাকিতে থাকিতে সেই আবরণ ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার ইচ্ছা জন্মায় নাই বলিয়া কি এই বিষাদ! মনে পড়ে যাহাদের মুখে বিষণ্ণতা ছিল না তাহাদের সহিত কখনও আমার বন্ধুত্ব হয় নাই। বোধকরি সেইজন্যই সুবলের মুখ আমি ভুলিয়া যাই নাই।" এরপর মৃণালকান্তি সুবলের কথা অনেকটা লিখেছে। সুবল চমৎকার গল্প বলতে পারত। স্কুলে অনেকে সুবলকে ঘিরে বসে গল্প শুনত। বলতে বলতে সে ইচ্ছেমতো গল্পটাকে বড়ো কিংবা ছোটো করতে পারত, বদলে দিতে পারত, গল্পটা যেদিকে যাচ্ছিল ঠিক তার উলটোদিকে নিয়ে যেতে পারত। তার গল্প শুনে সবচেয়ে যে বেশি মুগ্ধ হয়ে যেত সে ছিল মৃণালকান্তি। সুবলের গায়ে নানা জায়গায় কতগুলি দীর্ঘস্থায়ী ঘা ছিল—যা কখনও শুকোত না ; মাঝে মাঝে ঘা বেয়ে রক্ত পড়ত, প্রায়ই খোস পাঁচড়ায় ভুগত সুবল, এবং কাছ থেকে কথা বললে সুবলের মুখ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ পাওয়া যেত। মৃণালকান্তি তাকে ঘেন্না করত। সেই সুবল একবার তার ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। মৃণালকান্তি লিখছে, "সহসা আমার ভিতরে সে কী সঞ্চার করিয়াছিল! চকিত বিস্ফোরণের আলোয় আমি কী দেখিতে পাইয়াছিলাম! মনে পড়ে না। সুবলকে দেখিতাম—স্কুলের সিঁড়িতে সে একা বসিয়া আছে, গ্রাম্য মেঠো পথ দিয়া একা একা ফিরিতেছে। আমি আর তাহার কাছে যাই নাই।" দীর্ঘদিন—প্রায় আঠারো-উনিশ বছর পর সুবলকে সে আবার দেখেছিল, কলকাতায় সিনেমা হলের কর্মীরা মিছিল বের করলে সেই মিছিলে সুবলের মুখ চকিতে ভেসে যাচ্ছিল। সুবল কোনো সিনেমা হলে 'গেটকিপার' হয়েছিল। সে লিখছে "একদা ছেলেবেলায় মুখোমুখি হইয়া সহসা শূন্য বোধ করিলে যাহা আমরা করিয়াছিলাম তাহার স্মৃতি আমাকে গভীর আহত করিল। আজ আবার দেখা হইলে আমরা পরস্পর কী বিনিময় করিব! কিন্তু এতদিন পর সুবলকে আমি পুনরায় হাজার লোকের মিছিল হইতে চিনিয়া বাহির করিয়াছি। আমি কী দেখিয়াছিলাম! মনে হয় সুবলের মুখের সেই বিষাদ কখনও পালটায় নাই, মনে হয় একাকী, কিংবা বহুজনের সঙ্গে মিলিয়া বরাবরই সুবলের কী একটা কথা বলিবার ছিল—ছেলেবেলায় তাহার গল্পের ভিতর দিয়া, চুম্বনের ভিতর দিয়া, শেষ যৌবনে আর্ত শ্লোগান ও উৎক্ষিপ্ত বাহুর ভিতর দিয়া সে সেই কথাই বলিয়া চলিয়াছে। আমি তাহাকে ঠিক চিনিয়াছিলাম। দেখা হইলে আজ আমরা পুনরায় চুম্বন না বিষণ্ণতা বিনিময় করিব! ভিড়ের ভিতরে আত্মগোপন করিতে করিতে আমার মনে হইল আজ আমি পুনরায় সুবলকে ভালোবাসিতে পারিতেছি।"

তেমন করে মৃণালকান্তিকে ছায়ার কিছু বলবার ছিল কি? যতদূর জানি বিষণ্ণতা ছায়ার ভিতর কোথাও ছিল না। বিভিন্ন চুম্বনের আলাদা আস্বাদ মৃণালকান্তি টের পেত কিনা আমি জানি না। সুবলের কথা শেষ করে মৃণালকান্তি লিখছে, "কিন্তু বাস্তবিক ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—এই ডামির মুখের আনন্দ বা বিষাদ কিছুই নাই। প্রাণহীনতা আছে মাত্র। এই প্রতিমার মতো মুখের সহিত অলৌকিক চিত্ত-বিনিময় সম্ভব নহে। দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের বাজনায় কেবল ইহার তাৎক্ষণিক বিষণ্ণতা ধ্বনিত হয়।"

মনে হয় ছায়ার ভিতর তবু কিছু খুঁজে পেয়েছিল মৃণালকান্তি যা তার ডামির মুখের বিষণ্ণতার মতো তাৎক্ষণিক। মৃণালকান্তির আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি কোনো শনিবার ময়দান থেকে বেরিয়ে ফিরবার পথে বৃষ্টি নামলে ছায়া ওর আগে আগে দ্রুত হাঁটছিল। ছায়া কোনো 'শেড' খুঁজছিল—মৃণালকান্তি ওকে দাঁড়াতে দিল না। ওরা সাবধানে হাঁটছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছিল। ছায়ার শাড়ির কলপ ভিজে গিয়ে

শাড়িটা ওর রোগা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ওকে দেখাচ্ছিল হঠাৎ চোপসানো, ভেজা একটা চড়াই পাখির মতো। ময়ূর তার পেখম গুটিয়ে নিলে হঠাৎ তার পিছনে যে শূন্যতা দেখা দেয়—মৃণালকান্তি লিখছে, "ছায়ার সম্মুখে সেইরূপ শূন্যতার ভিতর দিয়া দেখা গেল একজন ট্রাফিক পুলিশ একটা কানা ভিখিরির ছেলেকে হাত ধরিয়া রাস্তা পার করিয়া দিতেছে। ছায়া এইসব কিছুই দেখিল না। দেখিল না তাহার সম্মুখে ক্ষণস্থায়ী সেই কম্পমান দৃশ্যের পশ্চাদভূমিতে তাহার ঘাড়ের তিনটা হাড় উঁচু হইয়া আছে, চূর্ণ চুলের উপর জলের ফোঁটার উপর সহসা প্রলয় প্রতিভাত হইতেছে। আমি মনে মনে তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম—এখন তোমার চতুর চোখ আমার দিকে ফিরাইও না, সোজা হাঁটিয়া যাও—আমি তোমার পিছনে এইরূপে শাশ্বতকাল হাঁটিতে থাকিব। কিন্তু কোথায় যেন বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছিল। ছায়া মুখ ফিরাইয়া আমাকে কী বলিতেছিল—আমি শুনি নাই। শুধু চূর্ণ দৃশ্যের উপর, জলে প্রতিভাত বিম্বের উপর হইতে ডামির মুখের ক্ষণস্থায়ী বিষণ্ণতা ভাটার টানে নামিয়া যাইতেছিল।"

সেই রাতে ফিরে এসে মৃণালকান্তি লিখেছিল, "আমার বাবা সুধাকর হালদার ছিলেন দারোগা। তাঁহার মফসসল ভ্রমণের জন্য একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়া ছিল। আমি একটু বড়ো হইলে আমার রোগা রোগা হাত পায়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল খুব শক্ত সমর্থ হইয়া গড়িয়া না উঠিলে তাঁহার পুত্র মৃণালকান্তি জীবনে এমনকি দারোগাও হইতে পারিবে না। তাই আমার ভিতরে প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য আমাকে একদিন সেই ঘোড়ায় সওয়ার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মনে পড়ে আমি ভয়ে অনেক চিৎকার ও কান্নাকাটি করিয়াছিলাম। অবশেষে ঘোড়াটা আমাকে এক মাঠের ভিতরে আনিয়া পিঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। অনেক বড়ো হওয়ার পরও সেই দুঃস্বপ্নকে আমি ভুলিয়া যাই নাই। অনেকবার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়াছে। মনে হয় জাগরণেও সেই পতনের অনুভূতি আমাকে কখনও ঝাঁকি দিয়া যায়। সংশয় হয় আমি শাশ্বতকাল একটিমাত্র ঘোড়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি না তো!" তারপর সুধাকর হালদারের কথা লিখতে গিয়ে মৃণালকান্তি দীর্ঘ বর্ণনা করেছিল। শেষে সে লিখছে, "...তখনও আমি ছোটো, মফসসল হইতে ঘোড়ার পিঠে একা ফিরিবার পথে কাহারা মাছের জাল ছুঁড়িয়া তাঁহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং সেইখানেই লাঠিপেটা করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। বনতলীর নির্জন মাঠের ভিতর সেই গ্রাম্য দারোগা-হত্যার ঘটনাতেই সম্ভবত সুধাকর হালদার তাঁহার পুত্র মৃণালকান্তির অনুভূতিগুলি প্রথম ও শেষবারের মতো প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। মনে পড়ে মায়ের মৃত্যুতে তেমন ঘনঘটা কিছুই ছিল না। কলিকাতার এক ভাড়াটে বাড়িতে তাঁহার চেষ্টাহীন নিঃশব্দ মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বাড়িওয়ালাই কিছু লোকজন ডাকিয়া আনিয়াছিল। শোক না, বৈরাগ্যও না—বিরাট এক মিশ্র জনতার ভিতর দিয়া খোলা রাস্তায় উজ্জ্বল রৌদ্রে আমার রোগা ছোট্ট মায়ের মৃতদেহের অনুগমন করিয়া যাইতে আমার লজ্জা করিতেছিল। আমি কাহার জন্য শোক করিব, কাহাকে ভালোবাসিব! পৃথিবীর যে প্রকাণ্ড মিশ্র জনতার ভিতর আমি রহিয়াছি তাহাদের কয়জন জানে যে, একজন মৃণালকান্তির একজন মা ছিল এবং মৃণালকান্তির সেই রোগা, ছোট্ট, দুর্বল মা আর নাই!" মৃণালকান্তি লিখেছিল "নিজেকে এমন উদবাস্তু মনে হয় কেন! কখনও নিশ্চিতভাবে কেন বলিতে পারি না—আমি ভালোবাসি! ভালোবাসি না—এ কথাও সংশয়ে কতবার বলা হয় নাই!"

গড়িয়াহাটার দিকে কোথায় যেন মৃণালকান্তির সোনাকাকা গেঞ্জি ফিরি করে বেড়াত। তার এইরকম কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। বিধবা 'রাঙামাসি', বাবার খুড়তুতো ভাই সোনাকাকা, বড়োপিসি, গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশাই ইত্যাদি এবং যাদবপুর, টালিগঞ্জ, কসবা, মধ্যমগ্রাম কিংবা আরও দূরে তার আরও আত্মীয়রা ছিল। কখনও কারও সঙ্গে দেখা হলে আর কাউকে মনে পড়ত—তখন খেয়াল করে খোঁজ নিত, একদিন গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে আসবে বলে কথা দিত। প্রায়ই যাওয়া হয়নি। কখনও কারও অভাব শুনলে দু-পাঁচ টাকা সাহায্য পাঠিয়েছে, কখনও পাঠানো হয়নি। কলেজ স্ট্রিটে ছায়ার সঙ্গে

একদিন রাস্তা পার হতে গেলে কাঁধে গেঞ্জির বোঝা নিয়ে সোনাকাকা পথ আটকাল—দু-জনকে একসঙ্গে দেখেও। আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সোনাকাকা, "বিয়া করস নাই!" মৃণালকান্তি লিখছে, "সোনাকাকাকে কষ্টে চিনিতে পারিয়া আমি সিগারেট ফেলিয়া দিলাম। তবে কি আমি আস্তে আস্তে প্রিয়জনদের মুখগুলি ভুলিয়া যাইতেছি! মনে পড়ে হাওড়া স্টেশনে একজন তাহার বিড়ি ধরাইতে আমার সিগারেটটা চাহিয়া লইয়াছিল। কেমন সন্দেহ হওয়ায় আমি আর সিগারেটটা ফেরৎ না লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। মনে হইল, ইহাকে আমি কখনও জ্যাঠা বলিয়া ডাকিতাম কি! আত্মীয়দের মুখ ক্রমশ ভুলিতেছি। 'রাঙামাসি'র মুখ মনে পড়ে না। কবে যে বড়োপিসি আমাকে বলিয়াছিল "মনু, বাইরে চলাফিরা কর, একখান পঞ্জিকা রাখছ তো!" ছায়া কী ভাবিল জানি না। সে আমাকে কিছু বলে নাই। আমি পকেটে হাত দিতে গেলে সোনাকাকা আমার হাত আটকাইল "মনু, তরেই তো আমার দ্যাওনের কথা।" তাহার পর ছায়ার সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটিয়া গেলাম। মনে পড়ে না কোনোদিন আমার মানুষকে ভালোবাসিবার সর্বব্যাপী সাধ হইয়াছিল কিনা।"

অন্য একদিনের কথা মৃণালকান্তি লিখেছিল। দুপুরবেলায় এসপ্ল্যানেডে একটা ফাঁকা রেস্তোরাঁয় সে বসে ছিল। সেটা একটা মাদ্রাজি রেস্তোরাঁ। কিছুক্ষণ আগে সে দ্বিতীয়বার স্টেনলেস স্টিলের কাপ থেকে গরম চা খেয়েছে। তার ঠোঁট জ্বলছিল। বাইরে সবকিছুই খুব আলোকিত, উত্তপ্ত এবং ছায়াহীন। রেস্তোরাঁর ভিতরটা অনেক ঠান্ডা এবং নির্জন। সে লিখছে, "যেখানে বসিয়া আমি আমার নোট লিখিতেছি সেখান হইতে রাস্তা, ময়দান, মনুমেন্ট সবই দেখা যায়। স্টেটবাসগুলি রাস্তা গিলিতে গিলিতে যাইতেছে। আমি রাস্তায় পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি। জুন মাসের দুপুর বলিয়া রাস্তায় লোকজন কম। হঠাৎ তাকাইলে—আমি সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে আছি—এমন মনে হয়। এমন মুহূর্তগুলি আমার এত প্রিয়—যেন সবকিছুই আমাকে স্পর্শ করিয়া আছে। এমন সব মুহূর্ত হইতেই আমরা নূতন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করি। পাশের টেবিল হইতে দুজন ব্যবসায়ী উঠিয়া গেলে চর্বির পাহাড় গলায় থাক-থাক গলকম্বলওয়ালা এক পাঞ্জাবি আসিয়া বসিল। আধ খোলা ঘুমচোখে সে আমাকে লিখিতে দেখিতেছে। কী লিখিতেছি আমি! এই মুহূর্তেই যেন মনে হইতেছে কাহারা আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া চিরতরে চলিয়া গিয়াছে।"

"একশত বৎসর একটানা ঘুমাইবার পর সহসা জাগিয়া উঠিয়া আমি পরিচিত লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। কী বলিয়া আত্মপরিচয় দিব! আমি কাহার সন্তান! আমি বিশেষ কাহারও কী? ওই পর্বতাকার পাঞ্জাবিটার সন্তান আমি হইলাম না কেন? আমি গাছ হই নাই কেন; আমি মাছ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই বা কাহার কী ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল! পরিচিত বৃত্তের বাহিরে নিজেকে আত্মপরিচয়হীন, নামগোত্রহীন বোধ হইলে ভাবিয়া দেখি আমার মুখ কাহারও মনে আছে কি! একশত বৎসর পূর্বে কবে দেখিয়াছিলাম সোনাকাকা গড়িয়াহাটার মোড় হইতে গেঞ্জি হাঁকিতে হাঁকিতে ভিড়ের ভিতর পথ চিনিয়া চলিয়াছে। ছায়াকে মনে পড়ে না! সহসা সুবলের মুখ একশত বৎসর পার হইতে হইতে বিস্ফোরিত হয়। মনে হয় অনেক মৃত মানুষ আমাদের জীবিত মানুষদের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া বে-আইনিভাবে বসবাস করিতেছে।"

মৃণালকান্তি একদিন ছায়াকে ট্রেনে তুলে দিলে ট্রেন প্ল্যাটফর্মের আলো থেকে বাইরের অন্ধকারের দিকে সরে যাচ্ছিল। জানালায় মুখ রেখে হাত বাড়িয়ে ছায়া রুমাল নাড়তে—সেই ছোট্ট সাদা দোমড়ানো রুমাল অন্ধকার থেকে ফুলের মতো ছিটকে ছিটকে আসছিল। মৃণালকান্তি লিখছে, "মনে হয় আমাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছায়া তাহার শাড়ি, তাহার মুখ, তাহার অবয়ব ট্রেনের জানালায় একটি ব্রাকেটে টাঙাইয়া রাখিয়া নিজে কামরার ভিতরে কোথাও সরিয়া গিয়া বসিয়াছে। ট্রেন তাহার আলো ও ছায়া পর্যায়ক্রমে আমার শরীরের উপর হইতে তুলিয়া লইলে, সহসা শূন্য দিগন্তপ্রসারী রেলদ্বয়ের দিকে চাহিয়া সন্দেহ হয় আমাকে কি কোনোদিনই কিছু স্পর্শ করে নাই! খুব তীব্র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কিংবা কোনো বোধ আমি অনুভব করি নাই! আমি কখনও খুব আনন্দিত বা ক্রুদ্ধ হই নাই কেন! আমি আমার হস্তপদগুলি বিপথগামী করিয়া সহসা নৃত্যে উদবাহু হই নাই।"

মৃণালকান্তির আত্মজীবনী আমি যতটুকু পড়েছি তা লক্ষ করলে দেখা যায় সে খুব স্বাভাবিক মানুষ ছিল না। মনে আছে সে একদিন গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, "জানো রোগা লোকেরা নিজেকে বড্ড বেশি টের পায়! দেখো, খুব শিগগিরই আমার অসুখ হবে।" তার বেনেটোলা লেন-এর ঘরে আমি মাঝে মাঝে যেতাম। কখনও দেখেছি মৃণালকান্তি ইঁদুর আরশোলা কিংবা পিঁপড়েদের চলাফেরা লক্ষ করছে। কখনও তাকে আমার খুব অচেনা মনে হত, কখনও মনে হত সে নিজেকে বড় বেশি টের পাচ্ছে। তার আত্মজীবনীর সর্বশেষ যে-ঘটনাটি আমি পড়েছিলাম তাতে মৃণালকান্তি লিখেছে... "কত তুচ্ছ মনে হয় যখন ভাবি ঘটনাটা ঘটিয়াছিল একটি আরশোলাকে লইয়া। সিঁড়ির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিয়া আরশোলাটা মরিতেছিল। তাহার প্রবীণ দেহের চারিপাশে তুলনায় বিশাল বিস্তৃত সেই সিঁড়ির উপর তাহার দেহলগ্ন ছায়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।" আরশোলার কথা মৃণালকান্তি অনেকটা লিখেছিল। লিখেছিল, "মৃত্যু মাত্রই আত্মীয়হীন, স্বজনহীন। মৃত্যুতে কোনো সহগামী নাই। তাহার সেই অর্বাচীন শরীরকে ঘিরিয়া মুহূর্তের জন্য আমার চোখের সামনে ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জের আর্চ-এর মতো অর্ধবৃত্তাকার ছড়ানো তারাগুলি দুলিয়া গেল কি! মনে হয় তাহার তুচ্ছ মৃত্যুর নিকট আমাদের সম্মিলিত বাঁচিয়া থাকা নগণ্য মাত্র। ভালোবাসার, ইচ্ছার, লোভের মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়া অকস্মাৎ বৈজ্ঞানিক মহৎ শূন্যতার ভিতরে সে অগ্রসর হইতেছিল।" মৃণালকান্তির পাশে রেস্তোরাঁর সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছায়া কথা বলছিল। মৃণালকান্তি লিখছে যে, ছায়া তখনও বলছিল, "কাল ছাত্রীর মা আমাকে একটা খাম দিল। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখি পঞ্চাশ। আমার কিন্তু চল্লিশ পাওয়ার কথা। ভাবছিলাম ..." মৃণালকান্তি লিখছে, "দেখিতেছিলাম ছায়ার স্যান্ডেল-পরা পা গোড়ালির উপর ভর করিয়া দুলিতেছে। ছায়া কথা বলিতেছে—আমি কি তাহাকে চুপ করিতে বলিব! আমি কি সকলকেই চুপ করিতে বলিব! জানি কথা শেষ করিয়া হাসির বেগে যখন সে ঝুঁকিবে তখনি ছায়ার পা আরশোলাটার উপর নামিয়া আসিবে। বলিব কী পা সরাইয়া লও। ভাবিতেছি—আমার কী হইয়াছিল! এত তুচ্ছ কথা বলার অর্থ নাই। বলিলেও ছায়া আমাকে পাগল ভাবিবে। কিন্তু আরশোলাটা অপেক্ষা করিতেছে। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর হইতে কোনো কোনো নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল—এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই—সে সেই দিকে চাহিয়া আছে।" তারপর ছায়া বলছিল, "বুঝলাম ছাত্রী থার্ড হয়েছে বলে এটি আমার ইনক্রিমেন্ট..." ছায়া হাসতে যাচ্ছিল—সেই হাসির আভাস হাসি আসবার আগেই তার মুখে চোখে খেলে যেতে চকিতে—মৃণালকান্তি লিখছে..."আমি আমার সর্বস্ব দিয়া বলিতে চাহিলাম—না। সরিয়া দাঁড়াও। আমি দুই হাত বাড়াইয়া সহসা শূন্য বোধ করিয়াছিলাম। সহসা আয়নায় চিড় ধরিবার শব্দ হইল। আমার প্রসারিত হাতে কেন্দ্রবিচ্যুত ছায়া বৃষ্টিতে ভিজা সিঁড়ির ফুটপাথে গড়াইয়া গেল। আমি কি ছায়াকে ধাক্কা দিয়াছিলাম! জানি না।" ভিড় জমে যাওয়ার আগেই আস্তে আস্তে ছায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। কোনো কথাই বলেনি ছায়া, আঙুল তুলে মৃণালকান্তির দিকে স্থাপনও করেনি। সে চলে গিয়েছিল। আর আসেনি। মৃণালকান্তি লিখছে, "সে আর আসিবে না জানিয়া তাহাকে আমার সেই মুহূর্তে বড়ো প্রিয় বোধ হইল। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিলাম।"

চারুলালের আত্মহত্যা

ট্রাম থেকে হিরণ দেখল প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে ফুটপাথ দিয়ে চারুলাল উত্তরমুখো হেঁটে যাচ্ছে। হাতে একরাশ বই, চুল উস্কোখুস্কো। এতদূর থেকেও বোঝা যায় চারুলালের হ্যান্ডলুমের গেরুয়া পাঞ্জাবি বড়ো ময়লা হয়ে গেছে। চারুলালের কাছে পাঁচটা টাকা পাওনা ছিল—হঠাৎ মনে পড়ায় হিরণ হাত নেড়ে 'চারু' বলে ডাকল। চারুলাল শুনতে পেল না লক্ষ করে হিরণ তাড়াহুড়ো করে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল।

নেমে খেয়াল হল যে, তার ট্রামের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল। এসপ্লানেডের টিকিট। এখন যদি চারুলালকে না পাওয়া যায় তবে আর একবার টিকিট কাটতে হতে পারে। কিংবা সে দ্বিতীয়বার যদি টিকিট না কাটে এবং পরবর্তী কোনো ট্রামের কন্ডাক্টর যদি ভদ্র ও অন্যমনস্ক হয় তবে সে একবার ভাড়া দিয়ে এসপ্লানেড না গিয়ে অন্যবার ভাড়া না দিয়ে গিয়ে এসপ্লানেডে পৌঁছুতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হিরণ হাততুলে একটা ধীরগতি ফিয়াট গাড়িকে দাঁড় করিয়ে তার সামনে দিয়েই রাস্তা পার হল এবং যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে ভিড় ঠেলে চারুলালের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল। সে হ্যারিসন রোড পার হল এবং কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ডাবপট্টি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। হিরণ একটু বেঁটে, ভিড়ের গড়পড়তা উচ্চতাকে অতিক্রম করে চারুলালের মাথা কিংবা পাঞ্জাবির অংশ কোথাও দেখতে পেল না। তাছাড়া চারুলাল যে সহজ সোজা পথে যাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না—কেননা চারুলাল কবি, অন্যমনস্ক, অমিতব্যয়ী ও বিপথগামী।

হতাশ হিরণ একটু দীর্ঘতর শ্বাস ছাড়ল। হাতের টিকিটটার দিকে চেয়ে সে আর একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এ কথা ঠিক যে তার চিন্তাভাবনা সবসময়েই অর্থনীতির ধার ঘেঁষে যায়। এখন তাকে একজন ভদ্র ও অন্যমনস্ক ট্রাম-কন্ডাক্টর খুঁজে বের করতে হবে। অথচ ব্যাপারটা ঠিক আইনমাফিক হবে না। হাতের ট্রামের টিকিটটা ক্রমশ তার অর্থনৈতিক চিন্তাকে উজ্জীবিত করে। সে ভেবে দেখছিল এসব ক্ষেত্রে কন্ডাক্টরের কাছে 'জার্নি ইনকমপ্লিট' লেখা কোনো স্ট্যাম্প থাকলে সে ভদ্রভাবে এবং আইনমাফিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারত।

যে স্টপেজে নেমেছিল আবার সে স্টপেজের দিকেই ফিরে আসছিল হিরণ। পুরোনো বইয়ের দোকানের ধার ঘেঁষে, ফড়ে, দোকানি, ছাত্রছাত্রীর ভিড়ের ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মতো দ্রুত গর্ত খুঁড়ে এগোতে গিয়ে সে লক্ষ করল কলেজ স্ট্রিটে মন্থর একটি ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হচ্ছে। 'ধুত্তোর' বলে ট্রাম-বাস থেকে নেমে পড়ছে লোক। 'শালার মিছিল'—হিরণের প্রায় কান ঘেঁষে একজন চলতি মানুষ বলে গেল।

হিরণ মিছিল ভালোবাসে না, আবার বাসেও। সে লক্ষ করল উত্তর দিকে কলেজ স্ট্রিট হয়ে মাঝারি এক মিছিল সামনে লাল সালুর উপর রূপালি লেখা ভাসিয়ে দক্ষিণমুখো আসছে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য এসপ্লানেডের ট্রামবাস বন্ধ। মন্দ নয়। হিরণ ভেবে দেখল মিছিলের সঙ্গ ধরলে সে দ্বিতীয় বারের ট্রামভাড়া সঞ্চয় করতে পারে এবং এসপ্লানেড পর্যন্ত এতটা পথ গোলেমালে কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তার আর দরকার হল না। কেননা সে দেখতে পেল চারুলাল উলটো-দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। 'চারু' বলে চিৎকার করে হিরণ হাত নাড়ল এবং থেমে-থাকা গাড়ি ও ট্রামগুলি অতিক্রম করে সে দেখল মিছিলটা ধীরগতিতে চারু আর তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। চারু মিছিল দেখছে। 'চারু' বলে আবার ডাকল হিরণ, আর সেই মুহূর্তে মিছিলের উন্মত্ত শ্লোগান......'চাই' ধ্বনিতে শেষ হলে হিরণ দেখল 'চারু' ও 'চাই' দুটি শব্দ মিলে মিশে 'চাইরু' গোছের একটা শব্দ ধ্বনিত হল। 'চাইরু' শব্দটা বিস্মিত হিরণ আপন মনে উচ্চারণ করল। কিমিদং! এর অর্থ কী! ভাবল সে। সে চারুকে আর ডাকল না, মিছিলটাকে চলে যেতে দিল। তার চারুলালকে নিয়ে ভাবনা হচ্ছিল। কেন না চারুলাল ইতিমধ্যে পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ যে-কোনো দিকে খামোকা রওনা হয়ে পড়তে পারে। কেননা ইতিপূর্বে সে

চারুলালকে উত্তর দিকে যেতে দেখেছিল, এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে, সে আবার দক্ষিণ দিকে উজিয়ে এসেছে। চারুলালের চলাফেরার মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই। কোনো লক্ষ্যে পৌঁছুবার একমুখিনতা নেই। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাস্তবিক মিছিলটা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল চারুলাল যথাস্থানে নেই। পুলিশের কালো গাড়িটা কয়েক মুহূর্তের আড়াল তৈরি করেছিল এবং সেটুকু সময়েই অস্থিরমনস্ক চারুলাল মত পরিবর্তন করেছে।

রাস্তা পার হয়ে হিরণ হতাশ হল। কেননা হিরণ কয়েক মুহূর্তের চিন্তায় ঠিক করে নিয়েছিল সে চারুলালকে পেলে জিজ্ঞেস করবে বাংলা অভিধানে 'চাইরু' বলে কোনো শব্দ পাওয়া যায় কিনা এবং পাওয়া গেলে তার অর্থ কী। কেননা শব্দ সঞ্চয় করা চারুলালের স্বভাব এবং এইসব নিয়ে আলোচনা করাও তার প্রিয়। হিরণ ঠিক করেছিল শব্দ নিয়ে আলোচনা ক্রমশ জমে উঠলে সে একসময়ে আকস্মিকভাবে হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে পাওনা টাকাটার কথাও বলে ফেলতে পারবে। কিন্তু আপাতত চারুলালকে একটা সমস্যার মতো মনে হচ্ছে।

হিরণ কফিহাউসের মোড় থেকে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের লাল ডাকবাক্সটা পর্যন্ত এবং লাল ডাকবাক্সটা থেকে কফিহাউসের মোড় পর্যন্ত মানুষের জঙ্গল ভেদ করে চারুলালকে বারকয়েক খুঁজে দেখল। অবশেষে হতাশ হয়ে আবার ট্রাম স্টপেজে দাঁড়াল হিরণ।

মানুষের চলাফেরার মধ্যে একটা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলে হিরণ খুশি হয়। এমন মানুষকে ধরা ছোঁয়া বোঝা সহজ। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন কোনো মানুষের সারাদিনকার চলাফেরার একটা ম্যাপ যদি আঁকা যায় এবং চারুলালের সারাদিনের চলাফেরার আর একটি ম্যাপ যদি আঁকা হয় তা হলে দুই রকম মানুষের উদ্দেশ্যে ও উদ্দেশ্যহীনতার একটা বাস্তব তফাত পাওয়া যেতে পারে। মনে মনে চারুলালের সম্ভাব্য গতিবিধির একটা ম্যাপ ছকে ফেলবার চেষ্টা করে দেখল হিরণ। কিন্তু ম্যাপটা ক্রমশ তার মনে নানাবিধ বক্র ও অর্ধবৃত্তাকার রেখায় এমন জটিল অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ ধারণ করল যে, সে ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিল, সহজ অন্য কিছু ভেবে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। এ কথা ঠিক যে, চারুলাল কিংবা চারুলালের মতো মানুষগুলিকে হিরণ বোঝে না। তবে চারুলাল কিংবা চারুলালের মতো মানুষগুলি কি উদ্দেশ্য নিয়ে জটিল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট বক্ররেখাগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এই জটিল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট রেখাগুলিকে হিরণ বোঝে না। হিরণ ভাবতে ভাবতে হাতে তখনও ধরে থাকা ট্রামের টিকিটটার দিকে তাকাল । সে এসপ্লানেডে যায়নি অথচ তার হাতে এসপ্লানেডের এই টিকিটটা বাতিল হয়ে গেল। এই অব্যবহৃত-উপযোগ সরবরাহে অক্ষম টিকিটটা তার কোন কাজে লাগবে? যদিও ব্যাপারটি দুর্বোধ্য তবু অস্পষ্টভাবে তার মনে পড়ল একদিন কফিহাউসে চারুলাল বাড়তি কাগজ খুঁজে না পেয়ে এমন একটি ব্যবহৃত টিকিটের পিছনে তার কবিতার পয়েন্ট টুকে রাখছিল।

যতদূর মনে পড়ে কবিতাটার নাম চারুলাল দিয়েছিল 'শিল্পের কারণে আত্মহত্যা'। বাস্তবিক আলাদা আলাদা ভাবে ধরলে হিরণ শিল্প, কারণ ও আত্মহত্যা এই তিনটি শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। কিন্তু এই তিনটি শব্দের দ্বারা বাক্য গঠিত হলে সে 'চাইরু' শব্দটার যে জটিলতা তেমনি এক জটিলতার সম্মুখীন হয়। হিরণ বুঝে উঠতে পারে না শিল্পের কারণ ও আত্মহত্যার কারণ এক কিনা, কিংবা চারুলাল কি বোঝাতে চেয়েছে যে, শিল্প আত্মহত্যার এবং আত্মহত্যা শিল্পের কারণস্বরূপ!

চারুলালকে হিরণ বুঝে উঠতে পারে না। চারুলাল অদ্ভুত। একবার তারা দুজন 'নাইট শো' সিনেমা দেখে ফিরছিল। ফুটপাতে এক গাড়িবারান্দার তলায় জনা দশবারো লোক টান-টান হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখে চারুলাল বলল 'দাঁড়াও।' হিরণ ফিরে দেখল অত্যন্ত অন্যমনস্ক চারুলাল হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কোনো পোকামাকড় খুঁজছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার কি মনে হয় না যে এই লোকগুলো এখন প্রত্যেকেই ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখছে!' 'হতে পারে।' হিরণ হেসে জবাব দিল, 'তাতে কী?' খানিকটা যেন লজ্জা পেয়ে চারুলাল বলল, 'না, কিছু না। আমার মনে হল প্রতিবার পা ফেলে আমি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন

স্বপ্নগুলোকে মাড়িয়ে যাচ্ছি। অদ্ভুত! খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটেছিল তারা! একবার শুধু হিরণের অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছিল চারুলাল তাকে পিছন থেকে 'হিরণ' বলে ডাকল, পিছু ফিরে হিরণ দেখল চারুলাল অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে, তার দিকে চাইছে না, অস্ফুট স্বরে কিছু বলছিল চারুলাল : 'ব্যাবিলনে ...শূন্যোদ্যানে...স্বপ্নে...হিরণ কতবার গিয়েছি যে...স্বপ্নোদ্যানে ...শূন্যে...ব্যাবিলনে..!'

হিরণ অন্যমনস্কভাবে এইসব রহস্যের কিনারা করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় একজন লোক ভদ্রভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে গলা চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করল 'আজকের খেলার রেজাল্ট কী দাদা?' মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেয়ে লোকটার কথার উত্তরে অস্পষ্ট 'জানি না' বলেই সে ঘড়ি দেখল ছটা বেজে পাঁচ মিনিট। সাধারণত হিরণ উদ্দেশ্যহীনভাবে কোথাও বেড়িয়ে পড়ে না, কিন্তু এখন চারুলালের কথা বেশ কিছুক্ষণ ভাববার পর, তাকে এ কথা বেশ কষ্ট করে মনে করতে হল যে, সে কেন এসপ্লানেড যাচ্ছিল। মনে পড়ল গ্লোবের ছবিটা দেখবে বলে সে এসপ্লানেড যাচ্ছিল, হল-এর সামনে অমিয় তার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু এখন আর গিয়ে লাভ নেই! খেলার মাঠের ভিড় ট্রাম বাস বোঝাই হয়ে ফিরছে! ইস্টবেঙ্গল এক গোলে জিতেছে—চিৎকার শুনতে পেল হিরণ। ট্রাফিক জ্যাম, মিছিল, খেলার ভিড়—এ সব কিছুর মধ্যে স্বপ্নাবিষ্ট চারুলাল কোথায় থাকতে পারে ভেবে না পেয়ে হিরণ ধীরে ধীরে অনেকদিন পর গোলদিঘির দিকে চলল।

চারুলাল সম্পর্কে কী একটা শেষ কথা জানবার ছিল হিরণের। এখনও জানা যায়নি। কিংবা কে জানে, হয়তো চারুলালকে জানবার ও বোঝবার মতো শক্তি হিরণের কোনোদিন ছিল না। তার আজ হঠাৎ মনে হল অনেকদিন থেকেই সে চারুলালকে একটু অবহেলা করে এসেছে। দুঃখ হচ্ছিল চারুলালের জন্য। সে ট্রাম থেকেও দেখতে পেয়েছিল যে, চারুলালের পাঞ্জাবিটা বড়ো ময়লা হয়ে গেছে; মনে পড়ল, চারুলাল বড়ো আস্তে আস্তে হাঁটছিল। একমুহূর্তের জন্য হিরণ চারুলালের প্রতি গোপন ও তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করল। ব্যবিলনে... শূন্যে ..স্বপ্নোদ্যানে.. কোথায় যেন যেতে চায় চারুলাল, হিরণ জানে না। অমন যাওয়ার ইচ্ছে হিরণের কখনও হয়নি। তাই সে কখনও বুঝতে পারে না চারুলালের কল্পনার মধ্যে কেন একটানা দুশো মাইল চড়ে এসে একটা শকুন হাওড়ার পুলের ওপর বসে, আর অন্যদিকে ইউনিকর্ন লাল ইমলি, লিপটনের নিয়নগুলি দপদপিয়ে ওঠে, মন্থর ট্রাফিক কলকাতায় ক্রমশই কঠিনতর জ্যাম-এর দিকে অগ্রসর হয়, কোনোকিছুতেই তার প্রয়োজন নেই বলে আবার হাওড়ায় ডানা ভাসিয়ে দেয় শকুন—গোপনে সে যেন কার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যায়। 'স্বপ্নের শকুন' নামক এই কবিতা হিরণ শুনেছে চারুলালকে খানিকটা বিখ্যাত করেছে।

গোলদিঘির ভিড় আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, হিরণ লক্ষ করল। সে বুঝল ফাঁকা কোনো বেঞ্চ পাওয়া অসম্ভব। সে আস্তে আস্তে লক্ষ রেখে এগোতে লাগল এবং ভাগ্যক্রমে একটা বেঞ্চেদুজন বুড়ো মানুষ এবং তাঁদের পাশে একটা খালি জায়গা দেখে অবিলম্বে ঝপ করে বসে পড়ল হিরণ। নানা অনভ্যস্ত শিল্পচিন্তায় তার মাথা ঘুরছিল। টের পেল পাশের দুই বুড়োমানুষ তার বসার ভঙ্গি ও ঘাড় হেলিয়ে দেওয়ার ঢং লক্ষ করছে। বুড়োমানুষদের সঙ্গী হিসেবে ভালো লাগে হিরণের। এঁরা অচেনা লোক পাশে এসে বসলে অসন্তুষ্ট হলেও উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন না। অন্য সময় হলে হিরণ এঁদের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করত। আজ করল না, কারণ তার মন অস্থির ছিল, ঠান্ডা বাতাস তার চোখে মুখে লাগছিল, ঘুম পাচ্ছিল হিরণের। সে চোখ বুজল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে নানা এলোমেলো স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

আধোঘুমের ভিতর সে শুনতে পেল পাশের বুড়োমানুষ দুজন অবিশ্রাম একঘেয়ে গলায় পূর্ববঙ্গের গল্প করে যাচ্ছে। সেখানে রোদ ছিল আলাদা, বর্ষা ও মেঘ ছিল আলাদা, ঋতুগুলি ছিল ভিন্নরকম। তরমুজের খেত ও কাশবন—কশাড়ের জঙ্গল, বালুচর ও ব্রতকথার সেই দেশ ছিল। কেমন সেই দেশ—উনিশশো চৌষট্টির সেপ্টেম্বরের কলকাতা থেকে আধোঘুমের ভিতরে সেই দেশকে বিদেশ বলে মনে হয়। খাঁড়ি দিয়ে বিলের জল বর্ষাশেষে নেমে যেতে থাকলে কাকামশাই চাঁদা মাছ ধরতেন, খাঁড়ির জলে ধারালো ইস্পাতের মতো ঝলসে উঠত রূপালি ইলিশ। যেন শরৎকাল ঘন হয়ে এসেছে, পাল খাটানো হয়েছে—দুলে দুলে

নৌকো চলেছে পূর্ববাংলার দিকে, স্মৃতি ও বিস্মৃতিময় দুটি নৌকা পাশাপাশি অনায়াস পাল তুলে উনিশশো চৌষট্টির কলকাতা ছেড়ে গেল। হিরণ রূপকথার মতো সেই গল্প শুনছিল।

তারপর ঘাড় কাত করে হিরণ অনেকক্ষণ আধোঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখল। মাটির উনুনের আঁচে ইলিশ মাছের ঝোল ফুটছে, রূপশালির ভাত ফুটছে ফুট ফুট। কাঠের উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ...আর দেখল উজান বিল, রাজহাঁস, কালকাসুন্দের ঝোপ ও জোনাকি পোকা। দেখল চারুলালের স্বপ্নের শকুন হাওড়ার ব্রিজ ছেড়ে গেল বুড়িগঙ্গা বিশালাক্ষীর ওপর, কশাড়বন ও কাশফুলের ওপর তার ছায়া বিস্তার করবে বলে। স্বপ্নের নৌকো ধীরে ধীরে দুলতে থাকে। ..হঠাৎ হিরণ চারুলালকে দেখছিল ইউনিভার্সিটির নতুন অন্ধকার উঁচু বাড়িটার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে—তড়িৎগতিতে অন্ধকার লিফট চালু করল চারুলাল—সশব্দ ইলেকট্রিকের তার চারুলালকে টেনে নিতে থাকে, হিরণ প্রাণপণে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে 'চারু চারু' বলে। স্তূপাকৃতি সিমেন্ট, কংক্রিটের থাম ও সিঁড়ি পেরিয়ে এই অকারণ আত্মহত্যাকে নিবারণ করতে চায় সে। কিন্তু দ্রুত ধাবমান 'এলিভেটর' চারুলালকে শকুনের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে। হিরণ দু-হাত তুলে বলতে থাকে, 'উদ্দেশ্য কী..তোমার উদ্দেশ্য কী চারুলাল? তুমি কত দূর যেতে চাও?' ধাবমান 'এলিভেটর' থেকে চারুলালের দূর গলার ধীর আবৃত্তি কানে আসে, 'কতবার গিয়েছি যে হিরণ,...স্বপ্নে...শূন্যোদ্যানে...ব্যবিলনে।' হিরণ অন্ধকারে বিম-কাঠের ঠেকা, কার্নিশ, জ্যামিতিক সিঁড়ি ও লিফটের খাঁচার অরণ্যকে লক্ষ করে হাল ছেড়ে দেয় হঠাৎ।

কিমিদং! এর অর্থ কী! হিরণ বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখল বেঞ্চটা খালি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে গড়িয়ে গেল। গোলদিঘির দক্ষিণ কোণে ভিড় জমেছে খুব। কিছু একটা হয়েছে ওখানে। হিরণ ভালোভাবে জেগে উঠে এইসব স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন ও চিন্তার সংমিশ্রণ পরিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করল। কেননা সে তার জীবনে কখনও শিল্পের জন্য আত্মহত্যার কথা ভাবেনি, স্বপ্নের শকুনের কথাও না। উদ্ভটের প্রতি কোনো মোহ ছিল না হিরণের, তবু কেন উদ্ভটই আজ তাড়া করে ফিরছে! তার ব্যাবিলন ছিল না, মধ্যাহ্নের ভূতের মতো জাগর স্বপ্ন ছিল না—তবু মনে হচ্ছে আজ চারুলালের ব্যাবিলন পিছু নিয়েছে তার। এ কি চারুলালের সম্মোহন প্রভাব—সে অনেকক্ষণ চারুলালের কথা ভেবেছে আজ—সেই জন্যে?

গোলদিঘির দক্ষিণ কোণে গোলমালটা বেড়ে চলেছে। হিরণ দেখে অনেক লোক ছুটে যাচ্ছে ওদিকে। দারুণ ভিড়। কী হতে পারে! হিরণ ভাবল। পরমুহূর্তেই অকারণে অন্যমনস্ক হয়ে গেল হিরণ। আলস্যের সঙ্গে সে ভেবে দেখল চারুলালের সঙ্গে তার তফাতটা কোথায়। দারুণ অভাব আছে চারুলালের সংসারে। চাকরিও খোঁজে চারুলাল—কিন্তু তেমন উৎসাহের সঙ্গে নয়। টিউশনি করে সে নিজের খরচ চালায়, গাঁটের ট্রামভাড়া খরচ করে নানা পত্রিকার অফিসে কবিতা ফিরি করে বেড়ায়, সংসারে কিছু দেয় চারুলাল—কিন্তু সে তেমন কিছু না। আর হিরণ বারো বছর বয়সে কলকাতার রাস্তায় একদিন ধূপকাঠি ফিরি করে বেড়াত, ওইভাবে কলকাতা চেনা হয় প্রথম উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে। ক্রমশ চিনতে পেরেছে সে পথঘাট ও চরিত্র। হিরণ এখন সংসার চালায়—সংসারের তরুণ অভিভাবক সে—তাকে আয়কর দিতে হয়। এখন লোককে ধারও দিতে পারে হিরণ। পথঘাট চরিত্র হিরণের চেনা হয়ে গেছে। তবে কেন খামোকা চারুলালের ব্যাবিলন তার পিছু নেয়, কেন স্বপ্নের শকুনের কথা ভাবতে গেল হরিণ?' 'দ্যাখো হে চারুলাল', হিরণ মনে মনে বলল, 'আমাকে আয়কর দিতে হয়। বেশিরভাগ অফিসবাড়ি, কারবারি ও দোকানদারদের আমার জানা হয়ে গেছে। আমি যতদূর বুঝতে পারি বুলডোজারের মুখে তৈরি হচ্ছে পৃথিবী—সাদামাটা আমার চিন্তা। কিন্তু তুমি একী তৈরি করছ চারুলাল—যা আমাকেও তাড়া করে দেখছি!'

বিষণ্ণ হিরণ বসে দেখল গোলদিঘির দক্ষিণ কোণটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। কিছু একটা হয়েছে ওখানে। কী হতে পারে! ভিড় দেখলে সাধারণত উৎসাহী হয় হিরণ—ভিড়ের কারণ খুঁজে দেখে। কিন্তু আজ তার উঠতে ইচ্ছে করল না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না হিরণ। চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর

উঠে পড়ল। ধীরে ধীরে সে ভিড়ের কাছেই এসে দাঁড়ায়। কথাবার্তা না বলেও সে বুঝতে পারে কে একজন জলে পড়েছে—এখন তাকে তোলা হচ্ছে।

জলের মধ্যে কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল হিরণ, জলের ধারে একজন 'বিট'-এর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ হিরণ দেখল জল থেকে কয়েকটা হাত একটা দেহকে ধরে তুলল। পুলিশটার পায়ের কাছেই শুইয়ে দিল তাকে। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে, হিরণের দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েও আবার ফিরে এল হিরণ। লোকটা চেনাও তো হতে পারে—কত লোককেই তো চেনে হিরণ—এই ভেবে সে ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে লাগল। রেলিঙের কাছে সে যখন এসে পৌঁছলো তখন লোকটাকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু যতদূর মনে হল লোকটা মারা গেছে—কাছাকাছি যারা ছিল তারা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছিল।

বাহকেরা হিরণের চোখের তলা দিয়ে স্ট্রেচারটা ধীরে ধীরে নিয়ে গেলে প্রথমটায় একবার চমকে উঠেই কাঠ হয়ে গেল হিরণ। চারুলালের চোখ খোলা ছিল না, তবু হিরণের মনে হল চারুলাল তাকে সারাক্ষণ দেখতে দেখতে গেল। এত কাছাকাছি ছিল চারুলাল! কিন্তু মুহূর্তেই পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হিরণ বুঝতে পারল এখন কোনো শব্দ করলে তার মুশকিল হবে। সে সাক্ষী থাকতে চায় না। নিঃশব্দে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল হিরণ। পুলিশ চারুলালের পরিচয় ঠিক খুঁজে বের করবে। আপাতত হিরণের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল—স্থির নিশ্চিতভাবে সে জেনে গেল যে, চারুলাল আত্মহত্যাই করেছে।

'কিন্তু এটা কেমন হল!' এটা কী হল হে চারুলাল,' মনে মনে বলল হিরণ, 'এমন তো কথা ছিল না হে!' হিরণ গভীরভাবে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আজ বিকেলে চারুলালকে দেখবার পর থেকে যেসব অকারণ চিন্তা হিরণকে পেয়ে বসেছিল, এখন হিরণ টের পেল এর কোনো অর্থ আছে। এই আত্মহত্যা নিশ্চিন্ত অকারণ—এর কোনো মানে নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এতদিনের মধ্যে কোনো দুর্ঘটনায় পড়েনি হিরণ—তার হাত -পা অটুট আছে, ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্মক্ষম আছে। এইজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সে শিল্পের কারণ ও আত্মহত্যার প্রয়োজন ও উপযোগ বোঝে না বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সম্ভবত এতটুকুই আসবার কথা ছিল চারুলালের, এর বেশি নয়। হাত-পা ইন্দ্রিয়গুলির মতো মৃত্যুও সহজাত—হিরণের একথা অজানা নয়। বেঁচে থাকলে চারুলালেরও মৃত্যু হত। সুতরাং চারুলাল নামক যে ব্যক্তিকে সে চিনত তার জন্য দুঃখ ছিল না হিরণের। তার পরিতাপ ছিল চারুলালের পরিকল্পনাহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা লক্ষ করে। নিয়তিকে কে ঠেকাতে পারে? 'কিন্তু চারুলাল', হিরণের ঠোঁট নড়ছিল, 'এ উচিত নয়। এ আইন ভঙ্গ করা।' কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই আইনভঙ্গের কোনো আসামি নেই।

বিষণ্ন হিরণ পথে পথে খানিকটা ঘুরল। ট্রামে উঠল, ট্রাম থেকে নেমে পড়ল হঠাৎ, সিগারেট ধরিয়েই ফেলে দিল। তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল নিওনের সাইন—বিনাকা-র বাচ্চা মেয়েটা হাসছে... লিপটনের কেটলি থেকে পতনশীল আলো...লুফৎহানসার উড়ন্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট হাঁসের চিহ্ন...হ্যান্ডলুম ফ্যাব্রিকস...ক্রয় করুন, ক্রয় করুন...সেল সেল। হিরণ ভেবে দেখল...আলো ও অন্ধকারময় এই যা আছে, পাপপুণ্যময়, ধর্মাধর্মময় এই যা আছে সবকিছুকেই বড়ো গোপনে ও নিঃশব্দে অবহেলা করে গেল চারুলাল। এইখানেই কি তার জিত? না কি এখানেও নয়! আরও দূর বহুদূর কোনো জায়গায় চারুলাল জিত রেখে গেছে, যেখানে অন্য কেউ কখনও নাগাল পাবে না! সেইখানে যা যা চেয়েছিল চারুলাল সবকিছু দু-হাত ভরে পেয়েছিল আর প্রয়োজন ছিল না বলেই কি চারুলাল অবশেষে সাঁতার না শেখার প্রয়োজন হিরণকে—একমাত্র হিরণকেই বুঝিয়ে দিয়ে গেল?

আরও খানিকক্ষণ পরিকল্পনাহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরল হিরণ। একটু রাত করে বাড়ি ফিরল এবং খুব তাড়াতাড়ি ঢাকা দেওয়া খাবারের সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। তড়িৎগতিতে অন্ধকার তাকে কামড়ে ধরল। বুঝতে পারছিল আজ রাতে তাকে অনিদ্রা-রোগ আক্রমণ করবে। মশারির সাদা আবছা চালের দিকে চেয়ে হিরণের হঠাৎ মনে পড়ল অনেকদিন আগে হিরণ একটা লোককে চিনত—তার ছিল

যক্ষ্মারোগ। কিন্তু সে কখনও রুগির মতো থাকেনি—কয়েকবার বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতাল থেকে সে পালিয়ে এসেছিল। রোগগ্রস্ত সেই লোকটাকে হিরণ কখনো কখনো সাহায্য করেছে—কিন্তু খুশিমনে নয়। হিরণ জানত এই সাহায্য নানা লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায় বলেই লোকটা বারবার হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসে—নিরাময়কে বড়ো ভয় ছিল সেই লোকটার কেননা দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগে ভুগে সে সেই রোগটাকে ভালোবেসে ফেলেছিল—যেমন আমরা আমাদের হাত পা নাক মুখ চোখ বিশ্বাস আত্মপ্রবঞ্চনা ও বৃথাগর্বগুলিকে, মেধা ও বোধগুলিকে ভালোবাসি। এর থেকে প্রতিসারিত কোনো অস্তিত্বের কথা আমরা কখনও ভেবে দেখিনি। শেষবার হিরণ লোকটাকে দেখেছিল লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে দাঁড়িয়ে একটা চোরাই ঘড়ি সম্ভাব্য খদ্দেরকে গছাবার তালে আছে। বিরক্ত হিরণ তাকে পাকড়াও করে প্রশ্ন করেছিল 'এসব কী? আপনি এখানে এভাবে কেন?' লোকটা অনেকক্ষণ হিরণের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বলেছিল তার রোগটা জটিল, এমন রোগ সহজে হয় না, সহজে সারেও না, এবং মৃত্যু অনিশ্চিত। হিরণ নিজের ধর্মবোধ ও পরোপকার প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে লোকটাকে প্রায় কোণঠাসা করে এনেছিল। লোকটা অবশেষে দৃঢ়ভাবে হিরণকে বলে দিল, 'মশাই, যদি আমার ঘড়িটা কিনতে হয় তো কিনুন, নইলে নিজের পথে যান। আমি আত্মহত্যা করছি না—কেউই কখনও তা করতে পারে না।'

এই জটিল কথাটা এতকাল হিরণ বুঝতে পারেনি। আজ হিরণ সেই লোকটার মুখ মনে করতে পারে না। কিন্তু এতদিনে সে যেন সেই রোগটার অর্থ ধরতে পারছে। যদিও জটিল রোগ—দুরারোগ্য—কিয়দংশে পরিকল্পিত ক্ষয় ও স্বপ্নের দ্বারা গঠিত, তবু হিরণ এর অর্থ বুঝতে পারে।

এখন মর্গে চারুলালের মৃতদেহের ওপর তার শিল্পচিন্তাগুলি মাছির মতো এসে বসেছে। তার মেদ-মজ্জা শুষে নিচ্ছে। দুরারোগ্য সেই ব্যাধি—বড়ো সংক্রামক। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভয়াবহ চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে হিরণের। তার মনে হয় এক অচেনা কিন্তু সুসংবদ্ধ কার্যকারণসূত্রে চারুলালের আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এ আইনসম্মত এবং এ কারও অনুমতিসাপেক্ষ নয়।

চারুলালের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগহীন ও সম্পর্কশূন্য অনুভব করে সে একবার ভাবল—এ অন্যায়। পরমুহূর্তেই ভেবে দেখল—কিন্তু হায়, চারুলালের এই মৃত্যু ধর্ম ও অধর্মে গঠিত এক ধাঁধার মতো—যার সমাধান কখনও সম্ভব নয়।

চারুলালের কাছে পাঁচটা টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু আজ রাত্রে হিরণ সেই পাঁচটা টাকার যাবতীয় স্বত্ব ও দাবিদাওয়া ছেড়ে দিল।

হিরণ অনুভব করে এবার সে আস্তে আস্তে কিংবা এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।

আমাকে দেখুন

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। এই যে আমি এখানে। একটু আগে আমি বাসের পা-দানিতে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম, তারপর নিরেট জমাট ভিড়ের ভিতরে আমি এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে, এর ওর পায়ের ফোঁকর দিয়ে ঠিক ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে কেটে এতদূর চলে এসেছি। বাসের রডগুলো বড়ো উঁচুতে—আমি বেঁটে মানুষ—অতদূর নাগাল পাই না। আমি সিটের পিছন দিক ধরে দাঁড়াই, তারপর গা ছেড়ে দিই! বাসের ঝাঁকুনিতে যখন আমি দোল খাই আশেপাশের মানুষের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাই, তখন আমার আশেপাশের লোক কেউ খুব একটা রাগ করে না। কারণ আমার ওজন এত কম যে, কারও গায়ে ঢলে পড়লেও সে আমার ভার বা ধাক্কা টেরই পায় না। হ্যাঁ, এখন আমি বাসের পিছন দিকটায় একটা সিট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দু-ধারে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু সব মানুষ। তারা আমাকে এত ঢেকে আছে যে, বোধহয় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছে না কেউ। ওইটাই মুশকিল। আমাকে অনেকেই দেখে, কিন্তু লক্ষ করে না। এখন আমি যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা যার মুখোমুখি তারা আমাকে হয়তো দেখছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। যেন আমি না থাকলেও কোনো ক্ষতি বা লাভ ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার চেহারায় এমন কিছু নেই, যাতে আমাকে আলাদা করে চেনা যায়। হ্যাঁ মশাই আমি মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, রোগাই, তবে খুব রোগা নয় যেটা চোখে লাগে, কালোই তবে খুব কালো নয় যে, আর একবার তাকিয়ে দেখবে কেউ। চল্লিশ বছরের পর আমার মাথা ক্রমে ফাঁকা হয়ে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অথচ টাকও পড়েনি—টেকো মানুষকেও কেউ কেউ দেখে। তার ওপর আমার মুখখানা—সেটা না খুব কুচ্ছিত না সুন্দর—আমার নাক থ্যাবড়া নয় চোখাও নয়, চোখ বড়োও নয় আবার কুতকুতেও নয়। কাজেই এই যে এখন ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি—দু-ধারে উঁচু উঁচু মানুষ—এই ভিড়ের মধ্যে কেউ কি আমাকে দেখছেন? দেখছেন না, কিংবা দেখলেও লক্ষ করছেন না—আমি জানি।

আমার বিয়ের পর একটা খুব মর্মান্তিক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বউভাতের দুই-একদিন পর আমি আমার বউকে নিয়ে একটু বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। আর কয়েকদিন পরই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাব সেই কারণেই কিছু নমস্কারীর কাপড়-চোপড় কেনা দরকার ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আমি আমার বউকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিউ মার্কেটে যাবে?' আমার যা অবস্থা তাতে নিউ মার্কেটে বাজার করার কোনো অর্থ হয় না, বরাবর আমরা বাসার কাছে কাটারায় সস্তায় কাপড়-চোপড় কিনি। তবু যে আমি এই কথা বলেছিলাম, তার এক নম্বর কারণ ছিল যে, আমার বউটি ছিল মফসসলের মেয়ে, নিউ মার্কেট দেখেনি, আর দুই নম্বর কারণ হল আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা আমাদের তুলনায় বেশ একটু পয়সাওয়ালা। আমি নিউ মার্কেটের কথা বললাম যাতে আমার নতুন বউটি খুশি হবে, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন শুনবে কাপড়-চোপড় নিউ মার্কেট থেকে কেনা, তখন তাদের ভ্রূ একটু ঊর্ধ্বগামী হবে। কিন্তু ওই নিউ মার্কেটের প্রস্তাবটাই একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ ওখানে না গেলে ঘটনাটা বোধহয় ঘটতই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কি নিউ মার্কেটে ঢোকার পর ঝলমলে দোকানপশার দেখে আমার বউ মুগ্ধ হয়ে গেল। যে-কোনো দোকানের সামনেই দাঁড়ায়, তারপর শো-কেসে চোখ রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটে। আমার দিকে তাকাতেও ভুলে গেল। তখন আমার নতুন বউ, কাজেই আমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাকে এটা ওটা দেখিয়ে একটু মাতব্বরীর চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সবকিছুই দেখতে লাগল। অভিমানটা একটু প্রবল হতেই এক সময়ে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খুব কমিয়ে দিলাম, কিন্তু বউ সেটা লক্ষ না করে নিজের মনে হেঁটে যেতে লাগল। তাই দেখে এক সময়ে আমি একদম

থেমে গেলাম। কিন্তু বউ হাঁটতে লাগল। দোকান-পশারের দিকে তার বিহ্বল চোখ, আর গার্ড অফ অনার দেওয়ার সময়ে সোলজাররা যেমন হাঁটে তেমনি তার হাঁটার ভঙ্গি। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম আমার বউ সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে লোকজনের ভিড় ঠেলে একা হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে কথাও বলছিল বটে আমি তার সঙ্গেই আছি ভেবে, কিন্তু সত্যিই আছি কিনা তা সে লক্ষ করল না। এইভাবে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর সে কী একটা জিনিস দেখে খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখানোর জন্য মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল আমাকে। তখনই মজা করার একটা লোভ আমি আর সামলাতে পারলাম না। নিউ মার্কেটে যে গোলকধাঁধার মতো গলিগুলো আছে তার মধ্যে যেটা আমার সামনে ছিল আমি চট করে তার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার মফসসলের মেয়েটা খুঁজুক আমাকে। যেমন সে আমাকে লক্ষ করছিল না, তেমন বুঝুক মজা। আমি আপনমনে হাসলাম, আর উঁকি মেরে দেখলাম আমার বউটা কান্নামুখে চারিদিকে চাইতে চাইতে ফিরে আসছে দ্রুত পায়ে। আমার কষ্ট একটু হল ওর মুখ দেখে, তবু আর একটু খেলিয়ে ধরা দেব বলে আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। আর ও দিশেহারার মতো এদিক ওদিক অনেকবার হাঁটল, এ গলি সে গলিতে খুঁজতে লাগল আমাকে। আমি ওকে চোখে চোখেই রাখছিলাম। একসময়ে বুঝতে পারলাম যে, এবার আমাকে না পেলে ও কেঁদেই ফেলবে—এমন করুণ হয়ে গেছে ওর মুখশ্রী। চোখদুটোও ছলছলে আর লাল হয়ে গিয়েছিল। তাই একসময় ও যে গলিটাতে হেঁটে যাচ্ছিল, আমি পা চালিয়ে অন্য পথে গিয়ে সে গলিটার উলটোদিক দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিপরীত দিকে থেকে ও হেঁটে এল, ঠিক মুখোমুখি দেখা হল আমাদের, এমনকি ও আমার এক ফুট দূরত্বের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল। তবু আমাকে চিনতে পারল না। খুব অবাক হলাম আমি—ও কি আমাকে দেখেনি। আবার আমি অন্যপথে তাড়াতাড়ি গিয়ে অন্য এক গলিতে একটা কাচের বাসনের দোকানের সামনে কড়া আলোয় দাঁড়ালাম। ঠিক তেমনি ও উলটোদিক থেকে হেঁটে এল, চারদিকের লোকজনকে লক্ষ করল, আমার চোখে ওর চোখ পড়ল, কিন্তু আবার আমাকে পেরিয়ে গেল ও, এমনকি পেরিয়ে গিয়ে একবার পিছু ফিরেও দেখল না। এরকম কয়েকবার আমাদের দেখা হল—কখনও বইয়ের দোকানের সামনে, কখনও ফলের দোকান কিংবা পুতুলের দোকানের সারিতে। কিন্তু ও আমাকে কোনোবারই চিনতে চাইছে না। কিন্তু ওর মুখের করুণ এবং ক্রমে করুণতর অবস্থা দেখে সে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। তবু আমি অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম—এই যে! ও ভীষণ চমকে গিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ দেখেটেখে তারপর ভীষণ জোরে শ্বাস ফেলে কেঁপে কেঁপে হেসে বলল—তুমি! তুমি! কোথায় ছিলে তুমি! আমি কতক্ষণ তোমাকে খুঁজছি! আশ্চর্য এই যে, তখন আমার মনে হল ও সত্যি কথাই বলছে। বাসায় ফেরার সময়ে ওকে আমি বললাম যে, ওর সঙ্গে ওই লুকোচুরি খেলার সময়ে আমি বার বার ওকে ধরার সুযোগ দিয়েছি, ওর সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করল না, কিন্তু আমি বার বার বলাতে ও খুব অবাক হয়ে বলল—সত্যি! তাহলে তুমি আর কখনও লুকিয়ো না। এরকম করাটা বিপজ্জনক।

বেঁধে ভাই কন্ডাক্টর, এইখানেই আমি নেমে যাব... দেখি দাদা... দেখবেন ভাই আমার চশমাটা সামলে...ওই দেখুন, কেউ আমার কথা শুনল না। আমি নামার আগেই কন্ডাক্টর বাস ছাড়ার ঘন্টি দিয়ে দিল, গেট আটকে ধুমসোমতো লোকটা অনড় হয়েই রইল আর হাওয়াই শার্ট পরা ছোকরাটা কনুইয়ের গুঁতোয় চশমাটা দিলে বেঁকিয়ে। তাই বলছিলাম যে, কেউই আমাকে লক্ষ করে না, বাসে-ট্রামে না, রাস্তায় ঘাটে না।

আজকের দিনটা বেশ ভালোই। ফুরফুরে হাওয়া আর রোদ দিয়ে মাখামাখি একটা আদুরে আদুরে গা-ঘেঁষা দিন। শরৎকাল বলে গরমটা খুবই নিস্তেজ। এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে আমার বেশ ভালোই লাগছে। ওই তো একটু দূরেই একটা ক্রসিং আর তার পরেই আমার অফিস। এই দ্যাখো আমি ক্রসিংটার কাছে এসে রাস্তা পেরোবার জন্য পা বাড়াতেই ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে নিল, আমার পার হওয়ার রাস্তাটা আটকে

এখন চলন্ত গাড়ি আর গাড়ি। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিশ, আমি যে রাস্তা পেরোচ্ছি তা কি দেখতে পাওনি? আর একটু হাতখানা তুলে রাখলে কি হাতখানা ভেঙে যেত?

যে লিফটে দাঁড়িয়ে আমি দোতলায় উঠছি এই লিফটটা বোধহয় একশো বছরের পুরোনো। এর চারদিকে কালো লোহার গ্রিল—ঠিক একখানা খোলামেলা খাঁচার মতো, মাঝে মাঝে একটু কাঁপে, আর খুব ধীরে ধীরে ওঠে। গত তেরো বছর ধরে আমি এই লিফট বেয়ে উঠছি, এই তেরো বছর ধরে আমাকে সপ্তাহে ছদিন লিফটম্যান রামস্বরূপ আভোগী ওপরে তুলছে। কী বলো ভাই রামস্বরূপ, তুমি তো আমাকে বেশ ছোটোটিই দেখেছিলে—যখন আমার বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ, যখন আমার ভালো করে বুড়োটে ছাপ পড়েনি মুখে। এখন বলো তো আমার নামটা কী! যদি সত্যিই জিজ্ঞেস করি তাহলে এক্ষুনি রামস্বরূপ হাঁ হাঁ করে হেসে উঠে বলবে—আরে জরুর, আপনি তো অরবিন্দবাবু। কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনোকালেই আমি অরবিন্দ ছিলাম না। আমি চিরকাল—সেই ছেলেবেলা থেকেই অরবিন্দ বসু।

আমার চাকরি ব্যাংকে। দোতলায় আমার অফিস। আগে আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, গত দশ বছর ধরে আমি বসছি ক্যাশ-এ। আমি খুব চটপট টাকা গুনতে পারি, হিসেবেও আমি খুব পাকা। তাই ক্যাশ থেকে আমাকে অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। হলেও আবার ফিরিয়ে আনা হয়। দশ বছর ধরে আমি খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যাশের কাজ করছি। কখনও পেমেন্টে, কখনও রিসিভিঙে। পেমেন্টেই বেশি, কারণ ওখানেই সবচেয়ে সতর্ক লোকের দরকার হয়। একটা তারের খাঁচার মধ্যে আমি বসি, আমার বুকের কাছে থাকে অনেক খোপওলা একটা ড্রয়ার। তার কোনটায় কত টাকার নোট, আর কোনটায় কোন খুচরো পয়সা রয়েছে, তা আমি নির্ভুলভাবে চোখ বুজে বলে দিতে পারি। পেমেন্টের সময়ে আমি ড্রয়ার খুলে গুনে টাকা বের করি, তারপর ড্রয়ার বন্ধ করি, তারপর আবার গুনি, আবার....তারপর টাকা দিয়ে পরের পেমেন্টের জন্য হাত বাড়াই, টোকেন নিয়ে আবার ড্রয়ার খুলি, টাকা বের করে গুনে...তারপর একইভাবে চলতে থাকে। সামনের ঘুলঘুলিটা দিয়ে যারা আমাকে দেখে তাদের সম্ভবত খুবই ক্লান্তিকর লাগে আমার ব্যবহার—ইস লোকটা কী একঘেয়েভাবে কাজ করছে—কী একঘেয়ে! ঘুলঘুলি দিয়ে তারা আমাকে দেখে, কিন্তু মনে রাখে না। রামবাবু আমাদের পুরোনো বড়ো খদ্দের—প্রকাণ্ড কারখানা আছে, এজেন্টও তাকে খাতির করে। খুব খুঁতখুঁতে লোক, বেশিরভাগ সময়েই লোক না পাঠিয়ে নিজেই এসে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে যান। আমি কতবার তাঁকে পেমেন্ট দিয়েছি, তিনি ঘুলঘুলি দিয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়েছেন। একবার আমার বড়ো শালা কলকাতায় বেড়াতে এসে অনেক টাকা উড়িয়েছিল। সেবার সে আমাকে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের বড়ো একটা রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি রামবাবু! একা বসে আছেন, হাতে সাদা স্বচ্ছ জিন, খুব স্বপ্নালু চোখ। সত্যি বলতে কী আমি ভাগ্যোন্নতির কথা বড়ো একটা ভাবি না। অন্তত সে কারণে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার মনেই হয়নি। আমি পুরোনো চেনা লোক দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রামবাবু ভ্রূ তুলে বললেন—কোথায় দেখেছি বলুন তো! মনেই পড়ছে না। তখন আমার শালার সামনে ভীষণ লজ্জা করছিল আমার। লোকটা যদি সত্যিই চিনতে না পারে, যদি সত্যিই তেমন অহংকারী হয়ে থাকে লোকটা—তবে আমার বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তখন আমি মরিয়া হয়ে আমার ব্যাংকের নাম বললাম, বললাম যে আমি ক্যাশ-এ...সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার জিন-এর মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর মুখ, প্রসন্ন হেসে বললেন—চিনেছি। কী জানেন, ওই ঘুলঘুলি আর ওই খাঁচা ওর মধ্যে দেখতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই হঠাৎ এ জায়গায়...বুঝলেন না! আসল কথা হল এ পারসপেকটিভ—ওটা ছাড়া মানুষের আর আছেটা কী যে, তাকে চেনা যাবে? ওই খাঁচার মধ্যে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যেমন আপনি, তেমন দেখুন এই কোট-প্যান্ট-টাই আর টাক মাথা-এর মধ্য দিয়ে আমি। এসব থেকে যদি আলাদা করে নেন, তবে দেখবেন আপনি আর আমি—আমাদের কোনো সত্যিকারের পরিচয়ই নেই। এই দেখুন না, একটু আগেই আমি পারসপেকটিভের কথাই ভাবছিলাম। ছেলেবেলায় আমরা থাকতাম রেলকলোনিতে। আমার বাবার ছিল টালিক্লার্কের চাকরি। কাটিহারে আমাদের রেল কোয়ার্টারে প্রায়ই পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে আসত, তার সৎ-মা বলে

বাসায় আদর ছিল না। আমাদের বাসায় রান্নাঘরে উনুনের ধারে আমার মায়ের পাশটিতে সে এসে মাঝে মাঝে বসত। জড়োসড়ো হয়ে ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে পরোটা বেলে দিত, কখনও আমার কাঁদুনে ছোটো বোনটাকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াত। মা আমাকে বলত—ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। সেই শুনে সেই মেয়েটাকে আমি ভালো করে দেখতাম—আর কী যে নেশা লেগে যেত। কী করুণ কৃশ খড়িওঠা মুখখানা—আর কী তিরতিরে সুন্দর। যেন পৃথিবীতে বেশিদিন থাকবে বলে ও আসেনি। রামবাবু এটুকু বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আর আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—তারপর কী হল, সে কী মরে গেল? রামবাবু মাথা নাড়লেন—না, না, মরবে কেন! তাকে আমি বিয়ে করেছি বড়ো হয়ে। সে এখনও আমার বউ। ইয়া পেল্লায় মোটা হয়ে গেছে, বদমেজাজি, আমাকে খুব শাসনে রাখে। কিন্তু যখন দেখি ফ্রিজ খুলছে, গয়না হাঁটকাচ্ছে, চাকরদের বকছে কিংবা সোফারকে বলছে গাড়ি বের করতে, তখন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এ সেই। সেই বেলী—যার অসুখের সময় মা দুটো কমলালেবু দিয়ে এসেছিল বলে একগাল হেসেছিল। আজ দেখুন, খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি ওর সঙ্গে। মনটা খিঁচড়ে ছিল—সেই ভালোবাসা কোথায় উবে গেছে এখন। কিন্তু এখানে নির্জনে বসে সেই পুরোনো দিন, উনুনের ধারে বসে থাকা, ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে ওর বসার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আমার মায়ের মুখ—সে মুখ বড়ো মায়া-মমতায় ওর বসার দীন ভঙ্গিটুকু চেয়ে দেখছে। অমনি আবার এখন ভালোবাসায় আমার মন ভরে উঠেছে। বাসায় ফিরে গিয়েই এখন ওর রাগ ভাঙাব। বুঝলেন না....বলে রামবাবু সেই সাদা স্বচ্ছ জিন মুখে নিয়ে হাসলেন, বললেন,—ওই যে ঘুলঘুলিটা—যেটার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখি সেটাই আসল—ওই ঘুলঘুলিটা...

এই যে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ছেলেটা এখন পেমেন্টের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, পিতলের টোকেনটা ঠুকঠুক করে অন্যমনস্কভাবে ঠুকছে কাউন্টারের কাঠে, ও আমাকে চেনে। ওর বাবার আছে পুরোনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা। আগে ওর বাবা আসত, আজকাল ও আসছে ব্যাংকে। মাঝে মধ্যে চোখে চোখ পড়লে আমি হেসে জিজ্ঞেস করি—কী, বাবা ভালো তো! ও খুশি হয়ে ঘাড় কাত করে বলে—হ্যাঁ—। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, একদিন যদি হঠাৎ করে এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং মোটামুটি সাধারণ চেহারার কোনো লোককে বসিয়ে দেওয়া হয় এ জায়গায়, তবে ও বুঝতেই পারবে না তফাতটা। তখনও ও অন্যমনস্কভাবে পিতলের টোকেনটা ঠুকবে কাঠের কাউন্টারে, অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকবে, চোখে চোখ পড়লে সেই নতুন লোকটার দিকে চেয়ে পরিচিতের মতো একটু হাসবে। ভুলটা ধরা পড়তে একটু সময় লাগবে ওর। কারণ, ও তো সত্যিই কখনও আমাকে দেখে না। ও হয়তো ওর নতুন প্রেমিকাটির কথা ভাবছে এখন, ভাবছে শিগগিরই ও একটা স্কুটার কিনবে। ও ঘাড় ফিরিয়ে রিসেপসনের মেয়েটির দিকে কয়েক পলক তাকাল, তারপর ঘড়ি দেখল। একবার টোকেনটার নম্বর দেখে নিল, ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে দেখল আমার দু-খানা হাত ক্লান্তিকরভাবে মোটা একগোছা টাকা গুনছে। ও আমার মুখটা একপলক দেখেই চোখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আমি জানি যে, ও আমাকে দেখল না। আর পনেরো মিনিট পরেই দুটো বাজবে। তখন আমি ক্যাশ বন্ধ করে নীচে যাব টিফিন করতে। তখন যদি ও আমাকে রাস্তায় দেখতে পায়, আমি ফুটপাতের দোকানে দাঁড়িয়ে থিন এরারুট আর ভাঁড়ের চা খাচ্ছি, তখন কি আমাকে চিনবে ও?

কলা কত করে হে? চল্লিশ পয়সা জোড়া—বলো কী? হ্যাঁ হ্যাঁ, মর্তমান যে তা আমি জানি, মর্তমান কি আমি চিনি না? ওই সুন্দর হলুদ রং, মসৃণ গা, প্রকাণ্ড চেহারা—মর্তমান দেখলেই চেনা যায়। তা আজ অবশ্য আমার কলা খাওয়ার তারিখ নয়। গতকালই তো খেয়েছি। আমি দুদিন পর পর কলা খাই। দাও একটা, না, না ওই একটাই—এই যে কুড়ি পয়সা ভাই। আহা বেশ কলা। চমৎকার। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ খোসাটা হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। দশ-পনেরো মিনিট একটু এদিক- ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। কলার খোসাটা আমার হাতেই ধরা। আমার চারপাশেই নিরুত্তেজভাবে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। খুবই নির্বিকার তাদের মুখচোখ। এরা কখনও যুদ্ধবিগ্রহ করেনি, দেশ বা জাতির জন্য প্রাণ দিতে হয়নি এদের, এমনকি খুব কঠিন কোনো কাজও এরা সমাধা করেনি সবাই মিলে। জাতটা মরে

আসছে আস্তে আস্তে, অন্তর্ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাঁটছে, চলছে—একে অন্যের সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে। এদের সময়ের জ্ঞান নেই—উনিশশো উনসত্তর বলতে এরা একটা সংখ্যা মাত্র বোঝে, দু-হাজার বছরের ইতিহাস বোঝে না। এদের কাছে 'টেলিপ্যাথি' কিংবা 'ক্রিক রো' যেমন শব্দ, 'ভারতবর্ষ'ও ঠিক তেমনি একটা শব্দ।

দয়া করে আমাকে দেখুন। এই যে আমি—অরিন্দম বসু—অরিন্দম বসু—এই যে না-লম্বা না-রোগা না-ফর্সা একজন লোক। আমি টেলিপ্যাথি নই, ক্রিক রো নই, ভারতবর্ষও নই—ওই শব্দগুলোর সঙ্গে অরিন্দম বসু—এই শব্দটার একটু তফাত আছে, কিন্তু তা কি আপনি কখনও ধরতে পারবেন?

যাক গে সে সব কথা। মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—আমি কি সত্যিই আছি? না কি, নেই? ব্যাংকের ওই ঘুলঘুলি দিয়ে লোকে হাত এগিয়ে টাকা গুনে নেবে আর কেউ কেউ ধন্যবাদ দিয়ে যাবে, খেয়ালই করবে না ঘুলঘুলির ওপাশে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই নিউ মার্কেটের ঘটনাটার কথাই ধরুন না—আমার বউ হেঁটে হেঁটে আমাকে খুঁজছে—আমাকে সামনে দেখে, চোখে চোখ রেখেও পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভাবছে—কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়!

খুব যত্নের সঙ্গে কলার খোসাটা আমি ফুটপাথের মাঝখানে রেখে দিলাম! উদাসীন মশাইরা, যদি এর ওপর কেউ পা দেন তাহলে পিছলে পড়ে যেতে যেতে আপনি হঠাৎ চমকে উঠে আপনার সংবিৎ ফিরে পাবেন। যদি খুব বেশি চোট না পান আপনি, যদি পড়ো-পড়ো হয়েও সামলে যান, তাহলে দেখবেন আপনার মস্ত লাভ হবে। আপনি চারপাশে চেয়ে দেখবেন—কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন তা মনে পড়ে যাবে—দুর্ঘটনা গুরুতর হলে আপনার হাত-পা কিংবা মাথা ভাঙতে পারত ভেবে আপনি খুব সতর্ক হয়ে যাবেন আপনার বিপজ্জনক চারপাশটার সম্বন্ধে—হয়তো আপনার ভিতরকার ঘুমন্ত আমিটা জেগে উঠে ভাববে 'বেঁচে থাকা কত ভালো'—তখন হয়তো মানুষের সম্বন্ধে আপনি আর একটু সচেতন হয়ে উঠবেন—এবং বলা যায় না আপনার হয়তো এ কথাও মনে পড়ে যেতে পারে যে, আজ হচ্ছে উনিশশো ঊনসত্তর সালের ষোলোই জুলাই—আপনার বিয়ের তারিখ, যেটা আপনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন—এবং এই সালে আপনার বয়স চল্লিশ পার হল। তখন মশাই ভেবে দেখবেন এই যুদ্ধ এবং বিপ্লবহীন ভারতবর্ষে একটি নিস্তেজ দুপুরে রাস্তায় কলার খোসা ফেলে রেখে আমি আপনার খুব অপকার করিনি।

আপনি কি এখন চাঁদের কথা ভাবছেন! আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা! ভাববেন না মশাই, ওসব ভাববেন না। কী কাজ আমাদের ওসব ভেবে। খামোখা মানুষ ওতে ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর তারপর ভীষণ অবসাদ আসে একসময়ে। ওদের খুব ভালো যন্ত্র আছে, ওরা ঠিক চাঁদে নেমে যাবে, তারপর আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসবে। কিন্তু সেটা ভেবে আপনি অযথা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক হবেন না। রাস্তা দেখে চলুন। রাজভবনের সামনে বাঁকটা ঘুরতেই দেখুন কী সুন্দর খোলা প্রকাণ্ড ময়দান, উদোম আকাশ। কাছাকাছি যে সব মানুষগুলো হাঁটছে তাদের দেখে নিন, চিনে রাখুন যতদূর সম্ভব অন্যের মুখ—যেন যে-কোনো জায়গায় দেখা হলে আবার চিনতে পারেন। এই সুন্দর বিকেলে ময়দানের কাছাকাছি আমি আপনার পাশেই হাঁটছি—আমাকে দেখুন। এই তো আমি আমার অফিস থেকে বেরিয়েছি। একটু আগেই বেরিয়েছি আজ, খেলা দেখতে যাব বলে। মনে হচ্ছে আপনিও ওইদিকে—না ?

দেখুন কী আহম্মক ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে সুন্দর চান্সটা নষ্ট করে দিল। আর মাত্র দশ মিনিট আছে, এখনও গোল হয়নি। আর ওই ছেলেটা—হায়, ঈশ্বর কে ওকে ওই লাল সোনালি জার্সি পরিয়েছে! ওকে বের করে দিক মাঠ থেকে। দিন তো মশাই আপনারা চোস্ত গালাগালিতে ওর ভূত ভাগিয়ে। আমার জিভে আবার খারাপ কথাগুলো আসে না। কিন্তু দেখুন, রাগে আমারও হাত-পা কাঁপছে। আজ সকাল থেকেই চাঁদ আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা ভেবে ভেবে আমার নার্ভগুলো অসাড় হয়ে আছে। তার ওপর দেখুন এই ফালতু টিমটা আমার দলের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এক পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট—কী সাংঘাতিক! ওদিকে আর আট কি ন' মিনিট সময় আছে মাত্র। কী বলেন দাদা, গোল হবে? কী করে হবে!

ক্ষুদে টিমটার সব খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দেয়াল তৈরি করছে গোলের সামনে। আর এরা খেলছে দেখুন, কে বলবে যে গোল দেওয়ার ইচ্ছে আছে ? ওই যে ছেলেটা—অফসাইডে দাঁড়িয়ে দিনের সবচেয়ে সহজ চান্সটাকে মাটি করে দিল—আমার ইচ্ছে করছে ওর সামনে গিয়ে বলি—এই আমাকে দ্যাখো, আমি অরিন্দম বসু, এই টিমটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে সাপোর্ট করে আসছি। জিতলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি, হারলে সুইসাইডের কথা ভেবেছি। তা বাপু তুমি কি বোঝো সে সব? তুমি তো জানোই না যে, আমি—এই ভিড়ের মধ্যে বিশেষ একজন—কীরকম দুঃখ নিয়ে ছলছলে চোখে ঘড়ি দেখছি। অবশ্য তাতে কার কী যায় আসে! আমি কাঁদি কিংবা হাসি—কিংবা যাই করি—কেউ তো আর আমাকে দেখছে না।

না মশাই গোল হল না। রেফারি ওই লম্বা টানা বাঁশি বাজিয়ে দিল। খেলা শেষ। এখন দয়া করে আমাকে একবার দেখুন কীরকম অবসাদগ্রস্ত আমি, কাঁধ ভেঙে আসছে। দেখুন আমার টিমটাকে আমি কত ভালোবাসি, কিন্তু তাতে টিমের কিছু যায় আসে না। ওরা চেনেই না আমাকে। অথচ আমি প্রতিটি হারজিতের পর কত হেসেছি-লাফিয়েছি-কেঁদেছি-চাপড়ে দিয়েছি অচেনা লোকের পিঠ। খামোখা। তাতে কারও কিছু এসে যায় না। এই যে আমি সকাল থেকে চাঁদ আর তিনজন মানুষের কথা ভেবে চিন্তান্বিত—ভালো করে ভাত খেতে পারিনি উত্তেজনায়—এতেই বা কার কী এসে যায়!

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। না, আমি জানি, আপনি লিগ-টেবিলে আপনার টিমের অবস্থান ভেবে বিব্রত। তার ওপর চাঁদ আর সেই তিনজন মানুষের কথাও ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে! সাড়ে উনত্রিশ ফুট লং জাম্প দিচ্ছে মানুষ, গুলিতে মারা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভোটে হেরে যাচ্ছে আপনার দল, বিপ্লব আসতে বড়ো দেরি করছে। তাই, আমি—অরিন্দম বসু, ব্যাংকের ক্যাশ ক্লার্ক—আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ওই যে দোতলার বারান্দায় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চার বছর বয়সের ছোটো ছেলেটা—হাপু। বড়ো দুরন্ত ছেলে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে—রথের মেলায় যাব বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। ওই যে এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। ঝাঁকড়া চুলের নীচে জ্বল জ্বল করছে দু-খানা চোখ, আমি এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি।

আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, ও ওপর থেকে দুড়দাড় করে নেমে এল—ওর মা ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে—হাপু-উ কোথায় গেলি, ও হাপু—উ—উ। একগাল হেসে হাপু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়—কত দেরি করলে বাবা, যাবে না ? হ্যাঁ মশাই বাইরে থেকে ফিরে এলে—এই আপনজনদের মধ্যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কচি ছেলেটাকে আমি কোলে তুলে নিলাম। ওর গায়ে মিষ্টি একটা ঘামের গন্ধ, শীতের রোদের মতো কবোষ্ণ ওর নরম গা। মুখ ডুবিয়ে দিলে মনে হয় একটা অদৃশ্য স্নান করে নিচ্ছি যেন। বললাম—যাব বাবা, বড়ো খিদে পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে খেয়ে নিই।

যতক্ষণ আমি বিশ্রাম করলাম ততক্ষণ হাপু আমার গায়ের সঙ্গে লেগে রইল, উত্তেজনায় বলল—শিগগির করো। ওর মা ধমক দিতেই বড়ো মায়ায় বললাম—আহা, বোকো না, ছেলেমানুষ! আসলে ওর ওই নেই-আঁকড়ে ভাবটুকু বড়ো ভালো লাগে আমার।

বড়ো দুরন্ত ছেলে। মেলায় পা দিয়েই হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। বললাম—ওরকম করে না। হাপু, হাত ধরে থাকো, আমার হাত ধরেই তুমি ঠিকমতো মেলা দেখতে পারো। ও কেবলই এদিক-ওদিক তাকায় তারপর ভীষণ জোরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে—ওটা কী বাবা! আর ওটা! আর ওইখানে! আমি ওকে দেখিয়ে দিই—ওটা নাগরদোলা। ওইটা সার্কাসের তাঁবু। আর ওটা মৃত্যুকূপ।

আস্ত একটা পাঁপড় ভাজা হাতে নাগরদোলায় উঠে গেল হাপু। ওই যে দেখা যাচ্ছে তাকে—আকাশের কাছাকাছি উঠে হি হি করে হেসে হাত নাড়ছে—সাঁই করে নেমে আসছে আবার—আবার উঠে যাচ্ছে—সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে হাসছে হাপু। দেখে মন ভরে যায়।

মৃত্যুকূপের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওকে দেখালাম দেয়াল বেয়ে ভীষণ শব্দে ঘুরে ঘুরে উঠে নেমে যাচ্ছে তীব্রবেগে মোটর সাইকেল। ও আমাকে আঁকড়ে ধরে থেকে দেখল।

তারপর আধঘণ্টার সার্কাস দেখলাম দুজন। দুই মাথাওলা মানুষ সিংগিং ডল, আট ফুট লম্বা লোক। হাপুর কথাবার্তা থেমে গেল। ঝলমল করতে লাগল চোখ।

বাইরে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশে পাশে ও হাঁটতে লাগল। ওর হাতে ধরা হাতটা ঘেমে গিয়েছিল বলে আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

ওই তো ও এগিয়ে যাচ্ছে আমার হাত ছেড়ে! দোকানে সাজানো একগাদা হুইশল দেখছে ঝুঁকে, আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আর একটা দোকানে যেখানে এরোপ্লেনের দৌড় হচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ও, এয়ার গান আর রংচঙে বল দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে পা ফেলছে... ক্রমে ভিড়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে হাপু...আমি তখন আমার টিমটার কথা ভাবছিলাম—খামোখা একটা পয়েন্ট নষ্ট হয়ে গেল আজ। চাঁদের দিকে চলেছে তিনজন মানুষ—ওরা কি পৌঁছুতে পারবে?

হঠাৎ খেয়াল হল, হাপুকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভিড়ের মধ্যে এক সেকেন্ড আগেও ওর নীল রঙের শার্টটা আমি দেখেছি। তক্ষুনি সেটা টুপ করে আড়াল হয়ে গেল। হাপু-উ বলে ডাক দিয়ে আমি ছুটে গেলাম....

হ্যাঁ মশাই, আপনারা কেউ দেখেছেন নীল জামা পরা চার বছর বয়সের একটা ছেলেকে? তার নাম হাপু, বড়ো দুরন্ত ছেলে! দেখেননি? ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, জুলজুলে দুটো দুষ্টু চোখ....না, না ওই পুতুলের দোকানের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নয়—যদিও অনেকটা একই রকম দেখতে। না, তার চেহারার কোনো বিশেষ কিছু চিহ্ন আবার মনে পড়ছে না—খুবই সাধারণ চেহারা অনেকটা আমারই মতোই। কেবল বলতে পারি যে, তার বয়স চার বছর। আর গায়ে নীল জামা। তা নীল জামা পরা অনেক ছেলে এখানে রয়েছে, চার বছর বয়সেরও অনেক। না মশাই, আমার পক্ষে ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয় এত—এই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ঠিক কোন জন—ঠিক কোন জন আমার হাপু—আর বোধহয় হাপুর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় এতজনের মধ্যে কোন জন—ঠিক কোন জন—বুঝলেন না, ওর মা-ও একবার ঠিক করতে পারেনি—। যদি হাপুকে দেখতে পান তবে ওকে একবার দয়া করে বলে দেবেন যে, এই যে আমি—এই আমিই ওর বাবা—। এই আমাকে একটু দেখে রাখুন দয়া করে—কাইন্ডলি, ভুলে যাবেন না—